সংকলন

ফেব্রুয়ারি ২০১৭

বেঙ্গলী অ্যাসোসিয়েশান অফ ভিক্টোরিয়া প্রকাশন

With Compliments

Etoiles-Group Pty Ltd.

Weddings, Birthdays, Anniversaries & Functions Decoration

Marquee Hire, Stage Hire, Light & Sound Hire and Event Management

Tickets, Leaflets & Wedding Invitation Cards Printing

Contact Samik: 0419 030 567

info@etoiles-group.com.au * www.etoiles-group.com.au

সূচীপত্র / Contents

বিশেষ আকর্ষণ / Special Feature

জয় গোস্বামী 1

নির্মলেন্দু গুণ 2

নিবন্ধ / Article

মুদ্রণ প্রমাদ	তরুণ ভট্টাচার্য	34
আমি এবং রবীন্দ্রনাথ – ১	শ্রীময়ী ভট্টাচার্য	40
আমি এবং রবীন্দ্রনাথ – ২	শ্রীময়ী ভট্টাচার্য	41
এ জীবন ভালোবেসে	নির্মাল্য কুমার মুখোপাধ্যায়	46
পেরাইভেসি	তরুণ ভট্টাচার্য	51
ইউরোপে কয়েকদিন	লুৎফর রহমান খান	58
My Best Friends Forever	Anuradha Das	124
Durga Puja – A Big Market Place	Goutam Basak	128
Basics of Forex	Partha Banerjee	129
The tides of time never wait, but haunt forever...	Chris Mallika Bhadra	130
Crossing the Nullarbor – Our Story	Pritom Dutta Pallavi Dasgupta	131
Unbounded Longing	Goutam Basak	142
A Father's Letter to a Daughter	Chris Mallika Bhadra	144
Alpana - and back to its old roots	Chondryma Chakrobortti	145
Every One of Us is a Freelancer	Chris Mallika Bhadra	148
Human beings are vegetarian by nature	Sushant Chakravarty	149
Art Trip to Central Australia	Dipankar Sengupta	153

গল্প / Story

ফিরে দেখা	শিবানী ভট্টাচার্য	3
বেট ৩৬০	দেবাশীষ ব্যানার্জী	37
বিশ্বাস	অজানা	43
সম্পর্ক	স্বাতী মিত্র	47
অবশেষে অনিমেষের...	দিলরুবা শাহানা	54
The Black Swan	Chris Mallika Bhadra	126

উপন্যাস / Novel

জীবন বীমা	কল্যাণ ব্যানার্জী	8
তেপায়া	সঞ্চারী পাল	61

কবিতা / Poem

বাণী বন্দনা	কণিকা দাস	3
প্রার্থনা	শ্যামল কুমার দে	7
বিজয়ার পত্র	স্বর্গীয় কবি সন্তোষ কুমার দে	36
মাতৃগর্ভ	দীপ্তি দত্ত	33
পৃথিবী বলে	সোনালি গুপ্ত	39
My Heart	Malobi Sinha	127
Here	Malobi Sinha	130
Mother	Shonali Gupta	144

Young Talent

ছবি/ Art

Bengali Lady	Sanjoli Patra	158
Sydney	Mithilesh Kar	158
Cat Art	Rishab Mitra	158
Acrylic Paining	Sreeparna Das	159
Aboriginal Art	Rishan Deb	160
Mermaid	Tiasha Sahu	160

রচনা / Article

দুই বোন	ত্রিয়া সিনহা	158
FESTIVAL	Rishab Mitra	160
The Line of Fire	Tamoghna Datta	161
My Poverty Stricken Friend	Arushi Sen Chaudhuri	161
Beyond the Dawn	Nikita Bhatt	161
My China Journey	Pritika Sinha	162
Why Uranium should be used in Australia?	Snehashis Sinha	164

Editorial

"*The beginning is the most important part of the work.*" — Plato

It is easy to forget the sweat, sincerity and zeal behind any great undertaking. The innate creativity of the early Melbournian Bengali must have ached and yearned for a befitting platform. Thus was born BAV's first literary enterprise – photocopies of handwritten, typed and self-illustrated pages, modestly threaded together for distribution. It published its first magazine in the year 1991 during Durga Puja, perhaps as a humble substitute for the *Pujo Barshiki* like *Shuktara* and *Anondomela* back home. However, 'Sankalan' was officially established and began its steady annual publication only from the year 1999 onwards.

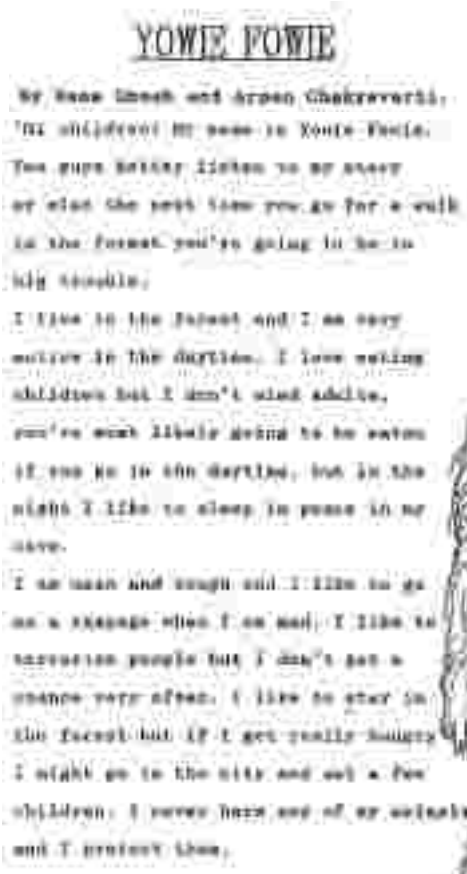

Let's revisit a select few beautiful compositions from the first edition, with which had begun BAV's literary magazine journey… I hope you will find them as entertaining as I did.

The love and adoration for our Dadu-Dida is perfectly captured in this essay…

And I admit I have quite warmed up to Yowie Fowie below. His unapologetic honesty is somewhat reminiscent of Sukumar Ray's '*Bhoe Peyona*', don't you think so?

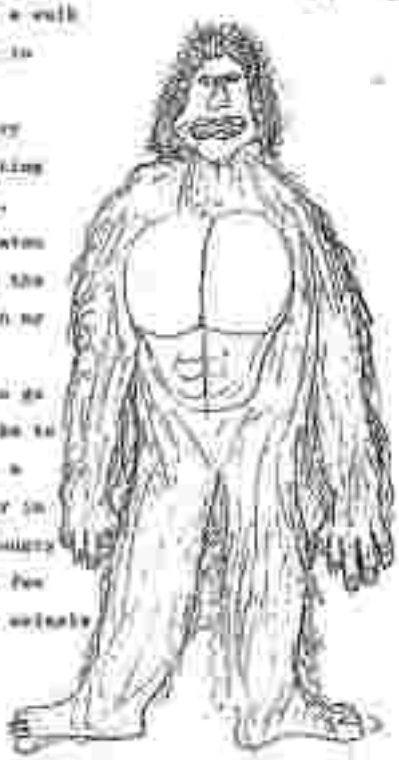

And I end this flashback with the *Shobdo Jobdo* puzzle… let's find out how we fare.

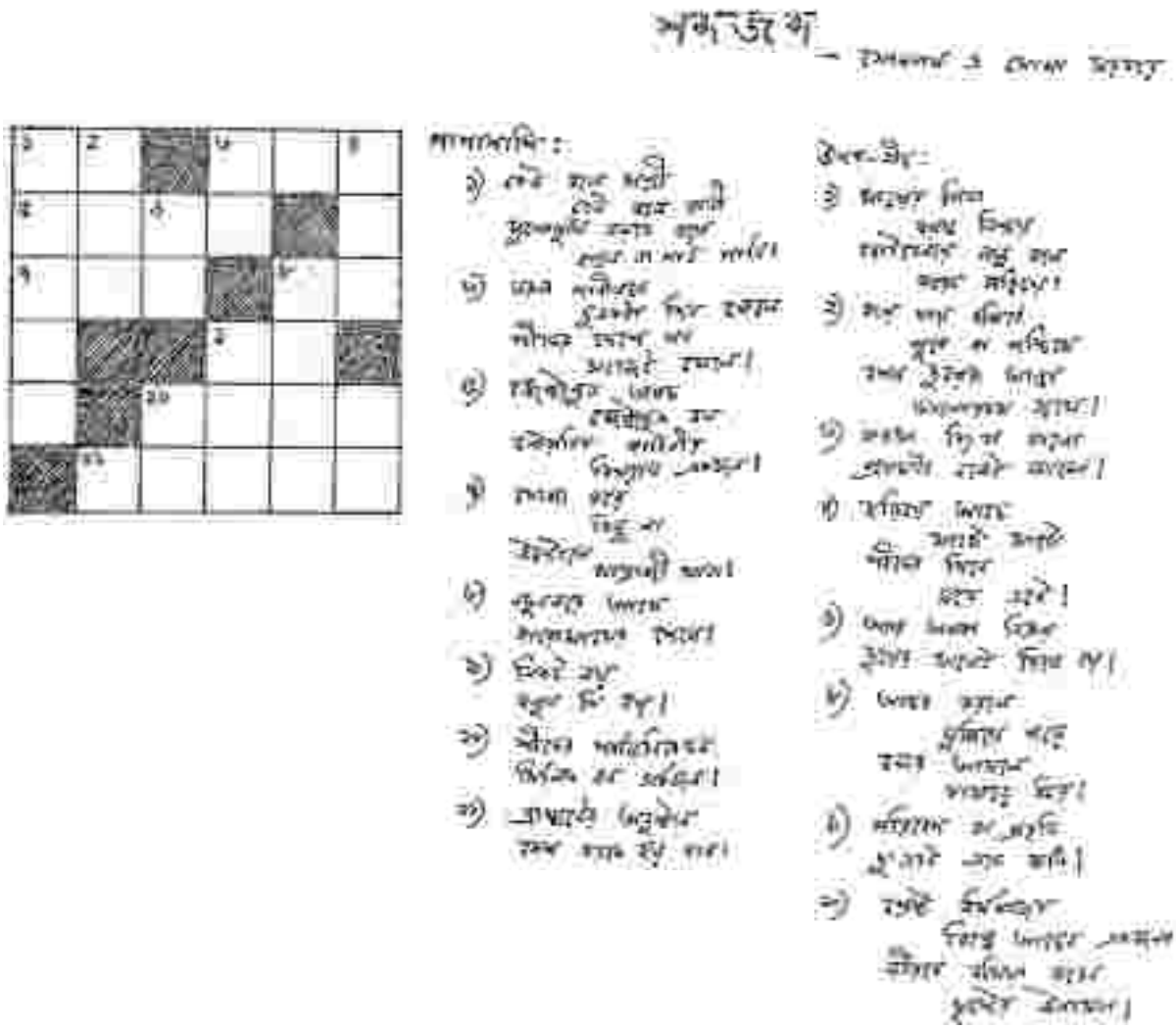

And the journey that started with such modest originality continues to this day. From hand written pages to today's multitude of Bengali software, nothing has remained constant – barring our stubborn need to create and express. The delightful compositions sent by our growing community members in this far corner away from home, have kept our Sankalan team pleasantly occupied these past few months and has given us renewed admiration for the sheer talent surrounding us.

We also feel extremely honoured and grateful that we are able to present poems by two of the most esteemed contemporary Bengali poets as a special feature this year. Joy Goswami has written them exclusively for Sankalan, and we have Nirmalendu Goon's express permission to publish his poems in our magazine for your pleasure.

I thank all those who have been involved directly and indirectly in helping us in putting out this year's Sankalan. It has been another colourful year for BAV because of you, and I hope that we can continue to see the good intentions in the efforts and celebrations that bring us together.

Anupriya Biswas

President's Message

On behalf of Bengali Association of Victoria, my committee members and I would like to wish you and your family a very happy and prosperous New Year 2017.

I would like to acknowledge the SANKALAN team for their great effort in bringing together this publication. Magazines like this can only come together after months of editing and compilation. WELL DONE!!! We are indeed also very proud of our community members of all age groups who have enriched Sankalan with their poems, stories, articles and artwork. Truly, Bengali culture is alive and well in Melbourne!!! This year as a bonus we also have articles from outside Melbourne - hope you all enjoy reading them.

A big THANK YOU to the advertisers for their ongoing support

Last year has been a busy and very fruitful for us. The current BAV Executive Committee members have worked tirelessly to achieve our vision of maintaining traditional values but moving forward with a modern attitude. At the very start of this new term, we celebrated Kobi Jayanti with acclaimed artistes from India - Sounak (Vocal) and Sharmila (Odissi dancer) – and were thoroughly enjoyed and appreciated by those who attended. We then launched a fresh new BAV website that is more user-friendly and up to date. With the support and positive feedback we had received at the AGM in April 2016, our Finance team also introduced online ticket purchasing for all major BAV events. These are all work in progress but I applaud the Committee members for their success in such short time and considering these are all work that is voluntary in nature.

As we celebrate the first festival of the year by worshipping SARASWATI (the goddess of knowledge), I request and encourage everyone to find the positive energy and blend it to build a stronger foundation for BAV. We welcome your participation and constructive criticism, if any, because that will help in the continuous development of BAV and a harmonious Bengali community based on honesty and integrity.

Once again I would like to thank all of you for giving me another opportunity to serve you and uphold the values of BAV.

Anindita (Mimi) Sengupta

শ্মশান

জয় গোস্বামী

চুর্ণীনদীর ব্রীজ থেকে দেখতাম
শ্মশান থেকে উঠছে সাদা ধোঁয়া

#

একদিন নামলাম

#

কদমগাছের খানিক দূরে চাঁপা
বটগাছ আর আশশ্যাওড়া নদীর গায়ে গায়ে

#

একটু আগেই বৃষ্টি হয়ে গেছে

# #

আজকে কোনো শব আসেনি
আজকে কোনো শ্মশানধ্বনি নেই

# #

ঘাসের ওপর ভিজে কদম, চাঁপা

#

শ্মশান বলতে আজকে শুধু এই

সাদৃশ্য

বাবার কথা ভাবলে মনে আসে
গৌতম ঘোষদস্তিদারের কথা।

বাবার মতই লম্বা, রোগা। বাবার হাইট ছিল ছফুট এক।
ও হয়ত একটু বেশি কম।
বাবার মতই গাছকে স্নান করায় –
ঝারিতে নয় – জলের পাইপ দিয়ে

বছর তিনেক হল
আমার সঙ্গে কথা বন্ধ ওর
বাবার সঙ্গে দেখা হয়না তিপ্পান্ন বছর।

দুঃখ করো না, বাঁচো

নির্মলেন্দু গুণ

দুঃখকে স্বীকার করো না, –সর্বনাশ হয়ে যাবে।
দুঃখ করো না, বাঁচো, প্রাণ ভ'রে বাঁচো।
বাঁচার আনন্দে বাঁচো । বাঁচো, বাঁচো এবং বাঁচো।
জানি মাঝে-মাঝেই তোমার দিকে হাত বাড়ায় দুঃখ,
তার কালো লোমশ হাত প্রায়ই তোমার বুক ভেদ করে
চলে যেতে চায়, তা যাক, তোমার বক্ষ যদি দুঃখের
নখরাঘাতে ছিন্নভিন্ন হয়; যদি গলগল করে রক্ত ঝরে,
তবু দুঃখের হাতকে তুমি প্রশ্রয় দিও না মুহূর্তের তরে।
তার সাথে করমর্দন করো না, তাকে প্রত্যাখান করো।

অনুশোচনা হচ্ছে পাপ, দুঃখের এক নিপুণ ছদ্মবেশ।
তোমাকে বাঁচাতে পারে আনন্দ । তুমি তার হাত ধরো,
তার হাত ধরে নাচো, গাও, বাঁচো, ফুর্তি করো।
দুঃখকে স্বীকার করো না, মরে যাবে, ঠিক মরে যাবে।

যদি মরতেই হয় আনন্দের হাত ধ'রে মরো।
বলো, দুঃখ নয়, আনন্দের মধ্যেই আমার জন্ম,
আনন্দের মধ্যেই আমার মৃত্যু, আমার অবসান।

স্ববিরোধী

আমি জন্মেছিলাম এক বিষণ্ন বর্ষায়,
কিন্তু আমার প্রিয় ঋতু বসন্ত ।

আমি জন্মেছিলাম এক আষাঢ় সকালে,
কিন্তু ভালোবাসি চৈত্রের বিকেল ।

আমি জন্মেছিলাম দিনের শুরুতে,
কিন্তু ভালোবাসি নিঃশব্দ নির্জন নিশি ।

আমি জন্মেছিলাম ছায়াসুনিবিড় গ্রামে,
ভালোবাসি বৃক্ষহীন রৌদ্রদগ্ধ ঢাকা ।

জন্মের সময় আমি খুব কেঁদেছিলাম,
এখন আমার সবকিছুতেই হাসি পায় ।

আমি জন্মের প্রয়োজনে ছোট হয়েছিলাম,
এখন মৃত্যুর প্রয়োজনে বড় হচ্ছি ।

বাণী বন্দনা

কণিকা দাস

শ্রীপঞ্চমীতে এসো মা 'শ্রীময়ী'
হাতে লয়ে বীণাখানি,
এসো শ্বেত বসনা শুভ্রবরণী
এসো মা হংসবাহিনী।
আম্র মুকুল, শুভ্র পুষ্প
নিয়ে বসে আছি হাতে,
ও রাঙা চরণে অঞ্জলি দেবো
রাঙা পলাশের সাথে।
তোমায় মাগো করিব বরণ
হৃদয়ে ধরিব রাঙা চরণখানি,
মধুর হাসিতে ভুবন ভরায়ে
এসো মাগো বীণাপাণি।
বরপুত্র কালিদাস তব
করিল বন্দনা এ মধুর শ্লোক,
সেই শ্লোক মাগো প্রণাম মন্ত্রে
ঘরে ঘরে আজ ধ্বনিত হোকঃ
"জয় জয় দেবী চরাচর সারে
কুচযুগ শোভিত মুক্তা হারে।"

****

ফিরে দেখা

শিবানী ভট্টাচার্য

পড়ন্ত বিকেলের নরম রোদ দক্ষিণের জানালার গরাদ পেরিয়ে দেবযানীর ঘরের মেঝেতে এসে পড়েছে। বসন্তের বিকেল দেবযানীর খুব প্রিয়। দক্ষিণের বাতাস, বিকেলের নরম রোদ, ওর শরীর মনকে যেন জুড়িয়ে দেয়। বড় ভাল লাগে ওর।

ছোট্ট ফ্ল্যাট দেবযানীর। দুখানা ঘর, ছোট একটা ড্রইং রুম। তবে রান্নাঘরটা বেশ বড়। একা দেবযানীর পক্ষে এই যথেষ্ট। বাড়ীটাতে কোন বারান্দা না থাকাতে ড্রইংরুম এর এই দক্ষিণের জানালাটাই বাইরের জগতের সাথে ওর যোগসূত্র।

পেশায় স্কুল টিচার দেবযানীর সোম থেকে শুক্র স্কুলের বাচ্চাদের নিয়েই কেটে যায়। বাড়ী ফিরতে ফিরতে বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে হয়ে যায়। শনি-রবিবার কোথাও বেরোনোর না থাকলে বিকেলটা দেবযানী এই জানালায় বসেই কাটিয়ে দেয়। বাড়ীর সামনের রাস্তাটা তেমন চওড়া নয়। তবে একটু দূরে একটা পার্ক থাকাতে লোকজন পার্ক এর উদ্দেশ্যে এই পথেই যাতায়াত করে। কেউ বা বাচ্চার হাত ধরে, কেউ প্রেমিক বা প্রেমিকার সঙ্গে। বৃদ্ধ বৃদ্ধারাও বিকেলে পার্ক এ হাঁটতে আসেন। লোকজন দেখতে দেখতে সপ্তাহান্তের বিকেলগুলো বেশ কেটে যায় দেবযানীর। মাঝে মাঝে গুনগুনিয়ে দুকলি গেয়েও ওঠে সে "আমার এই পথ চাওয়াতেই আনন্দ।" এককালে গান গাইতে খুব ভালোবাসতো ও। এখনো যে ভালবাসেনা তেমনটা নয়, তবে আগের মত দম পায়না।

রাস্তার দিকে চোখ যায় দেবযানীর। দুজন ছেলেমেয়ে হাত ধরে এগিয়ে চলেছে। এত ভালো লাগে ওর! সত্যিই তো নিরিবিলিতে কথা বলার জন্য একটা জায়গা তো দরকার। আচ্ছা ওরা কি পরস্পরকে চিঠি লেখে? মনের কথা মুখে বোঝাতে না পারলে চিঠি তো লিখতেই হবে। "কি যে ভাবছি বোকার মতো!" নিজের মনে নিজেই হেসে ওঠে

দেবযানী। এখন এই ইন্টারনেট এর যুগে কেউ কি চিঠি লেখে নাকি!

চোখ দুটো বুজে আসে ওর। কোন স্মৃতির অতলে যেন ডুব দেয় সে। তিরিশ বছর আগের কলেজ জীবন চোখের ওপর ভেসে ওঠে দেবযানীর। কত বন্ধুকে বান্ধবীকে যে প্রেমপত্র লিখে দিয়েছে সে, ভাবলে এখনও রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে ওর মন। কেউ প্রোপোজ করবে, কেউ বা রাগ ভাঙাবে, কত রকম কারণে যে লিখতে হতো দেবযানীকে। একটার পর একটা চিঠি লিখে যেতো সে। পড়াশুনোরও বেশ ক্ষতি হতো এতে, তবুও মনে মনে একটা তৃপ্তি অনুভব করতো দেবযানী। আসলে এ ধরনের লেখায় একেবারে সিদ্ধহস্ত ছিল ও। প্রায় নব্বই শতাংশ লেখা বৃথা যায়নি দেবযানীর। তাইতো এতো চাহিদা ছিল ওর। কেন জানিনা ও কাউকে ফেরাতেও পারতোনা। একেকজন তো এমন কান্নাকাটি জুড়ে দিতো! ও লিখে না দিলে নাকি সম্পর্কটাই ভেঙ্গে যাবে! অগত্যা কিছুটা বাধ্য হয়েই দেবযানী লিখে দিতো।

চূড়ান্ত গোপনীয়তা বজায় রেখে কাজটা করতে হতো। একই কলেজের ছেলেমেয়ে হলে খুবই সমস্যা। কখন জানাজানি হয়ে যায়। একবার তো প্রায় ধরাই পড়ে গিয়েছিলো। কোনও রকমে ব্যাপারটা সামলে নিয়েছিলো দেবযানী। তারপর কিছুদিন একদম সব বন্ধ করে দিয়েছিলো ও।

মধুরা দেবযানীকে দিয়ে জোর করে আবার লেখাতে শুরু করে। ওর কোন উপায় ছিলনা। অবিনদার সঙ্গে যখন মধুরার প্রেমটা বেশ দানা বেঁধে উঠেছে ঠিক সেই সময় অবিনদা নর্থ বেঙ্গল বদলি হয়ে যায়। চিঠি লেখা ছাড়া উপায়ই বা কি। ওর নাকি চিঠি লেখা একদম আসেনা তাই অগতির গতি এই দেবযানী। "প্রেম করতে পারিস, আর সেটা লিখে প্রকাশ করতে পারিসনা?" খুব রেগে মধুরাকে দু-চারকথা বলেছিল দেবযানী। কিন্তু সে তো নাছোড়বান্দা! করুণস্বরে বলেছিল "তুই এবারটা লিখে দে, তারপর থেকে আমিই লিখবো।" বলেছিলো ঠিকই তবে সেটা আর হয়ে ওঠেনি। অবিনদার চিঠি এলে দেবযানী কে এনে ধরিয়ে দিত মধুরা, আর সেও উত্তর লিখে দিত।

এই সব চিঠি লেখার সময় কোন এক কল্পনার জগতে চলে যেতো দেবযানী। সেখানে ও যেন ওর স্বপ্নের রাজপুত্রকে দেখতে পেতো। যাকে সামনে রেখে নিজের মনের মাধুরী মিশিয়ে দেবযানী লিখে যেতো। কখনও ভালবাসা উজার করে দিতো, কখনও বা মান অভিমানের পালা চলতো। যখন যেমনটা দরকার হতো ঠিক তেমনি করেই সে তার কল্পনার রাজপুত্রের সাথে কথা বলতো। নিজেরই তৈরী এই জগৎ থেকে ফিরতে দেবযানীর বড় কষ্ট হতো। হয়তো বা নিজের অজান্তেই সে তার মনের মানুষের জন্যে মনে মনে প্রতীক্ষা করতো। একেকটা চিঠি লেখার পর সেই ঘোর কাটাতে দেবযানীর বেশ কিছুটা সময় লেগে যেত।

অবিনদা আর মধুরার সম্পর্ক টিকিয়ে রাখতে দেবযানীকে সবচেয়ে বেশী বেগ পেতে হয়েছিল। দুজনের স্বভাবের কোন মিলই ছিলনা। তবুও ওদের বিয়েটা হয়েছিল। মধুরা তো ওর বিয়ের দিন বলেছিল যে "তোর জন্যেই বিয়েটা হচ্ছে দেবযানী।" "বোকার মতো কথা বলিসনাতো!" কপট রাগত স্বরে দেবযানী বলেছিল। "তুই যে কি করলি রমিতদার মত ছেলেকে ফিরিয়ে দিলি, খুব ভুল করেছিস দেবযানী। জানিসতো রমিতদা কলকাতায় আসা ছেড়েই দিয়েছে।" একনাগাড়ে কথাগুলো বলে গেল মধুরা। "মন দিয়ে বিয়েটা করতো!" বলে ওখান থেকে উঠে এসেছিল দেবযানী।

কলেজের বা কলেজের বাইরের বেশ কয়েকজন ছেলেই তাকে প্রেম নিবেদন করতে এসেছে। কিন্তু দেবযানী তাদের প্রত্যাখ্যান করেছে। এসব সময়ে ছেলেরা নাকি বোকা হয়ে যায়, আর বোকা ছেলেদের ও একদম সহ্য করতে পারেনা। বন্ধুরা জিজ্ঞেস করলে দেবযানী তাদের এমনটাই বলত। তবে রমিতকে কিন্তু দেবযানীর বেশ

ভালোই লাগত। চার বছর চেষ্টার পর রমিত দেবযানীকে প্রপোজ করে। দেবযানী তাকেও প্রত্যাখ্যান করে। বন্ধুরা জিজ্ঞেস করতে সে বলেছিল "কি জানি কেন যে এমনটা করলাম আমি নিজেও জানিনা। আমিও কি কম কষ্ট পাচ্ছি!" রমিত যখন কথাটা বলতে দেবযানীর কাছে আসে, তখন কিন্তু ওর হৃদস্পন্দন বেড়ে গিয়েছিলো। শরীর মনে কেমন একটা রোমাঞ্চ অনুভব করছিলো। কিন্তু ওর চোখের দিকে তাকিয়ে কি যে হলো দেবযানীর! ও কি সেই কল্পনার রাজপুত্রকে খোঁজার চেষ্টা করছিলো রমিত এর চোখে? হবেও বা। এখন এসব ভেবে কি লাভ? দেবযানী মনে মনে ভাবে। তবে তখন কিন্তু ভেবেছিলো। রমিতকে ফিরিয়ে দিয়ে সেও তো ভালো ছিলোনা। চিঠি লেখার জন্যে কাগজ কলম নিয়ে বসেওছে। কিন্তু লিখতে পারেনি, সেই মুহূর্তে কোথায় যে হারিয়ে যেতো তার সেই স্বপ্নের জাদুকর, তার উপস্থিতি ছাড়া দেবযানী লিখবে কি করে! এর কিছুদিন পর বন্ধুরা খবর দিয়েছিলো রমিত চাকরি নিয়ে বাইরে চলে গেছে। আর এভাবেই দেবযানীর জীবন থেকে হারিয়ে গিয়েছিলো রমিত।

"জানালায় বসে কি ভাবছো দেবযানীদি?" শর্মিষ্ঠার ডাকে সম্বিত ফেরে দেবযানীর। সত্যিই তো কোথায় হারিয়ে গিয়েছিলো সে। "কলেজের কথা মনে পরছিলো রে। তুই কোথায় যাচ্ছিস?" শর্মিষ্ঠাকে জিজ্ঞেস করে ও। শর্মিষ্ঠা দেবযানীর ছোটবোন এর বন্ধু। এই কাছেই থাকে। খুব ভালো মেয়ে। "মেয়ে কে আনতে যাচ্ছি গো। এই এদিকে একটা গানের স্কুলে গত মাসে ভর্তি করিয়েছি।" "যেখানেই যাস ফেরার পথে আমার বাড়ী হয়ে যাস কেমন?" দেবযানী বলে। "দেখি" বলে এগিয়ে যায় শর্মিষ্ঠা। ওর মেয়ে দেবযানীর খুব প্রিয়। পড়াশুনোতে খুব ভালো হয়েছে। মডার্ন হাই তে পড়ে। প্রত্যেক বার প্রথম হয়। একটাই মেয়ে শর্মিষ্ঠার মনের মত করে মানুষ করছে। দেবযানীর খুব ভাল লাগে।

ওর সন্তান থাকলে নিশ্চয় এভাবেই মানুষ করতো দেবযানী। বুকের ভেতরটা কেমন যেন মোচড় দিয়ে ওঠে ওর।

অনিমেষের মুখটা চোখের ওপর ভেসে ওঠে দেবযানীর। মা বাবা দেখেশুনে অনিমেষের সাথে দেবযানীর বিয়ে দিয়েছিলেন। প্রথমদিকে দেবযানীর একেবারেই মত ছিলনা। কারণ অনিমেষের সাথে কথা বলে ওর তেমন ভালো লাগেনি। অর্থনীতির অধ্যাপক অনিমেষ বক্সী অত্যন্ত বাস্তববাদী একজন মানুষ। দেবযানীর স্বভাবের ঠিক উল্টোটা। কিছুদিন ধরে বাবার শরীরটা তেমন ভালো যাচ্ছিলনা। মা তাই দেবযানীকে কিছুটা জোরই করেন রাজি হয়ে যাবার জন্যে। শেষ পর্যন্ত সাত পাঁচ ভেবে দেবযানীও রাজি হয়ে যায়।

আপাতদৃষ্টিতে বিয়েটা ভালো হয়েছে মনে হলেও ওদের মধ্যে তেমন বনিবনা কোনদিনই ছিল না। একবার তো দেবযানী রাগ করে মায়ের কাছে চলে এসেছিল। তবে চলে আসার সাত দিনের মধ্যে অনিমেষ দেবযানীকে চিঠি পাঠায়। তাতে লেখা ছিলঃ

"ফিরে এসো ওগো দেবযানী

তোমার পথের পরে পড়ে আছে হায়

আমার প্রথম লিপিখানি"

প্রথমটা চমকে উঠেছিল দেবযানী। এটা অনিমেষ পাঠিয়েছে? ভাবতে পারছিলনা ও। নির্ঘাত কেউ বলে দিয়েছে। একটা সন্দেহ উঁকি মারে দেবযানীর মনে। তবুও ও বারবার পড়েছিল লেখাটা। কাগজ পেন নিয়ে বসেওছিল অনিমেষকে কিছু লিখবে বলে। কিন্তু না লিখে উঠতে পারেনি ও। এতটাই রাগ আর অভিমান ওর মনে জমেছিল যে নিজের জন্যে লেখার সুযোগ পেয়েও দেবযানী লিখতে পারেনি।

অত্যন্ত সঙ্গত কারণেই দেবযানী রাগ করে চলে এসেছিল। বাচ্চা হওয়া নিয়ে সমস্যা হচ্ছিল ওদের

মধ্যে। ডাক্তার পরীক্ষা করে বলেছিল সমস্যাটা অনিমেষের। ওর কিছু চিকিৎসা দরকার। কিন্তু অনিমেষ একজন শিক্ষিত মানুষ হয়েও তাতে রাজি হয়নি। দেবযানী তাই টানা দুমাস মায়ের কাছেই থেকে যায়। শেষ পর্যন্ত অনিমেষ হার স্বীকার করে । দেবযানীও ফিরে আসে অনিমেষের কাছে।

অনিমেষের চিকিৎসা চলছিল বেশ ভালভাবেই। কিন্তু দেবযানীর ভাগ্যে বোধকরি সুখ ছিলনা। বিয়ের ঠিক পাঁচ বছরের মাথায় এক মারাত্মক পথ দুর্ঘটনায় অনিমেষের মৃত্যু হয়। চূড়ান্ত দুঃসময় নেমে আসে দেবযানীর জীবনে। এক নিমেষে যেন সমস্ত পৃথিবী অন্ধকার হয়ে যায় ওর কাছে।

এতবড় ধাক্কা সামলাতে বেশ সময় লেগেছিল দেবযানীর। বহু প্রচেষ্টায় একটা প্রাইভেট স্কুলে শিক্ষকতার চাকরি জোগাড় করে নিয়েছিল ও। মা বাবা অনেক বলেছিলেন ওদের সাথে গিয়ে থাকতে। কিন্তু দেবযানী রাজী হয়নি। অনিমেষের তৈরী এই ছোট্ট বাড়ীটাতে থাকতেই দেবযানীর ভালো লাগে। মা বাবা কে সেটাই জানিয়ে দেয় ও।

প্রায় কুড়ি বছর হয়ে গেল অনিমেষ চলে গেছে। মা বাবা ও গত হয়েছেন। একমাত্র বোন অন্বেষা। সেও দিল্লীতে স্থায়ীভাবে বসবাস করছে। এককালে খুবই কল্পনা বিলাসী ছিল দেবযানী। মনটাও বড় নরম ছিল। কিন্তু বাস্তব জীবন ওকে অনেক শক্ত করে দিয়েছে।

নিজের জীবনটা নিজের মত করেই গুছিয়ে নিয়েছে ও। স্কুলের ছেলেমেয়েদের কাছে খুব প্রিয় দেবযানী। সপ্তাহের পাঁচটা দিন ওদের নিয়েই কেটে যায়। আর শনি-রবিবার এর বিকেলটা এই জানালায় বসেই কাটিয়ে দেয় দেবযানী।

লোকজনের যাতায়াত, তাঁদের টুকরো টাকরা কথা অনেক সময় চলে আসে ওর কানে। বেশ মজা পায় দেবযানী। মাসে একদিন দুদিন পুরনো বন্ধুদের সাথে আড্ডাও চলে। এমনি ভাবেই সময় কেটে যায় দেবযানীর।

মাঝে মাঝে পুরনো অ্যালবাম নিয়ে বসে ও। মাত্র পাঁচ বছরের বিবাহিত জীবনের নানা ছবি উল্টেপাল্টে দেখে ও। নিজের অজান্তেই চোখ থেকে দুফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ে দেবযানীর।

শর্মিষ্ঠা তুলিকে নিয়ে এসেছিল ফেরার পথে। যেমন মিষ্টি মেয়ে তেমন মিষ্টি নাম। এগ-রোল বানিয়ে রেখেছিল দেবযানী ওর জন্যে। খুব খুশি হয়েছে তুলি। এগ-রোল ওর খুব প্রিয়। বাচ্চাদের খুশি করতে পারলে দেবযানী মনে খুব আনন্দ পায়। শর্মিষ্ঠা চলে যাবার পর দেবযানী একটা গল্পের বই নিয়ে সোফায় এসে বসে। কাল রবিবার কোনও অফিসের ব্যাপার নেই। ওবেলা রান্না করা রয়েছে, মাইক্রোওয়েভে গরম করে নিলেই হবে।

বই এর পাতায় মন দিতে না দিতেই লোডশেডিং। এ আবার কি? আজকাল তো লোডশেডিং হয়না! কি যে বিরক্তিকর কি বলবো, দেবযানী মনে মনে ভাবে। মেজাজটাই বিগড়ে গেল। মোবাইল এর আলোয় মোমবাতি খুঁজতে শুরু করে সে। কোথায় মোমবাতি, শেষপর্যন্ত খুঁজে না পেয়ে সোফায় এসে বসে সে। প্রায় ঘণ্টাখানেক কেটে গেল অথচ আলোর কোনও দেখা নেই। হঠাৎ দরজায় টোকা শুনে নড়েচড়ে বসে দেবযানী। এখন আবার কে এলো! খুব সন্তর্পণে দরজা খোলে দেবযানী। সামনে মোমবাতি হাতে দাঁড়িয়ে একজন ভদ্রলোক। আসলে বোঝা গেল যে এটা পুরোপুরি লোডশেডিং নয়। বেশ কয়েকটা বাড়ীতে আলো চলে গেছে। এই ভদ্রলোক এ পাড়ায় নতুন এসেছেন। এখানকার ল্যাম্পপোস্ট এর নম্বর জানবার জন্যে এসছেন। মোমবাতির আলোয় বড্ড চেনা লাগছিলো ভদ্রলোককে। "রমিত!" নিজের অজান্তেই নামটা উচ্চারণ করে ফেলে দেবযানী। সমস্ত শরীরের মধ্য দিয়ে যেন বিদ্যুৎ খেলে যায় ওর। আনন্দে গলা ধরে আসে দেবযানীর। বহু কষ্টে ও বলে "তুমি এখানে?"

আসলে দেবযানীর কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়ে ছমাসের মধ্যেই রমিত বাইরে চলে যায়। এতবছর বাইরে কাটিয়ে কিছুদিন হলো এপাড়ায় একটা ফ্ল্যাট কিনে এসেছে ও। দেবযানীর প্রশ্নের উত্তরে রমিত যা বলল তা সংক্ষেপে এটাই দাঁড়ায়। দেবযানীর কানে কি সব কথা পৌঁছলো! মোমবাতির আলোয় দুজনে যে দুজনের দিকে কতক্ষণ তাকিয়েছিল কে জানে। সম্বিত ফিরল আলো আসাতে। "আলো এসে গেছে" নীরবতা ভঙ্গ করে রমিত বলল।

বিদ্যুতের আলোয় দুজনের মুখ দুটো যেন আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠলো!

রোববারটা সারাদিনই খুব অস্থির লাগছিল দেবযানীর। কতবার যে দক্ষিণের জানালায় গিয়ে বসেছে ও। কিন্তু রমিত এর দেখা পায়নি। সোমবার স্কুল থেকে ফিরে লেটারবক্সে দেবযানী একটা চিঠি পায়। আজকাল তো চিঠি লেখা উঠেই গেছে, এ চিঠি তবে কে লিখলো? এক অজানা আনন্দে শিহরিত হয়ে ওঠে দেবযানীর মন। কোনরকমে ঘরে ঢুকে সোফায় বসে চিঠিটা খোলে সে। আনন্দে চোখ বুজে আসে দেবযানীর। এইতো তার কল্পনার রাজপুত্রের চিঠি! বহুকাল ধরে যে চিঠির অপেক্ষায় সে বসেছিল। কত নদী মাঠ পর্বত পেরিয়ে এতদিনে তার সেই আকাঙ্ক্ষার ধন তার কাছে এসে ধরা দিয়েছে। চিঠিটা এরমধ্যেই কয়েকবার পড়ে ফেলে দেবযানী। এমন সুন্দর একটা চিঠি তুমি আগে কেন লেখনি রমিত! বড্ড অভিমান হয় ওর।

উঠে দাঁড়ায় দেবযানী। ড্রয়ার খুলে রাইটিং প্যাড বার করে আনে সে। কালো রিফিলের পেনটা খুঁজে বার করে, এই পেন এ দেবযানীর লেখা সুন্দর দেখায়। লিখতে বসে সে। হ্যাঁ জীবনে এই প্রথম, নিজের জন্যে, শুধু নিজের জন্য দেবযানী লিখতে শুরু করে.....।

চিত্রালংকরণ – শ্রীময়ী ভট্টাচার্য

****

প্রার্থনা

শ্যামল কুমার দে

গর্ব আমার খর্ব কর
মান অভিমান হানো
মূর্খ আমি সেই বোধোদয়
মনের মাঝে আনো।
যাচ্ঞা আমার নেই কিছু আজ
আমি অকিঞ্চন
কর্ম কিছুই করছি না হায়
মন কিসে সিঞ্চন?

মুক্ত আমায় করো তুমি
কহি যুক্ত করে
সবার শেষে প্রসাদ দিও
আমি অভুক্তরে।
ঠাঁই যদি না পাই গো আমি
তোমার চরণ তলে
চরণ ধূলি একটু দিও
কৃপা তোমার হলে।

****

জীবন বীমা

কল্যাণ ব্যানার্জী

-১-

গভীর চিন্তামগ্ন মুম্বাই পুলিশের ক্রাইম বিভাগের সেন্ট্রাল অফিসের সিনিয়র ইন্সপেক্টর সুনীল আপ্তে। জোড়া খুন হয়ে গেছে আন্ধেরী-ইষ্টের বিজয়নগর কলোনির এক অ্যাপার্টমেন্টে। এক মহিলা ও পুরুষ – মধ্যবয়স্ক দুজনেই। খুনের কোন কিনারাই হয় নি এখনও। পোষ্টমর্টেম রিপোর্ট অনুযায়ী অনেকটা এক্সিকিউশন করার পদ্ধতিতে গুলি করা হয়েছে অত্যন্ত কাছ থেকে দুজনকেই মাথার পেছনে পিস্তল ঠেকিয়ে। ফায়ারিং-এ ক্ষতস্থানের পাশে মাথার চুলও পুড়ে গেছে একটু করে। আর ফরেনসিক রিপোর্ট অনুযায়ী চাইনিজ মেক ৯ মিলিমিটার বোরের পিস্তল থেকে গুলি করা হয়েছে দুজনকে। মুম্বাইতে এ ধরণের অস্ত্র সাধারণতঃ মাফিয়া কিলাররা ব্যবহার করে – বাজার ছেয়ে গেছে, বলা মুশকিল সাপ্লায়ার কারা। ধস্তাধস্তির চিহ্ন আছে দুজনের শরীরেই। মনে হয় আততায়ীর সংখ্যা একের বেশি।

এ-সি-পি সেন্ট্রাল অফিস থেকে পাঠানো রিপোর্ট পুংখানুপুংখ ভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে কিন্তু কিছুতেই হদিশ মিলছে না কিছু। অ্যাপার্টমেন্টের জিনিষপত্র কিছু ওলট পালট অবস্থায় পাওয়া গেছে কিন্তু কিছু চুরি গেছে বলে মনে হয় না – তবে একটা ল্যাপ্‌টপ্‌ মিসিং বলে মনে হয়, তার কেসটা শুধু পড়ে ছিল কফি টেবিলের

ওপরে। পুলিশের খাতায় লিপিবদ্ধ ঐ এলাকার কয়েকজন ইনফরমারকেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে কিন্তু এ পর্যন্ত সুরাহা হয় নি কিছু। এদিকে খবরের কাগজের রিপোর্টাররা ঘন ঘন খোঁজ খবর করে ব্যতিব্যস্ত করে ফেলছে – সাত দিন হয়ে গেল স্যর, এখনও পর্যন্ত আপনারা কোন ক্লু খুঁজে পেলেন না? কি বলব আমরা পাবলিক কে? বার বার ফোন আসছে ওপরতলা থেকেও – জয়েন্ট কমিশনার, ক্রাইম খবর নেন প্রায়-ই – মন্ত্রীকে কি রিপোর্ট দেওয়া যেতে পারে?

খুনের মোটিভ কী – সে চিন্তা এসেছে সবার আগেই। খোঁজ খবরে যা জানা গেছে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ছিল না ঐ পুরুষ ও মহিলাটির মধ্যে। বয়-ফ্রেন্ড, গার্ল-ফ্রেন্ড সম্বন্ধ বলা যেতে পারে অথচ দুজনেই নাকি ডিভোর্সড। মহিলার আগের হাজব্যান্ড প্রাইম সাসপেক্ট হলেও তার অ্যালেবাই সাংঘাতিক জোরালো। ঘটনার দিন সে নাকি ছিলই না মুম্বাইতে – সে বিষয়ে প্রমাণপত্রও দাখিল করেছে। অথচ তার অ্যাপার্টমেন্ট সার্চ করে যে ইন্সিওরেন্স পলিসি

ডকুমেন্ট পাওয়া গেছে সেটা অনুযায়ী ঐ হাজব্যান্ড প্রচুর টাকা পাবে এক্স-ওয়াইফের মৃত্যুতে। সুতরাং সে মোটিভ্ তো আছেই তাছাড়া মহিলার বয়-ফ্রেন্ড নাকি এক্স-হাজব্যান্ডের পুরোন বন্ধু। জেলাসি-কিলিং-ও আরেকটি মোটিভ্ হতে পারে। মৃতের পাড়াপড়শি, অফিস, ক্লাব ইত্যাদি সব জায়গায় তদন্ত করে মোটামুটি একটা থিয়োরি খাড়া করা গেছে - মুম্বাইতে সেদিন না থাকলেও আগের স্বামীটি অনায়াসে একাজ ভাড়াটে গুন্ডা দিয়ে করিয়ে থাকতে পারে। কিন্তু প্রমাণ? আর ডিভোর্সের এতদিন পরে কেন? হাতে সে রকম প্রমাণ কিছু না থাকলে অ্যারেস্ট করাও যাচ্ছে না কাউকে। হাজবান্ডকে থানায় ধরে নিয়ে এসে একটু হাই ডোজের জেরা করার কথা এসেছে মাথায় – কবুল করতেও পারে জেরার মুখে।

একটা ব্যাপার বোধগম্য হচ্ছে না ঠিক মত। মহিলার অ্যাপার্টমেন্টে তল্লাসি করে আরেকটি ইন্সিওরেন্স পলিসিও পাওয়া গেছে। স্বামীর নামে পলিসিটি, আর নমিনি ঐ মহিলা। অর্থাৎ স্বামীর মৃত্যু হলে মহিলারও প্রচুর অর্থলাভের সম্ভবনা ছিল।

-২-

প্রথম আলাপের পরিস্থিতি কিছুটা নাটকীয়। ম্যাক্রো-ইকনমিক্সের ক্লাস কেটে হাজিরা দিয়েছিল অলকানন্দা কলেজ স্ট্রীটের ইন্ডিয়া কফি হাউসে – এর পরের দুটো পিরিয়ড বাদ দিয়ে ক্লাস আবার। পরিচিত পরিবেশ, প্রায়ই আসে এখানে - বেয়ারারা মোটামুটি মুখ চেনে। সিঁড়ী বেয়ে উঠে ওপরের হলে এসে এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখল ভাল করে - বন্ধুদের কাউকেই চোখে পড়ল না। বেলা প্রায় বারোটা বাজে - বেশ ভিড় থাকে এসময়ে, কোন টেবিল খালি নেই। চেনা মুখ দেখে বেয়ারা সাতকড়ি হাজরা তাড়াতাড়ি এগিয়ে এল হাসি মুখে – আসুন ম্যাডাম, ঐ কোণের ৫ নম্বর টেবিল খালি হবে এখুনি। তা আপনারা ক'জন?

এদিক ওদিক তাকিয়ে হাসিমুখে জবাব দিল অলকানন্দা – ক'জন আবার? চার জন-ই তো আসি আমরা। ওরা সব বোধ হয় নিচেই এখনও। আসছি আমি সবাইকে নিয়ে – তর তর করে নেবে গেল সিঁড়ী দিয়ে।

ইতিমধ্যে শ্রাবণী এসে অপেক্ষা করছিল নিচে। অলকানন্দাকে নামতে দেখে এগিয়ে এল – বিথী আর মল্লিকার একটু দেরী হবে আসতে, ওরা সুবীরের সঙ্গে দেখা করে আসছে আর দশ মিনিটের মধ্যে।

- দশ মিনিট! – প্রায় লাফিয়ে উঠল অলকানন্দা – জানিস, কফি হাউসের এখন পিক টাইম। জায়গা পাওয়া ভীষণ মুশকিল। আর বীথি, সুবীরের পেছনে এখনও কেন যে ঘুরছে বুঝতে পারছি না। অত্যন্ত চালু ছেলে, সামনা সামনি ফ্লার্ট করবে। ওর কটা গার্ল ফ্রেন্ড আছে জানিস? বেশি ঘনিষ্ঠতা করলে শেষ পর্যন্ত একেবারে ছোবড়া করে ছেড়ে দেবে। আমি আগেও বলেছি বীথিকে, ন্যাকামো যত সব – গর গর করে উঠল এবার বিরক্তিতে।

ঘন ঘন ঘড়ি দেখতে দেখতে মিনিট দশ/বারো কেটে গেল এরপর। মল্লিকা আর বীথি এসে হাজির হাঁপাতে হাঁপাতে। একটু অপ্রস্তুত হাসি মল্লিকার মুখে – কি একটা বলতে যাচ্ছিল, বাধা দিল অলকানন্দা – চল্ আর কোন কথা নয় – সবাইকে নিয়ে ওপরে উঠে এল তাড়াতাড়ি। হলে ঢুকে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল সেই কোণের টেবিলের কাছে। চোখ কপালে উঠল এবার – কোথায় খালি টেবিল? একটা গ্রুপ এসে এর মধ্যে বসে গেছে ৫ নং টেবিলে – দুটি ছেলে আর মেয়ে, জোড়ায় জোড়ায়।

দূর থেকে ব্যাপার দেখে সহাস্য বদনে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এল মুশকিল আসানের মালিক সাতকড়ি হাজরা। ৫ নং টেবিলে বসা গ্রুপটির দিকে এক লহমা তাকিয়ে বলল - ম্যাডাম, আপনাদের আসতে দেরী হওয়ায় এনারাই বসে পড়লেন। আমি দেখছি অন্য টেবিল যদি খালি হয়।

উস্মা এবার ফেটে পড়ল অলকানন্দার কথায় – কি আশ্চর্য ব্যাপার, রিজার্ভ করা আছে শুনেও বসে পড়ল? – চরম বিরক্তি সহকারে তাকিয়ে দেখল টেবিলে বসা গ্রুপটির দিকে। পারলে ভস্ম করে বুঝি বা।

বিফল যায় নি মন্তব্যটুকু। এবার হঠাৎ হুঁশ হল যেন ৫ নং টেবিলের। নিজেদের মধ্যে মশগুল গল্প থামিয়ে একটি সুদর্শন ছেলে চেয়ার ঘুরিয়ে বসে সোজাসুজি তাকাল অলকানন্দার মুখের দিকে – নমস্কার, আমার নাম দেবেশ ... দেবেশ নন্দী। আপনি কিছু বলছেন আমাদের এই টেবিলে বসা নিয়ে?

- হ্যাঁ, একটু আগে এসে এই টেবিলটা আমি রিজার্ভ করে গিয়েছিলাম – দেবেশের চোখে চোখ রেখে বেশ ঝাঁঝালো গলায় উত্তর দিল অলকানন্দা।
- ওঃ, আপনার নামটা জানতে পারি? – পরম কৌতুকে হাসি মুখে তাকিয়ে আছে অলকানন্দার দিকে।

- কেন? নাম দিয়ে কি হবে?

- আরে নামটাই তো আসল। কার সাথে কথা বলছি জানতে হবে না? আপনারা মনে হচ্ছে কফি হাউসে নতুন আমদানি। নইলে এখানে যে রিজার্ভ সীট বলে কিছু নেই সেটা জানা উচিৎ ছিল। ইংরিজি মতে এখানে ফার্স্ট কাম ফার্স্ট সার্ভড, টেবিল খালি হলেই বসা যায় – রিজার্ভেশন বলে নেই কিছু। আমার কথা বিশ্বাস না হলে এখানকার ম্যানেজার কিংবা যে কোন কর্মচারীকে জিগোতুনকরলে আমরা সবাই উঠে যেতে পারি। কথাগুলো বলে হাসিমুখেই যোগ করল আবার – কৈ, নামটা তো বললেন না।

দু-কানের ফর্সা লতিগুলো লাল হয়ে উঠেছিল এর মধ্যে – নাম শোনার আর দরকার নেই। আপনাদের কষ্ট করে উঠতেও হবে না – এক ঝটকায় মুখ ফিরিয়ে নিয়ে সঙ্গীদের ডেকে নিয়ে উল্টোদিকের একটা সদ্য খালি হওয়া টেবিলে গিয়ে বসল অলকানন্দা। উত্তেজনা স্তিমিত হচ্ছে ক্রমশ। অনিচ্ছা সত্ত্বেও চোখ ফিরল ৫নং টেবিলের দিকে – স্মিত হাসিতে তাকিয়ে তখনও দেখছে তাকে দেবেশ নন্দী।

দিন কেটেছে এর পরে নিজের গতিতেই। প্রথম আলাপের সেই তিক্ত মুহূর্ত ক্রমশ মিলিয়ে গেছে দূরে - বিগত সময়ের প্রলেপে। কিছুদিন পরে কফি হাউসেই দেখা হয়েছে আবার। কয়েকজন বন্ধুদের সাথে দরজার মুখেই এক টেবিলে বসে আড্ডায় মশগুল ছিল দেবেশ, হঠাৎ দরজা দিয়ে অলকানন্দাকে ঢুকতে দেখে উঠে দাঁড়াল তাড়াতাড়ি। একটা খালি টেবিল দেখিয়ে আপ্যায়ন - নমস্কার। আসুন আসুন, এই টেবিলটা সবে খালি হয়েছে। আমি নজর রাখছিলাম। আপনি আজ একা মনে হচ্ছে। অনুমতি দিলে এখানেই বসতে পারি আপনার সাথে আলাপ করার জন্য। আশা করি এর মধ্যে রাগ পড়েছে আপনার। নামটা কিন্তু জানতে পারি নি এখনও।

ভাগ্য এবার সুপ্রসন্ন। এর পরে ঐ মুখে হাসির রেখা দেখতে পেয়েছে, নামটাও জানতে পেরেছে।

- বাঃ, বেশ সুন্দর নাম তো। দেবপ্রয়াগে ভাগীরথী আর অলকানন্দার সঙ্গমে জন্ম নিয়েছে মা গঙ্গা। কী ভীষণ তেজী সেখানে অলকানন্দা। নামের সৌজন্যে সে তেজের নমুনা অবশ্য আগের দিনই চোখে পড়েছে।

ফর্সা মুখখানা রক্তিম হয়ে উঠেছে এক নিমেষে। ছদ্ম রাগে ঝংকার দিয়ে উঠেছে এবার হাসিমুখেই – আপনি ভীষণ ফাজিল তো। সেই আগের দিনের ব্যাপার নিয়ে খোঁচা মারছেন এখনও। অমন করলে কিন্তু উঠে চলে যাব এখান থেকে।
দুহাত তুলে এবার আত্মসমর্পণ দেবেশের – মাপ চাইছি, ও প্রসঙ্গ তুলব না আর কোনদিন।

প্রথম আলাপ ঐ পর্যন্তই। এর পরে দেখা হয়েছে প্রায়ই, কফিহাউসে মোটামুটি নিয়মিত খদ্দের দুজনেই। যে যার বন্ধুদের সাথে আসে গল্প করে নিজেদের পরিবেশে। অথচ একে অপরের সান্নিধ্য সম্বন্ধে সচেতন মনে মনে। হঠাৎ দৃষ্টি বিনিময়ের সুযোগ হলে স্মিত হাসির আমন্ত্রণ জাগে। সামনা সামনি দেখা হলে দুএকটা বাক্য বিনিময়েও আপত্তি নেই। মোটামুটি একটা ছন্দের মধ্যে চলছিল জীবন, ব্যতিক্রম ঘটল হঠাৎ। দিন দুই হল পাত্তা নেই আর দেবেশ নন্দীর। নজরে পড়েছে অলকানন্দার প্রথম

দিন-ই তবে খুব একটা আমল দেয় নি এ ব্যাপারে। গোটা সপ্তাহ কাটল এর পরে, এখনও কোন পাত্তা নেই সে ছেলের। শেষ পর্যন্ত আর নিজের কৌতূহল সামলে রাখা গেল না – পায়ে পায়ে একদিন নিজেদের টেবিল থেকে উঠে গেল ঐ কোণের টেবিলের দিকে - দেবেশ নন্দীর বন্ধু ক'জন ছিল সেখানে। একজনকে চেনে – সমীর বিশ্বাস। দেবেশ-ই পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল একদিন কফিহাউসের সিঁড়ী দিয়ে ওপরে ওঠার সময় দেখা হয়ে যাওয়ায়। চোখ তুলে তাকাল সমীর বিশ্বাস জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে।

খোঁজ করল অলকানন্দা - কী ব্যাপার? আপনার বন্ধুর বেশ অনেকদিন পাত্তা নেই কেন?

- ওঃ, দেবেশের কথা বলছেন? শোনেন নি? অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে একটা ওর!

হঠাৎ যেন সজোরে ধাক্কা খেয়েছে অলকানন্দা – হাঁ করে তাকিয়ে দেখছে সমীরকে। বিশ্বাস করতে পারছে না ওর কথাগুলো।

সপ্তাহখানেক আগে সকালের দিকে ট্যাক্সি করে পিসীকে তার তালতলার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে ঐ ট্যাক্সিতেই নিজের কলেজের দিকে রওনা দিয়েছিল দেবেশ। হঠাৎ ব্রেক কসে দাঁড়িয়ে পড়ে ট্যাক্সি – সামনে আরও কিছু গাড়ি লাইন দিয়ে দাঁড়ানো। লোকজন সব ছুটছে রাস্তায় – দুই রাজনৈতিক দলের মধ্যে নাকি খণ্ড যুদ্ধ শুরু হয়েছে। ট্যাক্সিওয়ালা যেতে রাজী নয় আর, ভাড়া মিটিয়ে নেমে যেতে বলল । উপায় না দেখে নামবার উদ্যোগ করছিল দেবেশ, হঠাৎ একটা আধলা ইট এসে আছড়ে পড়ল ট্যাক্সিতে বসা দেবেশের দিকের দরজার কাঁচে। মুহূর্তের মধ্যে চুরমার হয়ে গেল দরজার কাঁচ আর ছোট ছোট টুকরো তীব্র গতিতে এসে বিদীর্ণ করল দেবেশের মুখের বাঁ দিকের অনেকটা অংশ। রক্তে ভেসে গিয়েছিল মুখ, জ্ঞান হারাল দেবেশ।

ঘটনা চোখে পড়ায় রাস্তা থেকেই দুই ভদ্রলোক এসেছিলেন দৌড়ে। ড্রাইভারকে ধমক দিয়ে ঐ ট্যাক্সি করেই নিয়ে তোলেন কলেজ স্ট্রীট মেডিক্যাল কলেজের এমারজেন্সিতে। ওখানেই অ্যাডমিশন হয়েছে দেবেশের। খবর পেয়ে দেখতে গিয়েছিল সমীর – বরাত জোরে প্রাণে বেঁচে গেছে। তবে বেশ কয়েকটা কাঁচের টুকরো ঢুকে আছে এখনও বাঁ দিকের গালে আর কানের পাশে। আস্তে আস্তে অপারেশন করে বের করতে হবে ওগুলো। সময় লাগবে ক'দিন।

বৃত্তান্ত শুনে পা দুটো যেন হঠাৎ আটকে গেছে মেঝের সাথে, হাঁ করে তাকিয়ে আছে অলকানন্দা।

- যাবেন দেখতে? কাছেই তো, জেনারেল ওয়ার্ডে বেড নং ৮ – মুখের দিকে তাকিয়ে যোগ করল সমীর।

- হ্যাঁ, যাব। কিন্তু খুঁজে বের করতে পারব তো আমি?

- চলুন, আমি যাব সঙ্গে।

জেনারেল ওয়ার্ডে ৮নং বেডের সামনে অলকানন্দাকে এনে হাজির করে বিদায় নিল সমীর – ক্লাস আছে একটা যেতেই হবে।

মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধা, চোখ বুজে শুয়েছিল দেবেশ, মাথার কাছে কারও উপস্থিতি টের পেয়ে তাকাল চোখ খুলে। নিজেকে যেন বিশ্বাস করতে পারছে না। একটা নিশ্চিন্ত তৃপ্তির হাসি ছড়িয়ে পড়ল মুখে, ডান হাতখানা বাড়িয়ে দিল পরক্ষণেই – ওঃ, তুমি? এস, বস – ইংগিতে দেখিয়ে দিল বেডের পাশে রাখা চেয়ারটাকে। কিছুক্ষণ মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে আস্তে আস্তে চেয়ারে বসল অলকানন্দা, জড়িয়ে ধরল এবার দেবেশের প্রশস্ত হাত নিজের দু হাতের মধ্যে

– কেমন আছ? - অস্ফুস্ট ধরা গলার আকুতিটুকু আর গোপন করার প্রচেষ্টা ছিল না।

আরও সপ্তাহ দুয়েক বাদে ছাড়া পেয়েছে হাসপাতাল থেকে। এর পরে আলাপ আরও গাঢ় হয়েছে, অন্তরঙ্গতা আরও বেড়েছে। ইকনমিকস্ অনার্সে প্রেসিডেন্সির সেকেন্ড ইয়ারের ছাত্রী অলকানন্দা বসু, আর গোয়েঙ্কা কলেজের এম-কম কোর্সের ফাইন্যাল ইয়ারের ছাত্র দেবেশ নন্দী খুঁজে পেয়েছে পরস্পরের মনের মানুষকে। এর পরে দিন কাটার সাথে সাথে কফিহাউসের

সীমাবদ্ধতা ক্রমশ দূর হয়েছে। অনায়াসে নিজের বাড়িতে আমন্ত্রণ জানিয়ে মা বাবা ও পরিবারের অন্যান্যদের সাথে দেবেশের আলাপ করিয়ে দিয়েছে অলকানন্দা। সবারই পছন্দ হয়েছে ছেলেটিকে। অমায়িক কথা বার্তা, আত্মবিশ্বাস আর নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সুষ্ঠু পরিকল্পনা ভাল লেগেছে সবার।

কয়েকটা বছর অতিবাহিত হয়েছে এর পর ব্যস্ত জীবনের তাগিদে। এম কম সসম্মানে পাশ করার পর চার্টার্ড একাউন্টেন্সি কোর্স আরম্ভ করেছে দেবেশ আর কোলকাতার এক মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে আর্টিকল্ শিপ সেই সাথে। ইতিমধ্যে ইকনমিকস্ অনার্সে বেশ ভাল রেজাল্ট করে পাশ করার পর মোটামুটি একটা চাকরির চেষ্টায় আছে অলকানন্দা। ডাক পড়ল একদিন পিতৃদেবের কাছ থেকে – কি করবে ভাবছ এবার?

সচকিত হয়েছে অলকানন্দা – দেখি, সুবিধে মত চাকরি পাই কিনা একটা।

মাস্টার্সটা শেষ করে নাও আগে। পড়ায় একবার বাধা পড়লে পরে আবার এগোন মুশকিল – পরিষ্কার নির্দেশ ওনার।

অগত্যা পিতৃইচ্ছা মেনে নিয়ে ইকনমিকস্-এ মাস্টার্স শুরু করা ছাড়া অন্য কিছু আর ভাবতে পারে নি। অবশ্য বিয়েটা কবে সেরে ফেলবে সে প্রশ্নও ওঠে মাঝে মধ্যে পারিবারিক আলোচনার পরিবেশে।

- দাঁড়াও দাঁড়াও, আমার পড়ার ল্যাঠা চুকুক আগে। তাছাড়া ওকেও আগে দাঁড়াতে দাও নিজের পায়ে। এই তো সবে আরটিকল্শিপ আরম্ভ করেছে। তাছাড়া পড়াশোনা খতম হলে চাকরি জোগাড় করতে হবে আমাকে একটা। নিজের পায়ে আমিও দাঁড়াতে চাই। নিজের রোজকারের ব্যবস্থা না থাকলে মেয়েদের চিরকাল পরনির্ভর হয়ে থাকতে হয়। তা ছাড়া আজকাল আর একটা রোজগারে সংসার চলে না – সাবলীল ঘোষণা অলকানন্দার।

এরপর দিন কেটেছে নিজের তাগিদেই, মাস ঘুরে আবার বছরও। দেবেশের আরটিকল্শিপ শেষ হয়েছে সময় মতই। ঐ কোম্পানিতেই একাউন্টেন্সি ডিভিসনে চাকরির সুযোগ পেয়েছে সাথে সাথে। নতুন উদ্দীপনায় কর্মজীবন শুরু হয়েছে এবার। এই তো সবে শুরু, জীবনের উন্নতির সিঁড়ী বেয়ে উঠতে হবে অনেক ওপরে। চোখ কান খোলা রেখে চলতে হবে যদি আরও কিছু ভাল সুযোগ পাওয়া যায় – এই মন্ত্রে বিশ্বাসী দেবেশ। যোগাযোগ রেখেছিল রিক্রুটমেন্ট এজেন্সির সাথে, বায়োডাটার কপি দেওয়াই ছিল। মনোমত অন্য কোন চাকরির ইন্টারভিউ দিয়েছে দু-একটা।

আশাবাদী জীবন, দিন কেটে যাচ্ছিল হৈ হৈ করে। ইতিমধ্যে খুব ভাল রেজাল্ট করে ইকনমিকস্-এ মাস্টার্স প্রোগ্রাম শেষ করেছে অলকানন্দা। ইউনিভার্সিটির এক প্রফেসরের বিশেষ স্নেহধন্যা – পি-এইচ-ডি করতে বারবার উৎসাহ দিয়েছেন। আপাতত চাকরির চেষ্টা করবে না পি-এইচ-ডি আরম্ভ করবে পারিবারিক গবেষণার বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছিল ব্যাপারটা। এমন সময় শুভ সংবাদ এল আরেকটা। কিছুদিন আগে মুম্বাই-এর নামকরা মাল্টি-ন্যাশনাল কোম্পানিতে একটা ভাল পজিশনের জন্য ইন্টার্ভিউ দিয়েছিল দেবেশ। প্রথম ইন্টারভিউতে সিলেকশন হবার পর দ্বিতীয় ইন্টারভিউর জন্য দৌড়তে হয়েছিল মুম্বাই। ঈশ্বরের আশীর্বাদে ওখান থেকে অফার এসেছে। বর্তমান চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে নতুন চাকরিতে কত তাড়াতাড়ি জয়েন করতে পারবে জানাবার নির্দেশ এসেছে।

এরপর আর বিয়ের পাটটা চুকিয়ে না ফেলার কোন কারণ ছিল না। সবাই ভীষণ খুশি অলকানন্দার পরিবারে, মা বাবা থেকে আরম্ভ করে দাদা বৌদি আর ছোট ভাইটিও। চার বছরের বড় দাদা আর ছোট ভাই দুবছরের ছোট ওর থেকে – খড়গপুর আই-আই-টির ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র। বিয়ে যে হবে সেটা জানত সবাই – দেবেশের বাড়ির লোকদের সাথেও কথাবার্তা পাকা হয়ে আছে অনেকদিন আগে থেকেই। কিন্তু কবে হবে সে বিষয়ে খুব একটা মাথা ব্যথা ছিল না কারও। সবার হৈ হৈ-এর মধ্যে ক্ষীণ গলায় অলকানন্দার অভিযোগটুকু কানে নেয় নি কেউ – আমি কী করব তা'হলে মুম্বাইতে গিয়ে? এসব কথায় পাত্তা দেবার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। বিয়ে তো হোক তারপর ওখানে গিয়ে কিছু করার সুযোগ আসবে অনেক।

হৈ হৈ করে হয়ে গেল বিয়ে। দেবেশের বাবা গত হয়েছেন অনেকদিন। একটিই ছেলে মায়ের। মামাই বরকর্তা। বরানগর থেকে এসেছিলেন বরযাত্রীদের সবাইকে নিয়ে। আন্তরিক প্রশংসা করে গেলেন সব কিছুর সুষ্ঠু আয়োজন দেখে। আর নতুন বউ-এর প্রশংসায় পঞ্চমুখ – এত সুন্দর, বিদুষী আর গুণী মেয়ে নাকি সহজে নজরে পড়ে না। যাবেন সবাই আপনারা বরানগরে বৌভাতে – নিমন্ত্রণ পত্র দিয়ে করজোড়ে সবাইকে অনুরোধ করে গেলেন তিনি।

এরপরে সাঙ্গ হয়েছে বৌভাতের উৎসবও, পালা শেষের ক্লান্ত অবসাদ। ফুলশয্যার রাত্রে কাছে টেনে নিয়ে আবার মনে করিয়ে দিয়েছে দেবেশ – নামটা কিন্তু সত্যিই সুন্দর। দেবপ্রয়াগে মা গঙ্গার জন্ম কাহিনি বলেছিলাম, মনে আছে তো? ছদ্ম রাগে সরে গেছে অলকানন্দা – আবার ফাজলামি? আমি পালাব কিন্তু ঘর থেকে।

-৩-

নতুন জীবনযাত্রা শুরু হয়েছে দুজনের মুম্বাইতে – একটা ঘোরের মধ্যে দিন কাটছে যেন, বিশ্বাস হচ্ছে না সঠিক। এখানে চাকরি বেশ পছন্দ হয়েছে দেবেশের, পরিবেশ ভাল – কাজের স্বাধীনতাও বেশ অনেকটাই। প্রতিপদে আর ওপরঅলার অভিমত নেবার দরকার হয় না। থানে অঞ্চলে ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছে একটা। দু-বেডরুমের ফ্ল্যাট, ভাড়া আকাশ ছোঁয়া। কোম্পানির নির্দিষ্ট হাউসিং অ্যালাওয়েন্স অবশ্য কুলায় না – নিজের পকেট থেকে অনেকটাই দিতে হয়। এর আগে হোটেলে ছিল দিন সাতেক। প্রায় হাঁপিয়ে উঠেছিল দুজনেই, দিনের পর দিন হোটেল বাস সম্ভব নয়। ফ্ল্যাটে এসে ভাল লাগছে অনেকটাই, অতিযত্নে ঘর সাজাতে আরম্ভ করেছে অলকানন্দা।

- খবরের কাগজটা রেখে দেখ তো চেয়ে কফি টেবিলটা এই ভাবে রাখব, না কোণাকুণি রাখলে আরও ভাল দেখাবে? – দেবেশের মতামত নেয় সামনে থাকলে।

নিজের নতুন সংসার, খুবই উৎসাহ অলকানন্দার সব সাজিয়ে গুছিয়ে রাখতে। ক্রমশ পড়শি এবং অন্যান্য লোকজনের সাথে আলাপ শুরু হল। চাকরির সহকর্মী ক'জন ছাড়াও আরও কয়েকটি বন্ধু বান্ধবও জুটে গেল দেবেশের। সপ্তাহান্তে এর ওর বাড়ি যাওয়া বা নিদেন পক্ষে জুহু বিচ বা অন্য কোথাও বেড়িয়ে আসা, মোটামুটি ভালই কাটছিল জীবন। তবে মাস ছয়েকের মধ্যে হাঁপিয়ে উঠল অলকানন্দা – কেমন যেন একঘেয়ে লাগে দিনের পর দিন বাড়িতে বসে। এবারে একটা চাকরির চেষ্টা করতেই হবে।

আরম্ভ হল চাকরি খোঁজা আর একটা সত্য হৃদয়ঙ্গম হল অল্পদিনের মধ্যেই। ফ্রেস গ্র্যাজুয়েট অবস্থায় চাকরি শুরু করতে না পারলে সব চাকরিতেই কিছু পূর্ব অভিজ্ঞতার দরকার হয়। অতএব স্ট্র্যাটেজি বদলানো দরকার। দেবেশই পরামর্শ দিল – এম-বি-এ-টা করে ফেল। ওটা করলে চাকরির আর চিন্তা থাকবে না। ফাইন্যাল ইয়ারে ক্যাম্পাস লেভেল থেকেই রিক্রুটমেন্ট শুরু করে অনেক মাল্টিন্যাশনাল।

চিন্তা ভাবনা করে খোঁজ খবর শুরু হল এম.বি.এ কোর্সের অ্যাডমিশনের। শেষপর্যন্ত পুনের ইন্ডিয়ান স্কুল অব বিজনেস ম্যানেজমেন্ট এন্ড অ্যাডমিন্সট্রেশনের দুবছরের ডিস্টান্স অন লাইন এম.বি.এর কোর্সে এনরোল করল অলকানন্দা। দু-বছরের কোর্স, আবার শুরু হল বিদ্যা দেবীর আরাধনা।

ভবঘুরে সময় কারও জন্য বসে থাকে না। নতুন চাকরিতে নিজেকে ভাল ভাবে প্রতিষ্ঠা করা নিয়ে দেবেশ আর এম.বি.এ- কোর্স নিয়ে ব্যস্ত অলকানন্দা – কোথা দিয়ে যে একটা বছর কেটে গেল ঠাহর হল না সঠিক। প্রথমবার্ষিক পরীক্ষার দিনও এসে গেল ঘাড়ের ওপর। পরীক্ষার সেন্টার খুব একটা দূর নয় এ ফ্ল্যাট থেকে। থানে থেকে দুটো স্টেশন পরে। নিজেই যেতে পারবে অলকানন্দা। কয়েকদিনের মধ্যে শেষ হল পরীক্ষা – ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। ভালই হয়েছে প্রশ্নপত্র, মোটামুটি খুশি অলকানন্দা। ইতিমধ্যে আরেকটি সুসংবাদ এসেছে। ছোটখাটো একটা প্রমোশন হয়েছে দেবেশের। যাক পুজোর সময় এবার অল্প কিছুদিনের জন্য কোলকাতা ঘুরে আসতেই হবে। বহুদিন দেখা হয় নি বাড়ির লোকের সাথে।

ব্যস্ত ছকে বাঁধা জীবন আবার। চাকরি নিয়ে আছে দেবেশ – উন্নতির সিঁড়ী বেয়ে ওপরে ওঠাই জীবনের প্রথম লক্ষ্য এখন আর ফাইন্যাল ইয়ারের পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত অন্যজন। এর মধ্যে খবর নিয়ে এল একদিন দেবেশ, একটা এপার্টমেন্ট বুক করার কথা ভাবছে।

- এপার্টমেন্ট? – হাঁ করে তাকিয়ে আছে অলকানন্দা – কোথায়? কত দাম? কেনার টাকাই বা কোথায় তোমার?

একটু ইতস্তত করে ব্যাখ্যা করল দেবেশ – কো-অপারেটিভ ভিত্তিতে ৩ বেডরুম এপার্টমেন্ট তৈরি হচ্ছে আন্ধেরী ইস্ট-এর বিজয়নগর কলোনিতে। ৫ লাখ দিয়ে বুক করতে হবে এখন। হ্যান্ডওভারের সময় আরও ৫ লাখ। তারপর আরও ২০ বছরের কিস্তিতে বাঁধাধরা অল্প সুদে বাকিটা শোধ করতে করতে হবে। জমিটা সরকারী বলেই এই দাম আর টার্মসে পাওয়া যাচ্ছে, নইলে সম্ভব ছিল না এতে হাত দেবার। খবরের কাগজে কোন অ্যাড্ দেয় নি – প্রাইভেট কোঅপারেটিভ, সবাই জানে না। অফিসের একজনের মাধ্যমে খবর জোগাড় করে ঐ অঞ্চলের এক মাতব্বরকে ধরে খোঁজ করেছিল দেবেশ – একটা ক্যানসেলেশন হওয়াতে এলোকেশনে রাজী হয়েছেন সেক্রেটারি ভদ্রলোক। লাখখানেক টাকা জমেছে এর মধ্যে বাকিটা লোন নেবে ভাবছে ব্যাঙ্ক থেকে।

- সে বুঝলাম। কিন্তু অত টাকা শোধ করবে কি করে? – উৎসুক জিজ্ঞাসা অলকানন্দার।

- কেন, তোমার তো এম-বি-এ-কোর্স শেষ হয়ে এল প্রায়। দুজনে চাকরি করলে লোন শোধ করতে খুব একটা অসুবিধে হবে না আমাদের – হাসিমুখেই জানিয়েছে দেবেশ।

সে যুক্তি মেনে নিয়েছে অলকানন্দা – যুগ্ম রোজকারের পরিকল্পনা সেই বিয়ের আগে থেকেই। ব্যাঙ্কের লোনের ব্যবস্থা হয়ে গেল এর পরে – অ্যাডভান্স দিয়ে বুক করে দিল দেবেশ। আর মাস দশেকের মধ্যে হ্যান্ডওভার করে দেবে চুক্তি মত।

ক'টা মাস কেটে গেল দেখতে দেখতে, এম-বি-এ-র ফাইন্যাল পরীক্ষার আর দেরী নেই বিশেষ। প্রিপারেশন নিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে অলকানন্দা - এদিকে আবার কোর্স ওয়ার্ক জমা দেবারও তাগিদা আছে। অন লাইন পাঠানো নোটস বুঝতে অসুবিধে হয় কখনও কখনও। ই-মেইল কিংবা এস.এম.এস. করে টিউটরের সাথে যোগাযোগ করা, তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী টিউটরিয়াল পেপারের উত্তর তৈরি করা – কোথা দিয়ে যে দিন কাটে হদিশ থাকে না আজকাল। রান্নাবান্না করারও অবকাশ কম। অফিস থেকে ফেরার পথে রেস্তরাঁ, টেক্-অ্যাওয়ে দোকান থেকে প্রায়ই খাবার নিয়ে আসে দেবেশ – এক এক দিন একেক রকম পদ। মন্দ লাগে না খেতে। ছুটির দিন বাড়িতে থাকলে চা, কফি আর অল্পবিস্তর স্ন্যাক্সের ব্যবস্থাও করে চাহিদা মত। পরীক্ষার ভুত ঘাড় থেকে এবার নামলে বাঁচে অলকানন্দা – পড়াশুনোর বাইরে জীবন আর আছে কিনা সে সম্বন্ধে সন্দেহ জেগেছে অনেক সময়।

রুটিন মত পরীক্ষা সাঙ্গ হল একসময় – জেল থেকে যেন মুক্তি পাওয়া গেল। দিন দুই খালি ঘুমোল সময়ে, অসময়ে – মনের ক্লান্তি আর অবসাদ কেটেছে এবার। নিজের ইচ্ছে মত বাইরে ঘোরা ফেরা করতে পারছে, ভাল লাগছে জীবন আবার।

ফাইন্যাল এম-বি-এ-র রেজাল্ট বেড়িয়েছে ক'দিন হল। সব সমেত ডিস্টিংশন পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে অলকানন্দা। পুনের স্কুল অব বিজনেস ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনস্ট্রেশন থেকে কনগ্র্যাচুলেশনস্ জানিয়ে নির্দেশ এসেছে এম.বি.এ-র কনভোকেশনে হাজিরা দেবার – সার্টিফিকেট সেই সময়েই বিতরণ করা হবে। হাজিরা দিতে না পারলে রেজিস্ট্রি করে ডাকযোগে পাঠানো হবে। সমাপ্ত হল এম-বি-এ-র অধ্যায় – এবারে শুরু চাকরির সন্ধান।

ইতিমধ্যে বছরও ঘুরতে চলেছে আবার – বিজয়নগর হাউসিং সোসাইটির চিঠি এসেছে, আন্ধেরী ইষ্ট-এর অ্যাপার্টমেন্টের কাজ প্রায় শেষ। আর সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যে হ্যান্ড-ওভার শুরু হবে। আরও ৫ লাখ টাকা জমা করে চাবি নিয়ে আসতে হবে সোসাইটির অফিস থেকে। লোনের ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছিল এর আগেই। দরকারি কাগজপত্র সব ব্যাঙ্কের কাছেই জমা ছিল – ৫ লাখ অগ্রিম নিয়েছিল আগেই। আবার ব্যাংক- ম্যানেজারের সাথে

যোগাযোগ করল দেবেশ। আরও দিন চারেক ঘোরাঘুরি করে বাকি টাকার চেক হাতে আসার পর সোসাইটির অফিসে গিয়ে টাকা জমা দিয়ে চাবি নিয়ে এল। কেনা হয়েছে অলকানন্দার নামে। দলিলপত্র পাওয়া যাবে আর সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যেই – রেজিস্ট্রেশন হবে তার পরে।

থানের ফ্ল্যাট থেকে পাততাড়ি গুটিয়ে আন্ধেরী-ইস্টে বিজয়নগর কলোনির অ্যাপার্টমেন্টে উঠে যেতে মাসখানেক সময় লেগে গেল আরও। মালপত্র সব প্যাক করে তুলে নিয়ে গিয়ে আবার সব খুলে গুছিয়ে নিয়ে বসা খুবই ক্লান্তিকর ব্যাপার। ভাগ্যিস এম.বি. এ-র হ্যাপা শেষ হয়েছিল এর মধ্যে নইলে ঝামেলা হত খুবই। শিফটিং-এর পর্ব শেষ হল – নতুন করে আবার সাজাতে হবে সব। তবে এটা নিজের বাড়ি – রুচি মত সাজাতে সময় লাগবে। দিনক্ষণ দেখে গৃহপ্রবেশের পালাও সাঙ্গ হল, বন্ধুবান্ধব কয়েকজনকে বলাও হয়েছিল। নতুন অ্যাপার্টমেন্টের ভূয়সী প্রশংসা সবার – খুবই মডার্ন ডিজাইন, ইত্যাদি। বেশ কয়েকটা দিন কেটে গেল আবার সব ধকল সামলে গুছিয়ে বসতে। একটা ভদ্রগোছের চাকরি জোগাড় করা এবার বিশেষ প্রয়োজন অলকানন্দার।

কিছুদিন আগে অফিসের কাজে চার্চগেট অঞ্চলে গিয়েছিল দেবেশ। রাস্তায় গাড়ির কনজেশন এড়াতে সুবার্বন রেলওয়েতে যাতায়াত করে অনেক সময়। ফেরার সময় চার্চগেট স্টেশন প্ল্যাটফর্মে এক ভদ্রলোককে দেখে কেমন যেন চেনা চেনা লাগল। সে লোকটিও ঘুরে তাকিয়ে দেখছে – ওকেই। প্রায় অস্ফুট স্বরেই প্রশ্ন –

- দেবেশ না?

এইবার বিস্মৃতির অতল তল থেকে ভেসে এল সেই ফেলে আসা স্কুলের দিনগুলো – হ্যাঁ, অবিনাশ? ...তুমি... তুই এখানে?

- এখানে মানে? আমি তো মুম্বাইতেই থাকি। এখানেই কাজ করি। তা, তুই এখানে কি করছিস? কোন কাজে মুম্বাইতে এসেছিস নাকি? কোথায় আছিস আজকাল? বিয়ে থা হয়ে গেছে?

স্টেশন চত্বরেই একটা কফির দোকানে বসল দুজনে - এবার সবিস্তারে আত্মবিবরণী শোনালো অবিনাশকে। এ কথা, সে কথা – খুবই ভাল লাগল এতদিন পরে সেই বিস্মৃতপ্রায় দিনগুলোর কথা আলোচনা করে। কে কোথায় থাকে, নিজেদের ঠিকানা বিনিময় করল দুজনে। নিজের চাকরির বিবরণ আর আন্ধেরী-ইস্টে অ্যাপার্টমেন্ট কেনার কথাও শুনিয়েছে দেবেশ। সুবার্বন রেলওয়েতে সিগন্যালিং সুপারভাইজার গোছের মোটামুটি একটা চাকরি করে অবিনাশ। তাছাড়া এদিক ওদিক রোজগার আছে আরও কিছু। নিজের নিজের ফোন নং বিনিময় করে বিদায় নিল দুজনে।

শত কাজের মধ্যে অবিনাশের সাথে দেখা হবার কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিল দেবেশ। সপ্তাহ দুয়ক পরে এক রবিবারে দুপুরের দিকে টেলিফোন বেজে উঠতে অলকানন্দাই ধরেছিল – ফোনটা এগিয়ে দিল দেবেশের দিকে - তোমাকেই খুঁজছে কে, নাম বলল - অবিনাশ।

- ওঃ, হ্যাঁ। আমার স্কুলের পুরনো বন্ধু, এখানেই থাকে। দেখা হয়েছিল সেদিন ষ্টেশনে – বলতে বলতে ফোনটা হাতে তুলে নিল দেবেশ – হ্যাঁ, দেবেশ বলছি। ভাল লাগলো ফোন করেছিস, কেমন আছিস বল্। কী বললি? আসছিস আমাদের এখানে? সে ভালই হবে, বাড়িতেই আছি আজ আমরা। গল্প করা যাবে। বৌ, মেয়েকেও নিয়ে আসিস... ওঃ? বৌ নেই এখানে, কোলকাতা গেছে? সে যাক গে, পরে আলাপ হবে তার সাথে। একাই আয় তো আগে।

ঘণ্টা খানেকের মধ্যে এসে হাজির অবিনাশ। পথের নিশানা কিছু ফোনেই বাতলে দিয়েছিল দেবেশ – খুব অসুবিধে হয় নি একটা খুঁজে বের করতে অ্যাপার্টমেন্ট। যত্ন করে বসাল বন্ধুকে, আলাপ করিয়ে দিল অলকানন্দার সাথে। দু-হাত তুলে নমস্কার জানালো অলকানন্দা – আপনার বন্ধুর মুখে আপনার কথা শুনেছি সব। গোরেগাঁও-তে থাকেন, সে তো আমাদের এই লাইনে-ই। বৌ ফিরে এলে এখানে নিয়ে আসবেন নিশ্চয়।

সলজ্জ হাসিতে সম্মতি জানালো অবিনাশ – হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই আনব বৌদি। আমাদের দেবেশ যে এখানে বাড়ি

করেছে সে তো জানতাম না। জানলে কত আগে এসে চড়াও হতাম।

এর পরে নিজের জীবন-বৃত্তান্ত কিছু শোনালো অবিনাশ। হায়ার সেকেন্ডারির পর জেনারেল পড়াশোনার লাইনে বেশি আর এগোতে পারেনি কারণ বাপের অবস্থা তেমন ভাল ছিল না। অনেক তদ্বির করে ওয়েস্ট বেঙ্গল ষ্টেট ট্রান্সপোর্টে কনডাক্টরের কাজ জোগাড় করে কোন মতে। সে কাজ করতে করতে টেকনিক্যাল স্কুলে পার্ট টাইম ক্লাস করে আই.টি.আই ট্রেড সার্টিফিকেট পরীক্ষায় পাশ করে। এর পর মুম্বাইতে ওয়েস্টার্ন রেলওয়েতে কর্মরত দূর সম্পর্কের এক ভগ্নীপতির সুপারিশে ওখানেই অ্যাপ্রেন্টিস হিসেবে ট্রেনিং শেষ করে জুনিয়র টেকনিশিয়ান হিসেবে চাকরি পায়। ৬/৭ বছর হয়ে গেল চাকরি – এখন একটা সেকশানের সুপারভাইজার। বিয়ে করেছে, একটি মেয়েও জন্মেছে। শুধু এ চাকরি করে মুম্বাইতে সংসার চালানো কঠিন। পার্টটাইম এল.আই.সি-র এজেন্সি শুরু করেছিল কোলকাতায় থাকতেই। এখানেও চালিয়ে যাচ্ছে সে এজেন্সি।

তাকালো এবার সোজাসুজি দেবেশের মুখের দিকে – তুই তো লেখাপড়ায় বেশ ভাল করেছিস, ভাল চাকরি করিস, মুম্বাইতে নতুন অ্যাপার্টমেন্ট কিনেছিস। কিন্তু একটা বড় কাজ বাকি আছে তোর।

- তার মানে? – অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে দেবেশ।

- বুঝলি না? আমি বলছি রিস্ক কভার করার কথা। দাঁড়া, বৌদি আসুক, বুঝিয়ে বলছি।

একটু কিছু জল খাবারের ব্যবস্থা করতে রান্না ঘরে ঢুকেছিল অলকানন্দা। চা আর অল্পকিছু স্ন্যাকস নিয়ে এসে বসল আবার সোফায়। চায়ের কাপ হাতে তুলে নিয়ে তার দিকে ঘুরে বসল এবার অবিনাশ – আচ্ছা, বৌদি এবার আপনাকে জিগেস করি একটা কথা। এত সুন্দর অ্যাপার্টমেন্ট কিনেছেন, খুব ভাল টার্মস পেয়েছেন, মাসিক কিস্তিতে শোধ হচ্ছে লোন। কিন্তু মানুষের শরীরের কথা তো কিছুই বলা যায় না। ভগবান না করুন, হঠাৎ যদি দেবেশের কিছু হয় তা হলে আপনি তো ভীষণ ঝামেলায় পড়ে যাবেন। সেই রিস্ক কভার করার একমাত্র উপায় হল লাইফ ইন্সিওরেন্স।

তাকিয়ে দেখল কিছুক্ষণ অবিনাশের মুখের দিকে, একটু চিন্তা করে উত্তর দিল অলকানন্দা তারপর – কেন? আমিও তো কাজ করব ঠিক করেছি। এম-বি-এ শেষ করেছি, আশা করি সুবিধে মত কাজ পেয়ে যাব একটা।

মুখের কথা যেন লুফে নিল অবিনাশ – সে তো খুব ভাল কথা। তা হ'লে তো ভাল মত লাইফ রিস্ক কভার করার জন্য প্রিমিয়াম দিতে কোন অসুবিধে হবে না। একটু বুঝিয়ে বলছি, ভাল করে শুনুন। এল-আই-সি-র বেশ ভাল ভাল ইন্সিওরেন্স প্রোডাক্ট আছে আপনাদের মত কাপল্‌দের জন্য। এর মধ্যে 'অমূল্য জীবন'-এর কথাই বলি। পলিসি টার্ম ৩৫ বছর ম্যাক্সিমাম, সাম আসিওরড্ ২৫ লাখ মিনিমাম। আরেকটু খুলে বলি, ধরুন দেবেশের নামে ২৫/৩০ বছরের পলিসি খোলা হল – তার মানে দেবেশের লাইফের রিস্ক কভার হচ্ছে। দেবেশ হল পলিসি হোল্ডার আর আপনি হলেন নমিনি। তার মানে এই ২৫/৩০ বছরের মধ্যে দেবেশের হঠাৎ কোন কারণে ডেথ্ হলে আপনি পুরো টাকাটা পাবেন। আর যদি কোন দুর্ঘটনা না ঘটে তাহলে পলিসি ম্যাচিয়র করলে অর্থাৎ ২৫/৩০ বছর পরে পলিসিহোল্ডার হিসেবে ঐ পুরো টাকাটাই ফেরৎ পাবে, সঙ্গে কিছু বোনাসও থাকবে। এবার বলুন ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছেন কিনা – কিছুতেই লোকসান নেই আপনাদের। তাছাড়া প্রিমিয়ামের জন্য ট্যাকস্ রিবেটও পাবেন। একেবারে উইন্-উইন্ সিচুয়েশন – হাসি মুখে তাকিয়ে দুজনকে দেখছে অবিনাশ।

সব শুনে নিজের জায়গায় এবার নড়ে চড়ে বসল দেবেশ – বুঝলাম, ব্যাপারটা চিন্তা করে দেখার মত স্বীকার করছি। কিন্তু আমরা পলিসি নিলে তোর কি লাভ?

- কেন? কমিশন। যদিও রেট যৎসামান্য, এল.আই.সি-র এজেন্ট হিসেবে আমি কমিশন পাব আমার মোট পলিসি পোর্টফোলিওর ওপরে। তার মানে যত বেশি পলিসি করাতে পারব আমার কমিশন বাড়বে সেই অনুপাতে।

অল্প একটু পরে উঠল অবিনাশ –চলি বৌদি নমস্কার। খোঁজ খবর নেবেন আপনাদের বন্ধুবান্ধব মহলে। এল.আই.সি-র পলিসি হোল্ডাররা ঠকেনি কখনও। হাত রাখল একটা দেবেশের কাঁধে – চলি রে, চিন্তা করে দ্যাখ, খোঁজ খবর নে। আমি ফোন করব আবার সপ্তাহ দুয়েক পরে - বিদায় নিল এবার অবিনাশ।

খোঁজ খবর আর নতুন করে নেবার দরকার ছিল না। লাইফ ইন্সিওরেন্স করার কথা এর আগেও কানে এসেছে দেবেশের। ওদের অফিসেও ইন্সিওরেন্স এজেন্টদের আসা যাওয়া আছে। এর আগেও সরাসরি এরকম অনুরোধ এসেছে অন্য এজেন্টের কাছ থেকে – গা করে নি তেমন। নতুন অ্যাপার্টমেন্টে গৃহপ্রবেশ করে উঠে আসার পরও মনে হয়েছে কথটা, কিন্তু ঐ পর্যন্ত-ই। অবিনাশ বিদায় নেবার পর বসল অলকানন্দার মুখোমুখি – কি বুঝলে?

- আমি আবার কি বুঝব?

- অবিনাশ যা বলে গেল সেই কথাই ভাবছি। তোমার কি মত?

- হুঁ, – ভ্রু কুঁচকে গেল অলকানন্দার – লাইফ রিস্ক কভার করে রাখার প্রয়োজনটা বুঝছি। তবে শুধু তোমার কেন? আমারটাও তো কভার করা উচিৎ। হঠাৎ কোন অঘটন, সে তো যে কারও জীবনেই ঘটতে পারে। আমার কিছু হলে তোমারও তো কিছু পাওয়া উচিৎ। আমার জীবনটা তো আর ফেলনা নয়।

হো হো করে হেসে উঠল দেবেশ – সত্যি-ই কারও জীবনই ফেলনা নয়। কিন্তু এখুনি দুটো লাইফ পলিসি করতে খরচ অনেক – অত প্রিমিয়াম ম্যানেজ করা শক্ত হবে। আগে একটা তো করি তারপর তুমি চাকরি পাবার পর আরেকটা করলেই হবে।

কথাটা যুক্তিপূর্ণ মনে হয়েছে অলকানন্দার। নিজের চাকরি পাওয়াটা জরুরী মনে হয়েছে আরও।

অবিনাশের টেলিফোনের জন্য আর অপেক্ষা করে নি দেবেশ, যোগাযোগ করেছে নিজেই। দিন তিনেক বাদে এল অবিনাশ সন্ধ্যের পরে – সঙ্গে এসেছে এল-আই-সি-র প্যানেলের ডাক্তার একজন। চা পর্বের পর অবিনাশের সামনে বসেই ইনসিয়োরেন্সের দরখাস্ত ভর্তি করল দেবেশ। রুটিন মাফিক পরীক্ষা করলেন ডাক্তার। রিপোর্ট লিখে সাথে সাথেই দরখাস্তের নির্ধারিত জায়গায় মেডিক্যাল ইনফরমেশন সব পূর্ণ করে স্বাক্ষরও করে দিলেন। ২৫ বছরের মেয়াদে ৩৫ লাখ টাকার লাইফ ইন্সিওরেন্সের ব্যবস্থা করে প্রিমিয়ামের চেক হাতে নিয়ে বিদায় নিল অবিনাশ হাসিমুখে – চলি বৌদি, পলিসি ডকুমেন্ট রেজিস্ট্রি পোষ্টে এসে যাবে দিন সাতেকের মধ্যে, না পেলে একবার খবর দেবেন আমাকে। ভাল থাকবেন, আসব আবার মাঝে মাঝে খোঁজ খবর করতে। দেবেশের দিকে তাকালো এবার – তোদের পে-অফিসকে ইন্সট্রাকশন পাঠিয়ে দিস, স্যালারি থেকে অটোমেটিক ভাবে কেটে নিয়ে এল-আই-সি-র প্রিমিয়াম যেন জমা করিয়ে দেয়। তা'হলে আর ডিফল্ট হবার ভয় থাকবে না।

কোন অঘটনের ধাক্কায় জীবনকে পর্যুদস্ত করে ফেলার আশংকা থেকে এবার যেন মুক্তি পেল সবাই।

-৪-

চাকরির প্রচেষ্টা ইতিমধ্যে চলছিল পুরোদমে। অন লাইনে সরাসরি দরখাস্ত পাঠানো থেকে আরম্ভ করে রিক্রুটিং এজেন্সির মাধ্যমেও চলছিল চেষ্টা। একটি এজেন্সি থেকে ডেকে পাঠালো একদিন – সামনে বসে আলাপ করার পর এজেন্ট পাঠাল একটি নাম করা প্রাইভেট ব্যাংকের হেড অফিসে এইচ আর ডিভিশনের এক এক্সিকিউটিভ ম্যানেজারের সাথে দেখা করতে। নির্দিষ্ট কোন স্থায়ী রোল খালি নেই এখন তবে প্রাথমিক আলাপ পরিচয় করে রাখা ভাল – এদের পুলে নাম থাকলে ভবিষ্যত রিক্রুটমেন্টে সুবিধে হবে। নির্দেশ মত গিয়ে দেখা করল অলকানন্দা। সুন্দরী মুখের জয় সর্বত্র – প্রায় মিনিট চল্লিশের হাল্কা কথা বার্তার পর হাসিমুখেই বিদায় দিলেন মি. আয়ার - এক্ষুনি সেরকম ভেকেন্সি কিছু নেই, তবে আমি দেখছি কি করতে পারি তোমার জন্য।

অশেষ ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিল অলকানন্দা।

সপ্তাহখানেক পরে এজেন্টের ফোন পেয়ে অবাক হবার পালা – কর্পোরেট ব্যাঙ্কিং সেক্টরে জুনিয়র ম্যানেজমেন্ট ক্যাডারে চাকরির অফার আছে। পে-স্কেল এক্ষুনি খুব বেশি নয় তবে টিকে থাকলে ভবিষ্যতে উন্নতির সুযোগ প্রচুর। প্রস্তাবে রাজি থাকলে দুটি রেফারেন্স লাগবে। রাজি, রাজি, রাজি অলকানন্দা। পুনের ম্যানেজমেন্ট স্কুলে ওর কোর্সের টিউটর ও দেবেশের এক বন্ধুর নাম ঠিকানা জানিয়ে তীর্থের কাকের মত প্রতীক্ষায় সময় যেন আর কাটে না। অল্পদিনের ব্যবধানে নিয়োগপত্র হাতে পেয়েও সঠিক যেন বিশ্বাস করে উঠতে পারছিল না বর্তমান পরিস্থিতিটুকু। সত্যিই কি দাঁড়িয়েছে নিজের পায়ে?

জীবন গতিময়, ভাল লাগছে এখন সব কিছু। দেবেশকে বিয়ে করে মুম্বাই আসা কেরিয়ারের প্রথম সোপান বলে মনে হয়েছে আগে – এবার আরম্ভ হল দ্বিতীয় অধ্যায়। স্বামী, স্ত্রী, সংসার – এর বাইরেও যে জীবন আছে একটা, সেটা ক্রমশ বোধগম্য হচ্ছে। ব্যবসায়িক লেন দেনের দুনিয়াটার সাথে পরিচয় হচ্ছে ক্রমশ। লাভ, লোকসান, শেয়ার হোল্ডারের প্রফিট, ডিভিডেন্ড এসব নিয়ে আগে চিন্তা করে নি কোনদিন। এখন যেন বুঝতে পারছে কোন নিয়মে চলছে দুনিয়া, করপোরেট ইমেজ বাড়ানো কেন দরকার। মিশন স্টেটমেন্ট আর কর্পোরেট ভিসনের কি সম্পর্ক, প্রোঅ্যাকটিভ্ ক্লায়েন্ট সার্ভিসের কি দরকার – ক্রমশ জ্ঞানচক্ষু খুলেছে অলকানন্দার। ছ'টা মাস কেটে গেল যে কোথা দিয়ে বোঝাই গেল না ব্যস্ত দিনের পরিবেশে। প্রবেশনারি অবস্থা পার হয়ে পাকাপোক্ত হল চাকরি যথাসময়ে।

নিজের ওপর আত্মবিশ্বাস ক্রমশ বাড়ছে অলকানন্দার। পরিচিতির গণ্ডীও বেড়েছে অনেক। অফিসের বন্ধুবান্ধবও হয়েছে কিছু। অবিশ্বাস্য গতিতে কেটে যায় সপ্তাহ শেষের দিনগুলো – হয়তো অন্য কারও বাড়ি পার্টি থাকে নয়তো ওদের নিজেদের আস্তানাতেই হুল্লোড় জমে বন্ধুবান্ধব নিয়ে। হাসি ঠাট্টা, মেয়েদের মধ্যে গলা নিচু করে ফিস ফিস, গুজ গুজ – জানাশোনার মধ্যে কোন ভদ্রলোকের পরকীয়া প্রীতি, আবার কোন মহিলাকে অন্য পুরুষের সাথে দেখা গেছে, এসব আলোচনা তো আছেই। তাছাড়া আছে বলিউড। সবে ওঠা কোন নতুন নায়িকার ইতিমধ্যে কার অংকশায়িনী হবার গোপন খবর, ইত্যাদি। ছেলেরাও যোগ দেয় রসাত্মক আলোচনায়। এছাড়া নিজেদের চাকরির গল্প, কার বস্ কতটা অপদার্থ, নিজের কৃতিত্বে কত ঝামেলার হাত থেকে বাঁচিয়েছে তা'কে, কোম্পানির হাল দাঁড়িয়েছে কোথায় – গল্পের খেই বয়ে চলে বিভিন্ন পথে। মুম্বাই-এর উচ্চ মধ্যবিত্ত সমাজের মানুষ এখন দেবেশ আর অলকানন্দা।

বছর চারেক অনায়াসে পার হয়ে গেছে বিয়ে হয়ে দুজনে মুম্বাই আসার পর। তৃতীয় মানুষের আগমনের সম্ভাবনা দেখা যায় নি এখনও। তা' নিয়ে মাথা ব্যথা নেই খুব একটা। অবশ্য ঠাট্টা করতে ছাড়ে না অন্তরঙ্গ সখীদের মধ্যে কেউ।

- এই, অনেকদিন তো হল বিয়ে হয়েছে তোমাদের। আমদানি নেই কেন? – বলে খিল খিল করে হেসে উঠেছে প্রমীলা। সম্প্রতি ছেলে হয়েছে তার।

কানের লতি গরম হয়ে উঠছে বুঝতে পারে অলকানন্দা – কী আর করা যাবে আমদানি না হলে! ডাক্তার দেখিয়েছি, ডেফিসিয়েন্সি কারও নেই। দেখা যাক, হ'লে হবে না হ'লে না হবে। অত মাথা ব্যথা নেই আমাদের – শ্লেষটুকু গোপন করার কোন চেষ্টা করে নি।

অবিনাশও আসে মাঝে মধ্যে। বৌ কোলকাতা থেকে ফিরে আসার পর নিয়ে এসেছিল একদিন - সঙ্গে মাস ছয়েকের শিশু, মেয়ে একটি। মা বাবার কাছে গিয়েছিল গর্ভাবস্থার মাস সাতেক পার হওয়ার পর - ওখানেই জন্ম মেয়ের। এই-ই প্রথম সন্তান। ক'দিন হ'ল অবিনাশ গিয়ে নিয়ে এসেছে এখানে। নম্র সম্র বৌটি - বেশ মিষ্টি দেখতে। অলকানন্দার থেকে ছোটই হ'বে। মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়াশোনা – সম্বন্ধ করে তারপরে পাত্রস্থ করেছেন বাপ মা। স্বামী সংসার নিয়ে মোটামুটি সুখী। গোরেগাঁওতে এক ডেভেলপারকে ধরে ছোটখাট একটা ফ্ল্যাট কেনার চেষ্টায় আছে অবিনাশ। যে হারে বাড়ছে প্রপার্টির দাম এখন কিছু একটা করতে না পারলে এর পরে আর হাত দেওয়া যাবে না কিছুতে।

এক কর্পোরেট ক্লায়েন্টের কাছেই খবরটা পেয়েছিল অলকানন্দা – থানে ওয়েস্টে অসোয়াল পার্ক এলাকায় এক বেডরুমের ফ্ল্যাট বিক্রী আছে একটা। প্রাইভেট সেল - ৩/৪ বছরের পুরনো ফ্ল্যাট, বিদেশে চলে যাচ্ছে

বলে বিক্রী করে দিচ্ছে মালিক।

- ইনভেস্টমেন্ট হিসেবে কিনলে কেমন হয়? – অবিনাশের মত জানতে চাইল অলকানন্দা।

- এরিয়াটা তো খুবই ভাল, ওখানে খালি আছে ফ্ল্যাট ভাবাই যায় না। হাউসিং লোন পেতে অসুবিধে হবে বলে মনে হয় না। আর ভাড়া দিলে তো অনেকটাই উঠে আসবে মাসে। তোমার ক্লায়েন্টকে বলে চল দেখে আসি ফ্ল্যাট – খুব-ই উৎসাহী দেবেশ।

মালিকের সাথে দেখা করে সারা হ'ল ফ্ল্যাট পরিদর্শন। ভদ্রলোকের ব্যবহার অমায়িক – বিদেশে ভাল সুযোগ পেয়ে চলে যাচ্ছেন। খুব একটা খাঁই নেই দাম বাড়াবার। বছর দুয়েক আগে কিনেছিলেন এই ফ্ল্যাট – কেনা দামের একটু ওপরে রাজি হয়ে গেলেন ভদ্রলোক। তদ্বির করে লোনও অ্যাপ্রুভড্ হয়ে গেল। দেবেশের নামেই এবার রেজিস্ট্রি করা হল ফ্ল্যাট। খোঁজ খবর করে এক কোম্পানির সাথে লিজের ব্যবস্থাও সারা হ'ল।

আরেকটা লাইফ ইন্সিওরেন্স পলিসি নেবার কথা মাথায় ছিল আগে থেকেই। আবার এসে হাজির অবিনাশ – অলকানন্দার কথামত দেবেশই যোগাযোগ করেছিল আবার আসার জন্য। লাইফ রিস্ক্ কভার করে রাখার প্রয়োজন সম্বন্ধে কারও আর সন্দেহ নেই বিন্দু মাত্র। ২০ বছরের মেয়াদে ৩০ লাখ টাকার পলিসি ইস্যু হয়েছে এবার অলকানন্দার নামে – নমিনি দেবেশ।

নিশ্চিন্ত হওয়া গেল আবার, মানুষের জীবনের মূল্যায়নের চুক্তি স্বাক্ষর করে।

-৫-

অনায়াসেই আরও বছর পাঁচেক কেটে গেল মুম্বাইতে কাউকে কিছু বুঝবার সুযোগ না দিয়েই। এই শহরটার সাথে সখ্য নিবিড় হচ্ছে আরও – এখানকার আকাশ বাতস, রাস্তা ঘাট, দোকান বাজার, লোক জন, আর নতুন বলে মনে হয় না আজকাল। মুম্বাই এখন নিজের শহর, 'মুম্বাইকার' বলেই পরিচিতি দেওয়া যেতে পারে নিজেদের। ক্রমশ প্রতিষ্ঠা বাড়ছে এখানকার চাকুরিজীবী উচ্চমধ্যবিত্ত সমাজে।

দৈনন্দিন চাকুরিজীবনে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে দুজনেই। সাতসকালে উঠে একটু কিছু মুখে গুঁজে দেবেশই বেরিয়ে যায় আগে। সেটা অবশ্য মুম্বাইতে যখন থাকে তখন। ব্যালার্ড স্ট্রিটে সিন্ধিয়া হাউসের কাছেই হেডঅফিস ওর। বছর দুয়েক হল পাওয়ার ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউসন গ্রুপ-একাউন্টেন্ট হিসেবে প্রোমোশন পেয়েছে দেবেশ। তার পর থেকেই ট্যুরে যেতে হয় প্রায় প্রতি মাসেই। এর মধ্যে গুজরাটে ভদোদরা, মহারাস্ট্রে আহমেদনগর, উড়িষ্যার রুরকেল্লা আর চেন্নাই-এর কাঞ্চিপুরমে যেতে হয় ঘুরে ফিরে। প্রথম প্রথম খারাপ লাগেনি তেমন – ট্যুর করলে বাড়তি এলাউন্স হিসেবে অর্থাগমও বেশি হয় একটু। কিন্তু যত দিন যাচ্ছে ততই ক্লান্তিকর হয়ে উঠছে এই ট্যুরের রুটিন। চেষ্টায় আছে সুযোগ পেলে ওদেরই সাবসিডিয়ারি ফাইন্যান্সিয়াল হোল্ডিং কোম্পানিতে সুবিধে মত কোন সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট পজিশনে যাবার। তবে এসব পজিশন কোম্পানির ওয়েবসাইটে ভেকেন্সির তালিকায় থাকে না – নেট-ওয়ার্কিং-এর মাধ্যমে ভেতর ভেতর সিলেকশন হয় এসব পজিশনে। নির্ভর করছে কোম্পানির চীফ ফাইন্যান্সিয়াল অফিসারের ঘনিষ্ঠ মহলে কেউ আছে কিনা তার ওপরে। দেবেশের প্রায় ৮/৯ বছর চাকরি হল এই সংস্থায়, চীফ ফাইন্যান্সিয়াল অফিসারের সাথে অল্প বিস্তর আলাপ পরিচয় আছে ঠিক-ই তবে তাঁর ঘনিষ্ঠ মহলের মানুষ বলে নিজেকে এখনও গণ্য করে না। আরও কয়েকজন সিনিয়র ম্যানেজার আছেন ওদের এই একাউন্টস ডিভিশনে। তবে চেষ্টা করতে দোষ নেই – আসল কথা হল মাটির কাছাকাছি কান পেতে রাখা, যাতে উড়ো খবরগুলো এসে পৌঁছায় ঠিক সময় মত।

অলকানন্দা বেরোয় আরেকটু পরে। সকালে উঠে স্নান টান সেরে নিয়ে সিরিয়াল দিয়ে ব্রেকফার্স্ট সেরেই রওনা হয় – ওরলিতে অফিস। পৌঁছুতে পৌঁছুতে সকাল ন'টা বেজেই যায়। চাকরিতে ওর বছর ৫/৬ কেটে গেছে দেখতে দেখতে – এরই মধ্যে টিম লিডারের পদে উঠেছে অলকানন্দা প্রোমোশন পেয়ে। আরও জনা ছয়েক কর্মী আছে ওর সেকশনে। নিজের টেবিলে এসে ব্রিফকেস, কাঁধের ব্যাগ ইত্যাদি রেখে গুছিয়ে বসে ল্যাপ্টপটা সুইচ অন করে লগ অন সেরে ফেলে। তারপর গুটি গুটি

এগোয় হলের অপর প্রান্তে কফি ডিস্পেন্সারের দিকে – কোন কলিগ কিংবা অধীনস্থ কারও "গুড মর্নিং"-এর জবাব দিতে দিতে ব্ল্যাক কফি ঢেলে নেয় কাপে। ফিরে এসে বসে এবার নিজের টেবিলে। সেদিনের ক্লায়েন্ট অ্যাপয়েন্টমেন্ট আর ম্যানেজমেন্ট মিটিং শিডিউল দেখে নেয় একবার। রিপোর্ট দাখিল করার তালিকাও চোখ বুলিয়ে নিয়ে খোঁজ খবর শুরু করে, কার কাজ কতদূর এগোল – কারও কাজ আটকে আছে কিনা মাঝ পথে অন্য কোন সেকশন থেকে কোন তথ্য আসতে দেরী হবার জন্য। এর পর শুরু কর্পোরেট ক্লায়েন্ট অ্যাপয়েন্টমেন্ট – প্রয়োজন হলে ক্লায়েন্টের অফিসেও যেতে হয়। এ সব সারতে বেলা একটা তো বাজেই। এবার ক্যান্টিনে কিংবা নিজের টেবিলে বসেই সেরে নেয় লাঞ্চ পর্ব। ম্যানেজমেন্ট মিটিং প্রায় প্রতিদিন-ই থাকে দুপুরের দিকে। সে সব সেরে আর্জেন্ট ই-মেইলের উত্তর, বিল পাস, ভাউচার সই ইত্যাদি সারতে সারতে বেলা গড়িয়ে যায়। এর পর নিয়ে বসে ক্লায়েন্টস রিপোর্টস – যে সব কেস হায়ার ম্যানেজমেন্টের অনুমোদনের জন্য পাঠাতে হবে তার খসড়া। অফিস থেকে বেরুতে বেরুতে ৮ টা তো বেজেই যায়। বাড়ি পৌঁছুতে পৌঁছুতে রাত প্রায় ৯টা। একটু বিশ্রাম করে আরেক প্রস্থ স্নান সেরে ডিনার খেয়ে উঠতে উঠতে রাত ১০টা পার হয়ে যায়। উইকএন্ডেই মোটামুটি রান্না করে রাখে। দেবেশ অবশ্য ফিরে আসে ওর আগেই – মাইক্রোওয়েভে গরম করে নেয় খাবার। কোনদিন বাড়িতে সেরকম কিছু না থাকলে টেক অ্যাওয়ে নিয়ে আসে কিছু অফিস ফেরৎ। সপ্তাহান্তে কিছুটা বিশ্রাম। তবে সেরকম প্রয়োজন হলে শনিবারও একটা বেলা ঢুঁ মারতে হয় কাজে। তাছাড়া সোস্যালাইজেশন আছে – বন্ধুবান্ধবের বাড়ি পার্টি কিংবা ক্লাবেও হাজিরা দেয় কখনও সখনও। মোটামুটি ছন্দমাফিক কেটে যাচ্ছিল মুম্বাই-এর ব্যস্ত জীবন। বন্ধু প্রমীলার কৌতূহল নিরসন করে আরেকটি মানুষের 'আমদানি' আর হয়ে ওঠেনি এ পর্যন্ত।

আরেকটি কর্মব্যস্ত দিন অলকানন্দার। কাজের ঝামেলা চলছে সারাদিন – দুটো ম্যানেজমেন্ট মিটিং-এ হাজিরা দিয়ে ওর সেকশনের কার্যকলাপ সম্বন্ধে জবাবদিহি করতে হয়েছে কয়েকটা বিষয়ে। বিকেলের দিকে ক্লায়েন্ট রিপোর্ট নিয়ে বসেছিল - সন্ধ্যে প্রায় হয়ে এসেছে, দেবেশের ফোন পেয়ে উঠে পড়ল তাড়াতাড়ি। অধীনস্থ এক কর্মীকে সব বুঝিয়ে রিপোর্ট-টা রেডি করে রাখতে বলল আগামিকাল দাখিল করার জন্য। ত্রস্ত পায়ে এবার রওনা হল অলকানন্দা। সুবারবন ট্রেনেই যাতায়াত করে – পিক্ আওয়ারসে তাড়াতাড়ি হয় ওতেই। আন্ধেরী-ইষ্ট ষ্টেশন থেকে অটো নিয়ে বাড়ি এসে পৌঁছুল দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মনে।

লিফটে ওঠার আওয়াজ পেয়েছিল দেবেশ, দরজা খুলে দিল তাড়াতাড়ি। বিস্তারিত খবরের সারমর্ম হল সেদিন ট্যুর থেকে একটু তাড়াতাড়ি – বিকেলের দিকে বাড়ি ফিরে আনসারিং মেশিনে ওর দাদার মেসেজ শুনে দেবেশ ফোন করেছিল কোলকাতায়। কার্ডিয়াক অ্যাটাক, বাবাকে সেদিনই দুপুরে নার্সিং হোমে অ্যাডমিট করা হয়েছে। হার্ট স্পেশালিষ্ট দেখেছেন, আরও ৪৮ ঘণ্টা পার হবার আগে কোন আশ্বাস দিতে পারছেন না। যদি আসতে পারে অলকানন্দা, সে জন্যই জানাচ্ছে খবরটা। কিছু একটা আশংকা করেই অফিস থেকে বেরিয়েছিল অলকানন্দা, দ্বিধা করে নি আর। জানাশোনা ট্রাভেল এজেন্টকে ধরে পরের দিন সকালের ফ্লাইটে কোনমতে একটা টিকিটের ব্যবস্থা করে দিয়েছিল দেবেশ।

এয়ারপোর্টে কেউ আসবে না জানাই ছিল – দাদা নিশ্চয় ছোটাছুটি করছে নার্সিংহোমে। ছোট ভাই তো থাকে আমেরিকায়, তাকে খবর দিয়েছে কিনা কে জানে। ট্যাক্সি নিয়ে ঢাকুরিয়ার বাড়িতে পৌঁছুতে পৌঁছুতে বেলা ১২টা পার হয়ে গেল। দরজা খুললেন মা – আসছে জানতেন। মাকে জড়িয়ে ধরে বোবা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল এবার অলকানন্দা। মাকে জড়িয়ে ধরে বোবা কান্নায়ে ভেঙ্গে পড়ল এবার অলকানন্দা
নিশ্চুপ মাথায় হাত দিয়ে বসে আছেন মা।

- কেমন আছে বাবা – প্রায় অস্ফুট গলায় প্রশ্ন।

- আই-সি-উ-তে আছে কাল থেকে, এখনও জ্ঞান ফেরে নি – জানালেন মা।

দাদা ফিরে এল ঘণ্টা খানেকের মধ্যে। একটু কিছু মুখে দিয়ে রওনা হল সবাই নার্সিং হোমে। একজন করে আই.সি.উ-র ভেতরে গিয়ে রুগীকে দেখে আসার অনুমতি। অক্সিজেন মাস্ক পরানো আর ড্রিপ লাগানো

শুখনো শরীরে বাবার সেই সহজ সরল হাসি মুখখানা কিছুতেই খুঁজে পাওয়া গেল না। আস্তে আস্তে জীবনী শক্তি ফুরিয়ে আসছিল রমেশ বাবুর – সেদিন-ই সন্ধ্যের পরে নির্বাপিত হল দীপশিখা। চতুর্থীর কাজ শেষ করে মুম্বাই ফিরে গেল অলকানন্দা – টান বলতে রয়ে গেল মা। তবে শ্রাদ্ধ শান্তির কাজ হবার জন্য অপেক্ষা করার উপায় নেই আর। মাত্র একদিনের নোটিশে হুট করে চলে এসেছে কোলকাতায় – কাজের এখন চাপ ভীষণ। জরুরী কেস কয়েকটার ডেডলাইন সামনেই।

মুম্বাই ফিরে এসে আবার নিজের কাজের হাল ধরেছে অলকানন্দা – কর্পোরেট ডিভিশনের আপোষহীন কাজের মধ্যে ডুবিয়ে দিয়েছে নিজেকে। ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ার শেষ হতে খুব বেশি দেরী নেই আর – এক গুচ্ছের রিপোর্ট তৈরি করে পাঠাতে হবে উর্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে। অফিসের কাজ শেষ করে বাড়ি ফিরতে রোজই প্রায় দেরী হয় আজকাল – গম্ভীর মুখ আরও ভারী হয়ে ওঠে দেবেশের, এক নজরেই চোখে পরে সেটা। কিন্তু উপায় নেই – কাজ কর্মের চাপ থাকলে দেবেশেরও দেরী হয় কখনো সখনো কিন্তু অলকানন্দার দেরী হলেই যত গণ্ডগোল। বিরক্তির ভাবটা চাপা থাকে না – খেতে বসে দু-একটা কথার মধ্যেই প্রকাশ পায় সেটা। সারাদিনের ক্লান্তিতে অবশ হয়ে থাকে শরীর – খাওয়া দাওয়ার পর আর খুব একটা গল্প করার মত মুড থাকে না। বিছনায় শোয়ার অল্প পরেই ঘুমিয়ে পড়ে অলকানন্দা – আরেকটি বিনিদ্র অপেক্ষমাণ মানুষের হাত তার অঙ্গ থেকে কখন যে সরে যায় আস্তে আস্তে সে খেয়াল রাখার মত সচেনতা থাকে না আর।

-৬-

আরও বছর দুয়েক কেটে গেছে গতানুগতিক জীবনের হাল ধরে। ব্যতিক্রম একটাই – নিঃশব্দে পৃথিবীর মায়া কাটিয়েছেন অলকানন্দার মা গতবছর। অনেকদিনের অভ্যাসবশতই বেশ সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠতেন মহিলা। সেদিন সকালে উঠে রান্নাঘরে শাশুড়িকে দেখতে না পেয়ে পায়ে পায়ে ওপরে উঠে আসে বৌদি। ওনার ঘরে গিয়ে আবিষ্কার করে শুয়ে আছেন তখনও। এর পরে আসল অবস্থা উপলব্ধি করতে সময় লাগে নি আর বিশেষ। ফোনে খবর পেয়েছিল অলকানন্দা সেদিনই, কিন্তু দৌড়ে কোলকাতা যাবার মানসিকতা ছিল না আর - বরঞ্চ ওখানে গিয়ে মার শূন্য ঘরে গিয়ে কি ভাবে দাঁড়াবে সেই চিন্তাই দুর্বল করেছে মনকে। করনীয় কাজকর্ম সব সেরেছে মুম্বাই-তেই। কোলকাতার টান থাকল না আর।

দিন কাটছে এর পরে রুটিন মত নিজের তাগিদেই। মাসকাবারি রিপোর্ট নিয়ে ব্যস্ত ছিল হঠাৎ ডাক পড়ল ওদের ডিভিশনের জি.এম-এর ঘরে। গভীর চিন্তামগ্ন হল অলকানন্দা – নিজের সেকশনের সব কাজ কর্মের অবস্থা ঝালিয়ে নিল নিজের মনে। সময় মত গিয়ে হাজির হল জি-এম-এর সেক্রেটারির টেবিলে। প্রত্যাশাই করছিল সেক্রেটারি, ইন্টারকমে একবার যোগাযোগ করে নিয়ে যেতে বলল ঘরে। বার দুয়েক নক্ করে দরজা ঠেলে ঢুকল অলকানন্দা।

- কাম ইন্, কাম ইন্, অলকা। প্লীজ হ্যাভ এ সীট – দাঁড়িয়ে উঠে সামনের চেয়ারে বসতে ইংগিত করলেন মি. আয়েঙ্গার

– কেমন আছ? কাজ কর্ম নিয়ে ব্যস্ত খুব সে আমি জানি। এ বছরে তোমার অ্যাচিভমেন্ট্ খুবই ভাল হয়েছে, প্রোগ্রেস রিপোর্ট দেখেছি আমি। কিন্তু স্বাস্থ্য সবার আগে সেটা ভাবতে হবে, তাছাড়া ওয়ার্ক আর লাইফ ব্যালান্স বলে একটা কথা আছে – শুনেছ নিশ্চয়। একথা কিন্তু ভীষণ ভাবে প্রযোজ্য এক্সিকিউটিভদের জন্য, মনে রেখ কথাটা। এবার বলি কেন ডেকেছি তোমাকে – সাউথ ইস্টার্ন সেক্টরের গ্রুপ ম্যানেজারের পজিশনে তুমিই নির্বাচিত হয়েছ, বোর্ডের সিলেকশন। দাঁড়িয়ে উঠে হাত বাড়িয়ে করমর্দন করলেন ভদ্রলোক।

হতভম্ব হয়ে দাড়িয়েছিল অলকানন্দা – সঠিক বোধগম্য হচ্ছে না ব্যাপারটা কি হচ্ছে, কেন হচ্ছে। কোম্পানির নিউজ বুলেটিনে বর্তমান ম্যানেজার অন্য পদে ট্রান্সফার হয়েছে দেখেছিল কিন্তু কোনভাবেই ঐ পজিশনে নিজের পদার্পণের কথা ভাবতে পারে নি।

যোগ করলেন এবার জি-এম – খবরটা আপাততঃ নিজের কাছেই রাখ, অফিসিয়াল চিঠি পেয়ে যাবে সামনের

সপ্তাহেই। উইশ ইয়ু অল দ্য সাকসেস্ – অভিনন্দন জানাতে হাত বাড়িয়ে দিলেন আবার ভদ্রলোক।

জেগে স্বপ্ন দেখছে কিনা ভাবতে ভাবতে ঘর থেকে বেরিয়ে নিজের চেয়ারে এসে বসল অলকানন্দা। টেবিলের ওপর ছড়ানো ফাইল পত্র ফেলেই গিয়েছিল। একটা মেমো লিখতে লিখতে উঠে গিয়েছিল - আবার ল্যাপ্‌টপে লগ্ অন্ করে ওয়ার্ড ডকুমেন্ট-টা খুলল। কিন্তু মনঃসংযোগ করতে পারছে না একেবারেই – সব বন্ধ করে টেবিল গুছিয়ে উঠে পড়ল অলকানন্দা, দেবেশের মুখখানা ভাসছে চোখের সামনে।

ফেরার পথে মনে হয়েছিল সম্ভবত সেই-ই পৌঁছুবে আগে বাড়িতে – দেখে হয়ত একটু অবাকই হবে দেবেশ। অনুমান মিথ্যে নয়।

-হোয়াট এ সারপ্রাইজ, তোমার অফিস আজ এত তাড়াতাড়ি ছুটি দিয়ে দিল! – তির্যক মন্তব্য দেবেশের।

গায়ে তেমন মাখল না অলকানন্দা, জামাকাপড় চেঞ্জ করতে করতে সরাসরি তাকিয়ে দেখল একটু মুখের দিকে। কফি টেবিলের ওপরে রাখা ব্রিফকেসটা সরিয়ে রেখে সোফার একপাশে বসে ডাকল এবার - বসো এদিকে, কথা আছে – হাত তুলে বসতে বলল নিজের পাশে।

সব শুনে একটু চুপচাপ বসে তাকিয়ে দেখল কিছুক্ষণ মুখের দিকে। এক চিলতে হাসির রেখা ফুটে উঠে মিলিয়ে গেল আবার দেবেশের ঠোঁটের কোণে – কনগ্র্যাচুলেশনস্, এ তো বিরাট জাম্প।

উঠে আস্তে আস্তে কিচেনের দিকে এগোল এবার – মাইক্রোতে এসময়ে খাবার গরম দেবেশই করে।

অবাক হয়ে কর্মব্যস্ত মানুষটাকে দেখছে অলকানন্দা, সন্দেহ উঁকি মারছে একটা মনের আনাচে কানাচে – দেবেশ কি খুশি নয়? দেবেশ কি ঈর্ষান্বিত? আশা করেছিল আনন্দোচ্ছ্বাসে লাফিয়ে উঠে জড়িয়ে ধরবে ওকে। ওটাই তো স্বভাব। কিন্তু কেমন যেন বদলে গেল মানুষটা। পরিবর্তনটুকু চোখে পড়ছিল আরও আগে - ওর চাকরি আরম্ভ করার কিছুদিন পর থেকেই। কেমন যেন আস্তে আস্তে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে দেবেশ – হাসি ঠাট্টায় ভরপুর, প্রাণবন্ত উচ্ছল যে মানুষটিকে ভাল লেগেছিল সেই সদ্য মুকুলিত যৌবনের সোনালী দিনগুলোতে সে মানুষ যেন হারিয়ে গেছে কোথাও। একটা গাম্ভীর্যের আচ্ছাদনে নিজেকে ঢেকে রাখে সর্বদা।

-৭-

প্রীতম খাস্তগীরের টি-পার্টিতে না গেলে নয় – খুব একটা ইচ্ছে না থাকলেও শেষ পর্যন্ত এসেছিল অলকানন্দা। অন্য ডিভিশনের হলেও হাজার হোক ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার, লোকটির বিরাগভজন হয়ে লাভ নেই কিছু। তবে ভদ্রলোকের নামে নানারকম কথা বার্তা চালু আছে এই ক্লাব মহলে আর উচ্চ সোসাইটির ফিস-ফিস, গুজ-গুজ, আলোচনায় – সুন্দরী মহিলাদের ওপর কিছু দূর্বলতা আছে ওনার। তবে ড্রিঙ্ক করলে সেটা আরও প্রকট হয়। মিসেস খাস্তগীর তাই সব সময় কড়া নজর রাখেন স্বামীর ওপর। সে রকম পার্টিতে গেলে পারতপক্ষে ড্রিঙ্কস-ওয়েটারের খুব একটা কাছে ঘেঁষতে দেন না, নিজেই কোন একটা সফট্ ড্রিঙ্কের গ্লাস স্বামীর হাতে তুলে দেন। আড়ালে আবডালে, বিশেষ করে স্ত্রীর দৃষ্টির আড়ালে অবশ্য সুযোগ বুঝে হুইস্কির গ্লাস তুলে নেন হাতে। তবে বেশিক্ষণ স্বামীকে ছেড়ে দূরে থাকেন না মিসেস নয়না খাস্তগীর – কড়া নজর রাখেন এবার যেন ঐ একটার বেশি হার্ড ড্রিঙ্কস হাতে না ওঠে। আজকের পার্টি মিসেস নয়না খাস্তগীরের বার্থ ডে উপলক্ষে। আমন্ত্রণের কার্ডে লেখা ৪০তম জন্মদিবস। সেটা অবশ্য বিশ্বাস করে না অনেকেই। এই বয়সে বার্থ ডে পার্টির মুখ্য উদ্দেশ্য হল ঘোষণা করে বয়স কমানো – এ কৌশল জানা অনেকেরই। ওনার আসল বয়েস ৫০ ছুঁই ছুঁই হলফ্ করে বলবে একথা অনেকেই। স্ত্রীর ইচ্ছেতেই জিমখানা ক্লাবে টি-পার্টির আয়োজন করেছিলেন প্রীতম খাস্তগীর। তা'হলে আর এলাহি ড্রিঙ্কসের ব্যবস্থা রাখতে হবে না – নয়নার সেটাই পছন্দ। মোটামুটি ছিমছাম পার্টি, নাচ গানেরও বালাই নেই। বুফে কায়দায় স্যান্ডউইচ, পুরী, মটরপনীর, চানাচুর, ছোলেবাটুরা, আইসক্রিম ইত্যাদির

সাথে আরও মিঠাই আছে দুরকমের – সাজানো সব টেবিলে। সাথে চা আর কফি – খাচ্ছে সবাই তৃপ্তি করে। প্রীতম খাস্তগীর উঠে ঘুরে ঘুরে লক্ষ্য রাখছেন সবার খাবার দিকে – বিশেষ করে মহিলাদের। অলকানন্দার সামনে এসে দাঁড়ালেন এবার – আরে অলকা, তুম তো কুছ ভী নেই লিয়া, আও আও, আউর কুছ তো লোও – হাত বাড়িয়ে জোর করে পুরী তুলে দিলেন একটা।

- না, না – করে বাধা দেবার চেষ্টা করেছিল অলকানন্দা কিন্তু ততক্ষণে পড়ে গেছে প্লেটে পুরী। এবার আরও একটু ঘনিষ্ঠ হলেন প্রীতম খাস্তগীর, মাথা নামিয়ে গলার স্বর নিচু করে শোনালেন – মোলাকাত্ হুয়া, উইথ ইয়োর এক্স্ দ্য আদার ডে, অ্যাট জুবিলি সিনেমা হল্। এক লেডী ভী থী উনকে সাথ। হ্যাজ হি গট ম্যারেড এগেইন? – সংকুচিত হল চোখ দুটো, খবর সংগ্রহের উত্তেজনায় – তা কতদিন হল তোমাদের সেপারেশন? নিশ্চয় একটু লোনলি লাগে নিজেকে, আই অ্যাম সরি।

- সরি, বলতে পারব না আবার বিয়ে করেছে কিনা, আর সেপারেশন নয়, ডিভোর্স হয়ে গেছে আমাদের এক বছরের ওপর। না, আমি লোনলি বোধ করি না একটুও, এনজয়িং লাইফ – বিকশিত দন্তে বিরক্তি চেপে আশ্বস্ত করল প্রীতম খাস্তগীরকে।

এনজয়িং লাইফ! সত্যি-ই কি তাই? নাকি নিজেকেই ঠকাচ্ছে অলকানন্দা। বয়েস তো চল্লিশ ছুঁই ছুঁই – একা কি লাগে না নিজেকে? আপাততঃ সব সম্পর্ক ঘুচে গেলেও দেবেশ ছিল একটা অভ্যেস – অনেকদিনের যেন একটা অবলম্বন। ইতিহাসের কানাগলি থেকে তবু কেন সে উঁকি মারে মাঝে মাঝে মনের কোণায়? সত্যি বলতে নিজের কাছের মানুষ বলতে নেই কেউ আর। বাবা মা দুজনেই গত হয়েছেন সে তো বেশ কিছু বছর হল। দাদা বউদির সংসার আছে কোলকাতায়, কিন্তু সেখানে গেলে কেমন হাঁফ ধরে যায় যেন – অনেকদিন আর যাওয়া হয় নি। ছোটভাই তো আজকাল সানফ্রানসিসকোর আর্ণহামে পাকাপোক্ত ভাবেই সেটেলড্, খুব কচিৎ কদাচিৎ যোগাযোগ করে ফোনে। আসলে দুনিয়াটাই বিশেষ ব্যস্ত নিত্য আবর্তনের তাড়ায় – কে আর কার খোঁজ নেয়?

বন্ধু বান্ধব, চেনা পরিচিত তো আছে অনেকেই, কিন্তু তাদের সঙ্গে তো আর হৈ হৈ করা যায় না সর্বক্ষণ। আছে আরেকজন – বিচ্ছেদের পর অন্য কোন পুরুষের সান্নিধ্যে যে আসে নি তা নয়। সে হল নিলয়, ... নিলয় মিত্র – তার ঘর ভাঙ্গার সাথে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত সখা। কিন্তু রিপুতাড়িত সম্ভোগ আর মানসিক সম্পর্কের মধ্যে তফাৎ অনেকটাই। স্থায়ী সম্পর্ক তৈরি অনায়াসেই হতে পারত এর মধ্যে – আবার ঘর বাঁধতে চেয়েছে নিলয় - চল, একা একা আর কতদিন থাকা যায় - প্রপোজ তো করেই রেখেছে সে।
মাঝে মাঝেই দেখা হয় দুজনের, বেড়াতেও গেছে একসাথে। রাতও কেটেছে পরস্পরের সান্নিধ্যে – কখনও এই আন্ধেরী-ইষ্টের অ্যাপার্টমেন্টে, বা নিলয়ের শিবাজীপার্কের ফ্ল্যাটে, কিম্বা বেড়াতে গিয়ে। সরাসরি উপেক্ষা করে নি নিলয়ের ঘর বাঁধার সাদর আবাহন – শুধু সময় চেয়ে নিয়েছে আরও। আসলে নিজের মনটাকেই এখনও ভাল করে চিনে উঠতে পারে নি অলকানন্দা। পুরুষ মানুষকেও চেনা শক্ত – সময়ের সাথে তাদেরও রুপ পালটায়। একটা তিক্ত অভিজ্ঞতা হবার পর আরও সাবধানী – মনের গভীরে আরও ভাল করে যাচাই করে নিতে চায়। নইলে নিলয় তো উপযুক্ত খুবই, ওর প্রায় নিজের বয়সী, বন্ধুত্বও বেশ অনেক দিনের।

বিয়ের পর দেবেশ ও অলকানন্দা মুম্বাইতে এসে সংসার পাতার অল্প কিছু দিনের মধ্যেই আলাপ হয় নিলয় ও সুরঞ্জনার সাথে। কোথায় গলফ্ ট্যুর্নামেন্টে নিলয়ের সাথে প্রথম আলাপ হয়ে ছিল দেবেশের – গিন্নীকে নিয়ে বাড়িতে আসার উপরোধ উপেক্ষা করতে পারে নি। মুম্বাইতে এসে সেই থানে অঞ্চলের ফ্ল্যাটে তখন ছিল ওরা। আলাপের পর বন্ধুত্ব বেশ ভাল জমে উঠল সুরঞ্জনা ও নিলয়ের সাথে। বেশ মিশুকে মানুষ ওরা দুজনেই – আর প্রাণখোলা হৈ হৈ হাসিতে মাতিয়ে রাখতে পারে সর্বক্ষণ নিলয়। বন্ধুত্ব অবশ্য জমেছে বেশি অলকানন্দা আর নিলয়ের মধ্যেই – ঠাট্টা ইয়ার্কি লেগেই ছিল। আলাপ

হবার কিছুদিনের মধ্যেই পরস্পরের প্রতি সম্ভাষণ নেমে এল 'তুমি'-তে। 'আপনি আজ্ঞা' করে আর বন্ধুত্ব রক্ষা করা যায় না – কেমন যেন দূরের লোক মনে হয়। কথাটা এসেছিল নিলয়ের মাথাতেই – সমস্বরে সায় দিয়েছিল দেবেশ আর অলকানন্দা। সুরঞ্জনার তেমন কোন মন্তব্য ছিল না। একটু চুপচাপ মানুষ সে - সবাই যা চায় তাই হোক, আপত্তি নেই তার। দেখা হত প্রায় সব উইকএন্ডেই। হয় বাড়িতে জমিয়ে আড্ডা নয় মুম্বাই শহরের বিভিন্ন দ্রষ্টব্য জায়গায় ঘুরতে যাওয়া একসাথে হৈ হৈ করে। অলকানন্দাদের আসার আরও বছরখানেক আগে নিলয়রা এসেছে মুম্বাই – সুতরাং দেখার অনেক-ই বাকি।

অনেক আগের কাহিনি এসব। এরপর কেমন যেন ব্যস্ত হয়ে পড়ল সবাই জীবনে প্রতিষ্ঠার লড়াই নিয়ে। তখন এম-বি-এ কোর্স আরম্ভ করেছে অলকানন্দা, উন্নতির সিঁড়ী ভাঙ্গতে ব্যস্ত দেবেশ ও নিলয়ও। ফুটফুটে সুন্দর একটি মেয়ে এল সুরঞ্জনার কোলে বিয়ের দুবছর পরে। এর পর আর জমাট আড্ডার সময় কৈ? কালে ভদ্রে দেখা হয় আজকাল। – এই এসো একদিন আমাদের ওখানে, বহুদিন পাত্তা নেই তোমাদের – একই বক্তব্য দুপক্ষের। অবশ্য টেলিফোনে মোটামুটি যোগাযোগ থাকে নয়ত দেখা সাক্ষাৎ ঘটে অন্নপ্রাশন, জন্মদিন ইতাদি শুভ কাজ কর্মের আমন্ত্রণে। আর সুরঞ্জনা আসতে না পারলেও নিলয় ঢুঁ মারে কোন উইকএন্ডে – অসাক্ষাতের ঢিলে বাঁধন আবার পোক্ত হয়ে ওঠার সুযোগ পায়।

চিন্তা করলে অবাক লাগে এখন অলকানন্দার, সুরঞ্জনা আর নিলয়ের বিয়েও টেঁকে নি। ঐ মেয়ে জন্মাবার বছর পাঁচেকের মধ্যেই হয়ে গেল ডিভোর্স। মেয়ের কাস্টডি সুরঞ্জনাই পেয়েছে – দিল্লী চলে গেছে মেয়েকে নিয়ে। ছুটিতে যায় নিলয় দিল্লী গিয়ে দেখা করে আসে মেয়ের সাথে বছরে দু-বার। কি নিয়ে অশান্তি শুরু হয়েছিল দুজনের মধ্যে জানে না সঠিক – নিলয়ও বলে নি খুব বেশি ব্যাখ্যা করে। তবে যতদূর শুনেছে ঝামেলা বাধে নিলয়ের এক বিকলাঙ্গ ভাইয়ের দায়িত্ব নিয়ে। কোলকাতায় চিকিৎসা ও সেখানে হোমে বসবাসের জন্য মাসে অনেক টাকার খরচ। মুম্বাইতে চাকরিতে বেশ ভালই রোজগার নিলয়ের – ভাইয়ের জন্য চিকিৎসার খরচের সিংহভাগ বহন করত সেই-ই। সেই নিয়েই মনোমালিন্যের শুরু। অনেক বোঝাবার চেষ্টা করেছিল নিলয় কিন্তু নিজের সিদ্ধান্তে অটল সুরঞ্জনা – নিতে পারবে না দায়িত্ব। তাছাড়া খুচখাচ অন্যান্য অশান্তি লেগেই ছিল। আসলে শ্বশুরবাড়ি আদৌ পছন্দ হয় নি সুরঞ্জনার। কোলকাতার ছেলে, প্রফেশন্যাল সফট্ওয়ার ইঞ্জিনিয়র, ভাল চাকরি করে মুম্বাইতে, ভবিষ্যতে উন্নতি করবে আরও – খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে যোগাযোগ করেছিলেন সুরঞ্জনার বাবা দিল্লী থেকে। কোলকাতায় এসে ভাইয়ের বাড়িতে ওঠেন এবং নিলয় সমেত পাত্রপক্ষ সেখানেই এসে মেয়েকে দেখে। তাদের পছন্দ হবার পর ছেলের বাড়িও দেখে এসেছিলেন – এমন কিছু অবস্থা ভাল নয়, সেই পুরনো দিনের একান্নবর্তী পরিবার। জোড়াসাঁকোর এক জরাজীর্ণ বাড়িতে থাকেন নিলয়ের বাপ, মা অন্য সব শরিকের সাথে ভাগ করে – তবে হেঁসেল সব আলাদা। প্রতিবন্ধী ভাই ছাড়া একটি অবিবাহিত বোনও আছে নিলয়ের। আলিপুর কোর্টে ওকালতি করেন নিলয়ের বাবা। সেরকম ভাল অবস্থার না হলেও একমাত্র ছেলে দেখেই এগিয়েছিলেন এ বিয়েতে সুরঞ্জনার বাবা। তাছাড়া বিয়ের পর মেয়ে আর কোলকাতায় থাকবে কতদিন? জামাই-এর চাকরির খাতিরে থাকবে তো সেই মুম্বাইতে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত টিকলো না বিয়ে। দিল্লীতে অবস্থা বেশ ভালই সুরঞ্জনার বাবার। নাতনী সমেত ফিরে আসা মেয়ের থাকার ব্যবস্থা পাকাপোক্ত ভাবেই করে দিলেন ভদ্রলোক।

ডিভোর্সের পরে একেবারেই মুষড়ে পড়েছিল নিলয় – দেখা যায় নি বহুদিন কোথাও, মিশত না আর কারও সঙ্গে। মায়া লাগত ওর অবস্থা ভেবে, কিছুদিন পরে ফোন করে অলকানন্দা

– ডিভোর্স তো হয় অনেকেরই, তা বলে নিজেকে একেবারে গুটিয়ে রাখবে কেন? এই শনিবারে চলে এস আমাদের এখানে ডিনারে।

বিরক্ত হয়েছে দেবেশ – অত পিরীত দেখাবার কি আছে? ওর ডিভোর্স নিয়ে তোমার অত মাথা ব্যথা কেন?

এসেছে নিলয়, মেলামেশা শুরু করেছে আবার। হাসি মুখেই শুনিয়েছে – খারাপ না, অন্য রকম লাইফ এখন। তবে বিয়ের আগে 'ব্যাচিং'-এর মত নয়। সে রকম ডিরেকশনলেস নয়, এখন অনেক গোছানো।

মুখ টিপে হেসেছে অলকানন্দা – গোছানো? তা'হলে তো একবার গিয়ে দেখতেই হয় কেমন গোছানো হয়েছে একার সংসার! ব্যাপারটা কি ডাইনিং টেবিলে একটাই চেয়ার রেখেছ? আর তো লোক ডাকার বালাই নেই।

হো হো করে হেসে উঠল নিলয় – ব্রিলিয়ান্ট! কথাটা মাথায় আসে নি তো আগে, অনায়াসেই করতে পারি। তবে লোক না ডাকলে চলবে কি করে, এক তরফা আর কত খাওয়াবে? মোটামুটি কিছু পদ রান্না করা শিখে নিয়েছি, তোমাদের ডাকব এবার ক'দিন পরে।

- বহুবচনে দরকার নেই আর, একা অলকাকে ডাকলেই হবে। রান্নাবান্নায় ফাঁকিবাজি থাকলে ধরে ফেলবে ঠিক, আর দরকার হলে তোমার সংসারটাও গুছিয়ে দিয়ে আসবে একটু – শ্লেষটুকু গোপন করে নি দেবেশ।

এর পর দিন কেটেছে আবার, গড়িয়ে গেছে দুটো বছর। ডিভোর্সের বিমর্ষতা কাটিয়ে উঠে নিলয় আবার সেই হাসি খুশি আগের মানুষ। আসে - না ডাকলেও। অলকানন্দার মুখের ভাব উজ্জ্বল হয়ে ওঠে আরেকটু – দৃষ্টি এড়ায় না দেবেশের। নিলয়ের উপস্থিতিতে যে ওর হাব ভাব, চাল চলন, কথা বার্তার ওপর আরও তীক্ষ্ণ নজর রাখে দেবেশ সে বিষয়ে যথেষ্ট পরিমাণে সচেতন অলকানন্দা। কি যেন এক অদ্ভুত খেলা খেলছে দেবেশ – দর্শকের ভূমিকা নিয়ে যেন এক নাটক দেখছে সামনে বসে। সম্পর্কে চিড় ধরেছে অনেক দিন। থাকে একই ছাদের তলায়, শোয় একই বিছানায় - কিন্তু এ ওর মনের মানুষ নয় আর। আর ফাটলটা বাড়ছে ক্রমশ। কিন্তু কেন? নিজের কোন দোষ আছে কিনা ভাবার চেষ্টা করেছে অলকানন্দা। নিলয়ের সাথে ওর এই ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব যদি ঈর্ষার সৃষ্টি করত দেবেশের মনে সেটা স্বাভাবিক বলে মেনে নিত অলকানন্দা কিন্তু তা করে নি জানে বিলক্ষণ। আসলে ঈর্ষা শুরু হয়েছিল ও চাকরি আরম্ভ করার পর থেকে বিশেষ করে বড় প্রোমোশন পাবার পর-ই। আস্তে আস্তে কেমন যেন বদলে গেল মানুষটা – ঠিক সহ্য করতে পারে না যেন ওকে আর। ঘুন ধরা সম্পর্ক নিয়েই চলছিল জীবন গড়িমসি করে। অবশেষে ধৈর্যচ্যুতি ঘটল একদিন।

শুক্রবারের সন্ধ্যায় শুরু আরেকটি নতুন উইক-এন্ড। নিলয়ের ডিনারে আসার কথা আর রাতের শোতে তিনজনেরই সিনেমা যাবার প্রোগ্রাম। নিলয় এসে বসে আছে সেই কখন থেকে আর পাত্তা নেই দেবেশের। আর কিছুক্ষণ দেখে মোবাইলে ঘণ্টি মারবার কথা ভাবছিল এমন সময় সদর দরজায় চাবির আওয়াজে মুখ ঘুরিয়ে তাকালো অলকানন্দা। সব চিন্তার অবসান ঘটিয়ে ফিরেছে দেবেশ। নিলয়কে দেখে তাকালো হাসিমুখে – এই যে ভায়া, বসে আছ নিশ্চয়ই অনেকক্ষণ। তবে গিন্নী যখন সঙ্গ দিচ্ছেন মনে হয় না অসোয়াস্তি বোধ করেছ খুব। সরি, দেরি হয়ে গেল একটু – অফিসের এক পুরনো কলিগের সাথে কথা বলতে বলতে দেরি হয়ে গেল। ইন্টারেস্টিং টপিক। এই অলকা, তুমিও শোন মন দিয়ে। বলছিল এখানকার এক এক্সক্লুসিভ 'ওয়াইফ সোয়াপিং' ক্লাবের কথা – মানে ক্লাবে গিয়ে পার্টনার চেঞ্জ করে একটু টেস্ট বদলানো আর কী। হা হা করে হেসে উঠল নিজের রসিকতায়, এক লহমার জন্য একটা চোখ একটু ছোট করে নিলয়ের দিকে তাকিয়ে যোগ করল আবার – তোমারও অসুবিধে হবে বলে মনে হয় না, আর সব দিক থেকে পছন্দ হলে সিঙ্গল মেম্বারশিপও ইস্যু করে ওরা। কী! কেউ ইন্টারেস্টেড তোমরা? – পরম কৌতুকে চোখদুটো হাসছে যেন।

ব্যাপারটা ঠিক হৃদয়ঙ্গম হয় নি যেন কারও – নিঃশব্দ ঘরে একটা পিন পড়লেও শোনা যেত বোধ করি। বেশ কিছুক্ষণ দেবেশের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে নিলয়। আচমকা দাঁড়িয়ে উঠল হঠাৎ, দাঁতে দাঁত ঘষে একটা শব্দই উচ্চারণ হল মুখ থেকে – স্কাউন্ড্রেল!

আর বসে নি নিলয়। ঠেলে চেয়ার সরিয়ে প্রায় দৌড়েই যেন বেরিয়ে গেল অ্যাপার্টমেন্ট ছেড়ে। থম থমে মুখে একবার অলকানন্দার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখেছিল শুধু।

অবাক চোখে নিলয়ের নিষ্ক্রমণের দিকে তাকিয়ে বসেছিল অলকানন্দা – সঠিক বুঝতে পারছে না ব্যাপারটা এখনও। কী বলল দেবেশ? ওয়াইফ সোয়াপ? তার মানে কী? বৌ-বদল, পার্টনার চেঞ্জের ক্লাব? মেম্বার হতে বলছে ওকে দেবেশ? সম্বিৎ ফিরল হঠাৎ - বরং আমাকে তুমি বিষ এনে দাও – চীৎকার করে নিজেদের বেড রুমে ঢুকে সশব্দে দরজা বন্ধ করে দিল অলকানন্দা। সারারাত খোলে নি আর।

ঘুম হয় নি সারারাত – কী করবে, কী করা উচিৎ - এসব দুঃসহ চিন্তা ভারী করে রেখেছিল সারারাত চোখের পাতা। কখন যে তন্দ্রায় বন্ধ হয়ে এসেছিল চোখ ভোরের দিকে খেয়াল নেই একেবারেই। বেলা হয়ে গেছে বেশ। ধড়মড় করে বিছানা ছেড়ে উঠল এবার – পায়ে পায়ে দরজা খুলে দাঁড়ালো এসে হল্ ঘরে।

দেবেশ নেই হল্ ঘরে। ঘুরে ঘুরে পুরো অ্যাপার্টমেন্ট দেখেছে অলকানন্দা – সে মানুষ নেই কোথাও।

চিড় খাওয়া সম্পর্কে পুরোপুরি বড় ফাটল ধরেছে এর পর। ওর অফিসের কাছাকাছি ছোটখাট ফ্ল্যাট ভাড়া করে উঠে গিয়েছিল দেবেশ। একটা বছর কাটতে সময় লাগে নি বিশেষ। দুজনের সম্মতিক্রমে পাকাপোক্ত বিচ্ছেদও হয়ে গেছে- আইন মাফিক। সম্পত্তির ভাগও করেছে নিজেরাই – আন্ধেরী-ইস্টের তিন বেডরুম অ্যাপার্টমেন্ট ছাড়তে রাজি হয় নি অলকানন্দা। আপত্তি করে নি দেবেশ – ছাড়াছাড়ি হয়ে গেলেও বন্ধুত্ব বজায় রাখতে চায়। থানে ওয়েস্টে এক বেডরুম ফ্ল্যাটের মালিকানাতেই খুশি দেবেশ। অবশ্য পুরো ঋণ এখনও শোধ হয় নি কোন প্রপার্টির। সাব্যস্ত হয়েছে যে যার বাসস্থানের বকেয়া ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব নেবে। ইন্সিওরেন্স পলিসির কথাও উঠেছিল – অবিনাশের সাথে যোগাযোগ করা হয়েছে আবার। তার মত অনুযায়ী অকালে পলিসি নাকচ করায় লোকসান অনেক – অতি সামান্য ফেরৎ দেবে এল–আই-সি। আর ছাড়াছাড়ি হয়ে গেলেও রিস্ক্ কভার করেই রাখা উচিৎ - যেমন আছে। সুতরাং এ নিয়ে আর মাথা ঘামায় নি কেউ।

সম্পর্ক একেবারে ছিন্ন করে নি দেবেশ - বন্ধুত্ব বজায় রেখেছে, ফোন করে খবর নেয় মাঝে মধ্যে। এই অ্যাপার্টমেন্টেও এসে ঘুরে গেছে আবার ডিভোর্সের পর। নিলয়ের সাথে সম্পর্কের তিক্ততা দূর হয়েছে ক্রমশ – অলকানন্দার সামনেই আপোষে করমর্দন করে আবার বন্ধুত্বের বাঁধন জোড়া লেগেছে দুজনের।

-৮-

ক্রমশ নতুন পজিশনের কাজকর্ম, দায় দায়িত্ব সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হয়ে উঠেছে অলকানন্দা। ওর গ্রুপের আওতায় আসে এমন সব কর্পোরেট ক্লায়েন্টদের অর্থনৈতিক অবস্থা, সিকিউরিটি প্রোফাইল, কারবারের লেনদেন, বার্ষিক ব্যালান্সশিট, ইতাদি সবই দেখতে হয় খুঁটিয়ে আর ওর ব্যাংকের সাথে এ-সব কোম্পানির ফাইন্যান্সিয়াল লেনদেনের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এখন ওকেই নিতে হয়। বিভিন্ন ব্রাঞ্চ থেকে সব কেস-রিপোর্ট, ডকুমেন্টেশন, অ্যাসেসমেন্ট, ইত্যাদি আসে ওর কাছেই। সব দেখে শুনে ফাইন্যাল অনুমোদনের জন্য লিখিত সুপারিশ করে পাঠিয়ে দিলে জি.এম. সাধারণত অ্যাপ্রুভ্ করে দেন নিশ্চিন্ত মনে। তবে টাকার পরিমাণ একটি নির্দিষ্ট সীমার ওপরে হলে কেস পাঠাতে হয় বোর্ডের কাছে অনুমোদনের জন্য। এসব ক্ষেত্রে বোর্ড মিটিং-এ ওকেও হাজিরা দিতে হয় যদি কোন সদস্যের কোন প্রশ্ন থাকে ঐ কেসের কোন ব্যাপারে। খুব একটা ঝামেলায় অবশ্য পড়তে হয় না অলকানন্দাকে – ওর বিশ্লেষণ আর যুক্তিপূর্ণ বাখ্যা সাধারণতঃ গ্রহণযোগ্য বলেই মনে হয় সদস্যদের। কাজকর্মের সাথে অভ্যস্ত হওয়ার সাথে সাথে আত্মপ্রত্যয়ও ক্রমশ বাড়ছে।

সম্প্রতি একটা কেস নিয়ে ব্যস্ত অলকানন্দা – প্রিমিয়াম একস্‌পোর্ট ও ইম্‌পোর্ট কোম্পানির দুহাজার-কোটি টাকার এল-সি খোলার আবেদন। ব্রাঞ্চ থেকে পাঠিয়েছে প্রপোজাল ফাইন্যাল অনুমোদনের জন্য। টাকার পরিমাণ জি-এম-এ-র পরিসীমার ওপরে, সুতরাং বোর্ডের অনুমোদন লাগবে। অর্ধেক ক্যাশ আর বাকি কোম্পানির স্টকের সিকিউরিটির ভিত্তিতে এল সি-র আবেদন। ফাইলটা বেশ কয়েকবার খুঁটিয়ে পড়েছে – সব ডকুমেন্টেশন, অ্যাসেট প্রোফাইল, রিস্ক্ এনালিসিস, মোটামুটি সব ঠিকই আছে রিপোর্ট অনুযায়ী।

ক্লায়েন্ট নতুন নয় – এল-সি খুলেছে আগেও। তবু কেমন যেন একটা খটকা লাগছে মনে। রিপোর্ট অনুযায়ী কোম্পানি কোটি কোটি টাকার পেট্রো-কেমিক্যাল প্রোডাক্টস আমদানি করে বিদেশ থেকে আর রপ্তানি করে চামড়া, টেক্সটাইল, অটোমোটিভ পার্টস, মেকাট্রনিক মডিউলস, ইত্যাদি। গত ৩ বছরের বিজনেস রিপোর্ট, ব্যালান্সশিট, স্টক অ্যাসেসমেন্ট, ইতাদি সব কিছুই আছে রিপোর্টের সঙ্গে। উল্টে পাল্টে সব দেখে শুনে ফাইলটাকে সরিয়ে রাখল – এখন থাক, আরও একবার সব ভাল করে পড়ে দেখতে হবে ঠান্ডা মাথায়।
দিন দুই/তিন কেটে গেছে এর পর। অন্যান্য কাজে ব্যস্ত ছিল অলকানন্দা - প্রিমিয়াম একস্‌পোর্ট-ইম্‌পোর্ট-এর ফাইলটা দেখার আর সময় পায় নি এর মধ্যে, কাজ করার তালিকার মধ্যে লিখে রেখেছিল ওটা। টেলিফোন বেজে উঠল হঠাৎ - সুইচবোর্ডের রিসেপ্‌সনিস্ট জানালো ও প্রান্তে মোরারজি-নগরের ব্রাঞ্চ ম্যানেজার আছেন লাইনে, কথা বলতে চান। একটু অন্যমনস্ক ভাবেই ফোন কানে তুলল অলকানন্দা

– হ্যালো, অলকা হিয়ার।

সৌজন্যসুলভ উত্তর ভেসে এল – গুড মর্নিং ম্যাডাম। ম্যানেজার, আনন্দ্ সাক্সেনা বলছি মোরারজি নগর ব্রাঞ্চ থেকে।

- মর্নিং, বলুন কি করতে পারি আমি?

-ম্যাডাম, আমি ঐ প্রিমিয়াম একস্‌পোর্ট এন্ড ইম্‌পোর্ট কোম্পানির কেসটা সম্বন্ধে এনকোয়ারি করছিলাম। আসলে মি.অশোক কানোড়িয়া দু'দিন এসেছিলেন আমাদের ব্রাঞ্চে। কেসটার ফাইন্যালাইজেশন কবে হবে জিগেস করছিলেন। আমি ওনাকে বলেছি যে স্টেটাস খোঁজ করে জানাব।

একটু বিরক্তিই হল এবার। এসব কেস তাড়া হুড়োয় হয় না, অনুমোদন হতে সময় লাগে, এ রুটিন অজানা থাকার কথা নয় ম্যানেজারের – হু ইজ অশোক কানোড়িয়া?- প্রচ্ছন্ন বিরক্তিটুকু লেগে ছিল গলার স্বরে।

- আজ্ঞে, উনি-ই প্রোপ্রাইটার ঐ কোম্পানির। ফরেনে ওনার মাল রেডি ম্যাডাম, প্রথম কিস্তি পেমেন্ট না হলে অনেক টাকা ডেমারেজ লাগবে, সেজন্যই তাগাদা মারছেন উনি – একটু অনুনয়ের স্বরেই ব্যাখ্যা করলেন আনন্দ্ সাক্সেনা। এবার মগজে যেন ঢুকল ব্যাপারখানা। তবে এ ধরণের ক্লায়েন্টদের জানা আছে বিলক্ষণ। যে করে হোক নিজের কার্যোদ্ধারের জন্য কোনরকম চালু পদ্ধতি মানতে রাজি নয়।

সুস্পস্ট উত্তর এবার – ঐ ফাইলটা আমার কাছে এসেছে দিন দুই আগে, এখনও সব ভাল করে দেখে উঠতে পারি নি। আমার অ্যাসেসমেন্টে সব ঠিক পেলেই ফাইল যাবে বোর্ডের অনুমোদনের জন্য। সুতরাং সময় কিছু লাগবেই। এত টাকার ব্যাপার, তাড়াহুড়ো করে লাভ নেই, বুঝিয়ে বলুন আপনার ক্লায়েন্টকে – টেলিফোন রাখল অলকানন্দা।

পরের দিন-ই ফাইল নিয়ে বসেছে আবার। মোটামুটি ঠিকঠাক আছে সব – ব্রাঞ্চের রিপোর্টে সব ডিটেইলস-ই আছে। তবু কেমন যেন একটা অসোয়াস্তি থেকেই যাচ্ছে মনে – কোন একটা অসংগতির আভাস একবার দেখা দিয়েই মিলিয়ে যাচ্ছে আবার মনের কোণে। ঠেলে আবার সরিয়ে রাখল ফাইল টেবিলের এক কোণে – ঠান্ডা মাথায়

দেখতে হবে আবার। তবে ফেলে রাখা যাবে না বেশি দিন কেসটা – তাড়া মারছে ক্লায়েন্ট।

মানুষের মস্তিস্ক প্রসূত সমস্যা সমাধানের চিন্তাধারা বিচিত্র পদ্ধতি কাজ করে অবচেতন মনে। জল ভর্তি চৌবাচ্চায় স্নান করতে নেমেই উপছে পড়া জলের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ "ইউরেকা" বলে চীৎকার করে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে দৌড়ে ছিলেন নগ্ন দার্শনিক আর্কিমিডিস সমস্যার সমাধানের আনন্দে। এই আখ্যান সর্বজন বিদিত।

কাজ থেকে ফিরে সে দিন রাতে বেশ তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়েছিল অলকানন্দা। মাঝরাতে ঘুম ভেঙ্গে গেল হঠাৎ - কঠিন অংকের জটিলতার গাঁট আস্তে আস্তে খুলে যাচ্ছে যেন। প্রিমিয়াম একস্পোর্ট-ইমপোর্টের কেস ফাইলটা দেখতে পারছে চোখের সামনে – স্টক অ্যানালিসিসের স্প্রেডশিট দেখতে পারছে পরিষ্কার। কন্টেইনারের মোট সংখ্যা দেখানো আছে, ট্যোটাল ভলিউম দেওয়া আছে, অথচ আ
লাদা করে প্রতি কন্টেইনারের সাইজ কিম্বা ভলিউম লেখা নেই কোথাও। বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠল অলকানন্দা – কিচেনে গিয়ে ঢক ঢক করে জল খেল এক গেলাস। রাত সবে ১২ টা বেজে ২০ মি. হল্ ঘরের সোফায় বসল কিছুক্ষণ, একটু যেন হাল্কা লাগছে মাথা। কখন গিয়ে শুয়ে পড়েছে আবার খেয়াল নেই আর।

পরের দিন। ব্রাঞ্চ ম্যানেজার সাক্সেনাকে ফোনে পাওয়া গেল সকালের দিকেই – হ্যালো, গুডমর্নিং। আমি অলকা বলছি হেডঅফিস থেকে।

- গুড মর্নিং ম্যাডাম। কী খবর বলুন।

- প্রিমিয়াম একস্পোর্ট-ইম্পোর্ট কেসটার কথা বলছি। ওদের গোডাউন ইন্সপেকশনে কে গিয়েছিল?

- কেন ম্যাডাম? অ্যালায়েড্ ইনস্পেক্টিং হাউস থেকেই ব্যাংকের সব ইনস্পেকশন করা হয়। ইনস্পেকটিং অফিসারের নাম আমি খোঁজ করে জানাচ্ছি আপনাকে। কেন, প্রবলেম আছে কিছু?

- না না। তেমন কিছু নয়, আমার আরেকটু প্রশ্ন ছিল।

- ও কে, ম্যাডাম। আমি নামটা জানাচ্ছি একটু পরে।

অ্যালায়েড্ ইনস্পেক্টিং হাউসের ইনস্পেকটরের সাথে যোগাযোগ করে গোডাউন ইনস্পেকশনে নিজেই গিয়েছিল অলকানন্দা সঙ্গে রিপোর্টের কপি নিয়ে একটা। পাংশুমুখে সঙ্গদান করেছেন ইনস্পেকটর ভদ্রলোক। ৩ টে গোডাউন ঘুরে দেখার পর একটাই প্রশ্ন করেছিল সেই ভদ্রলোক-কে।

- আপনার নি মনে হয় এই রিপোর্টে দেখানো সব কন্টেইনারগুলো ধরবে এই ৩-টে গোডাউনে?
হ্যাঁ, না – কোন স্পস্ট উত্তর পাওয়া যায়নি সেই পাংশুমুখের ভদ্রলোকের কাছ থেকে।
এরপর ব্যাংকের ইন্টারনাল ইনভেস্টিগেশন ইউনিটের হাতে ফাইল পাঠানো ছাড়া আর কোন পথ খুঁজে পাচ্ছিল না অলকানন্দা। তার আগে জি-এম-কেও বলে রাখা উচিৎ ব্যাপারটা – এসব চিন্তাই ঘুরছিল এখন মাথায়। পিয়ন এসে ভিজিটিং কার্ড দিল একটা – অশোক কানোড়িয়া, প্রোপ্রাইটার, প্রিমিয়াম একস্পোর্ট অ্যান্ড ইম্পোর্ট কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড। একটু ফাঁপরেই পড়ল – কি বলবে ভদ্রলোককে? মনের সংশয় দূর করল পরক্ষণেই – আসতে বল ওনাকে – অপেক্ষমাণ পিয়নকে নির্দেশ দিল এবার।

দরজা ঠেলে ভেতরে এলেন অশোক কানোড়িয়া। ফর্সা মুখ, বেশ লম্বা চওড়া মানুষ, এয়ারকন্ডিশনড্ অফিসে এসেও ঘামছেন। পরিষ্কার ইংরিজিতেই আরম্ভ করলেন কথা বার্তা – গুড মর্নিং ম্যাডাম। গত দু-দিন থেকে ভাবছি এসে দেখা করব আপনার সাথে, কিন্তু বিজনেসের ব্যাপারে এত ব্যস্ত যে কিছুতেই সময় করে উঠতে পারছিলাম না। আজ এদিকেই এসেছিলাম অন্য কাজে – তাই ভাবলাম দর্শন করে আসি একবার।

- হ্যাঁ, বলুন কি করতে পারি আমি – সোজাসুজি তাকালো অলকানন্দা।

- আজ্ঞে, আমার কোম্পানির ফাইনান্সের ব্যাপারটা? শুনলাম ফাইল আছে আপনার কাছে।

- হ্যাঁ, ফাইলটা দেখছি আমি। এক্ষুনি বলতে পারব না কিছু, সময় লাগবে স্টাডি করে দেখতে কেসটা।

- একটা কথা বলব ম্যাডাম? – বেশ ভাল করে নিরীক্ষণ করে দেখছেন অলকানন্দার মুখের দিকে।

- বলুন।- আপনাদের এই ব্যাঙ্ক তো বরাবরই ডিল করে আমাদের কোম্পানির ফাইন্যান্স। আগে তো আমাদের কোন কেস আটকে থাকে নি এতদিন। আপনি কি কোন প্রবলেম দেখছেন আমাদের ফাইলে? যত দেরি হবে অ্যাপ্রুভালে আমার কোম্পানির লোকসান ততই বাড়বে। সব কিছু চেক করে মি. সাক্সেনা ফাইল পাঠিয়েছে আপনার কাছে। এখন বলুন আর কত সময় লাগবে এ কেসের ফয়সালা হতে?

ভাল করে মুখের দিকে তাকিয়ে দেখছে অলকানন্দাও। উত্তর দিল এবার – আপনার ফাইল আমি দেখছি, আসা করি ফয়সালা করতে খুব একটা আর দেরি হবে না। এখন যান, আপনার মূল্যবান সময় নষ্ট করবেন না। আর কিছু বলার নেই আমার – টেবিলে রাখা অন্য কাগজে মনোনিবেশ করল।

একটু অপেক্ষা করে উঠে দাঁড়ালেন অশোক কানোড়িয়া

– চলি ম্যাডাম। আপনি ব্যস্ত, সময় নেব না আর। তবে দেখবেন যেন তাড়াতাড়ি অ্যাপ্রুভাল হয়ে যায় আমার কেসটায়। হিন্দিতে যোগ করলেন এবার – কাম হো যানেসে ম্যয় খুশ, আউর আপকো ভি খুশ হোনেকা বন্দবস্ত্ হো যায়গা – বিদায় নিলেন এবার প্রিমিয়াম একস্পোর্ট-ইম্পোর্টের মালিক।

আরও দিন দুয়েক কেটে গেছে এর পরে। অসহ্য মাথার যন্ত্রণা নিয়ে অফিস থেকে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এসেছিল সেদিন অলকানন্দা। জামাকাপড় পালটিয়ে প্যারাসিটামল ট্যাবলেট খেয়ে হল্ ঘরের সোফায় একটু শুয়ে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল খেয়াল নেই সঠিক। ঘুম ভেঙ্গে গেল দরজায় বেল বাজার শব্দে। এই সময় আবার কে? কাজের একটা মেয়ে আসে ঘণ্টা দুয়েকের জন্য তবে সে তো আরেকটু পরে। জামাকাপড় ঠিক করে নিয়ে চোখ মুখ একটু মুছে নিয়ে সন্তর্পণে দরজা খুলল অলকানন্দা। ওদের কমপ্লেক্সের দরোয়ানের পাশে হাসি হাসি মুখে দাঁড়িয়ে আছেন অশোক কানোড়িয়া।

- বাবুজি আপকো সাথ মিল্নে আয়া – সমাচার জানিয়ে

লিফটে করেই নেমে গেল দরোয়ান।

হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে আছে অলকানন্দা, প্রায় অস্ফুট স্বরে প্রশ্ন করল – আপনি? এখানে?

- গুড ইভিনিং ম্যাডাম। আপনার সাথে একটু দেখা করতে এলাম – আধখোলা দরজা একটু ঠেলেই ভেতরে ঢুকলেন অশোক কানোড়িয়া, হাতে ব্রিফকেস একটা।

অগত্যা দরজা বন্ধ করে তাকে প্রায় অনুসরণ করেই ভেতরে এসে সোফায় বসতে বলে নিজেও বসল উল্টো দিকে। অ্যাপার্টমেন্টের চারদিকে তাকিয়ে দেখতে দেখতে সোফায় বসতে বসতে বললেন অশোক কানোড়িয়া -

ভেরী নাইস অ্যাপার্টমেন্ট আপনার, খুব সুন্দর সাজিয়েছেন। সহাস্যে যোগ করলেন তারপর – চলে এলাম, একটু মাফি মাঙার জন্য। প্রথম আলাপ হল সেদিন আপনার দপ্তরে, সঙ্গে নজরানা কুছ ভী ছিল না। তাই চলে এলাম সামান্য একটু প্রেজেন্ট নিয়ে – বলতে বলতে ব্রিফকেস খুলে একটা প্যাকেট বের করে রাখলেন সামনের কফি টেবিলের ওপরে। প্যাকেট খুলে এবার বের করা হ'ল নীল ভেলভেটের বাক্স দুটো। খোলা হল একে

একে – জ্বল জ্বল করছে বেশ বড় হীরের নেকলেস একটা। অন্যটায় একটা হীরে বসানো টাইপিন। আত্মপ্রশস্তির হাসি একটু লেগে আছে ঠোঁটের কোণে। সব দেখামাত্র লাফিয়ে উঠল অলকানন্দা সোফা থেকে। সোজা গিয়ে দাড়াল দরজা খুলে – বেরিয়ে যান, বেরিয়ে যান সব নিয়ে এখান থেকে। কে দিল আপনাকে আমার ঠিকানা? চলে যান এক্ষুনি সব নিয়ে, নইলে পুলিশ ডাকব আমি – সর্বশক্তি দিয়ে সামলাচ্ছে নিজেকে অলকানন্দা, থর থর করে কাঁপছে সারা শরীর।

একটু ঘাবড়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন অশোক কানোড়িয়া – আপনি ঝুট্‌মুট্ রেগে যাচ্ছেন ম্যাডাম। এ তো সামান্য প্রেজেন্ট আছে, এতটুকু নজরানা তো দেওয়াই আদত্।

এবারে চীৎকার করে উঠেছে অলকানন্দা – গেট আউট, গেট আউট, নইলে সত্যি-ই কিন্তু পুলিশ ডাকব আমি।

মুখের দিকে তাকাতে তাকাতে সব উপহার সামগ্রী গুছিয়ে নিয়ে এবার নিঃশব্দে বিদায় নিলেন অশোক কানোড়িয়া। ঠোঁটের কোণে তির্যক হাসিটুকু লেগেই ছিল।

সব জিনিষটা আরেকবার তলিয়ে দেখার জন্য বদ্ধপরিকর এবার অলকানন্দা, ফয়সালা একটা করতেই হবে। বেশ বড় মাপের গণ্ডগোলের একটা আভাস পাচ্ছে যেন। আপাতদৃষ্টিতে কোম্পানির অ্যাসেট সিকিউরিটি রেখে আমদানী-রপ্তানির ফিন্যানসিয়াল লেনদেন ব্যাঙ্কের মাধ্যমে করাটা প্রচলিত রীতি। কিন্তু অশোক কানোড়িয়ার হাবে ভাবে যেন লুকিয়ে আছে গোপন কিছু। এত টাকা খরচ করে হীরের গয়না দেবার প্রচেষ্টা কেন? একটা চিন্তা মাথায় ঝিলিক মারল হঠাৎ। এর আগের নেওয়া এল-সি-র ভিত্তিতে সব পেমেন্ট আর মাল আমদানির তালিকা একবার দেখে নিলে কী হয়? কোম্পানি সত্যি-ই কি ধরণের কারাবার করে দেখা উচিৎ সেটা। কিন্তু সে সব নথিপত্র কোথায়? হেড অফিসের রেকর্ডস-এ খুঁজে পাওয়া গেল না কিছুই। ব্রাঞ্চ কপি রেখেছে নিশ্চয়। কথা বলা দরকার এ বিষয়ে ব্রাঞ্চের সাথে।

- হ্যালো, মি সাক্সেনা? অলকা বলছি হেডঅফিস থেকে।

- হ্যাঁ, বলুন ম্যাডাম।

- প্রিমিয়াম একস্‌পোর্ট-ইম্‌পোর্টের নামে এর আগের বারে যে ৫০০ কোটি টাকার এল সি ইস্যু করে হয়েছিল তার এসোসিয়েটেড সব ট্রানজাকশন আর ইম্‌পোর্ট-একস্‌পোর্ট শিডিউলের সব ডেটেইলস দরকার আমার। হেডঅফিসের রেকর্ডে কিছু খুঁজে পাচ্ছি না। আপনার ব্রাঞ্চে কপি আছে নিশ্চয়। আপনি কাইন্ডলি সব ডকুমেন্টস ক্যুরিয়র দিয়ে পাঠিয়ে দিন আমার কাছে যত তাড়াতাড়ি পারেন।

- সে কী? – যেন আকাশ থেকে পড়ল সাক্সেনা – সে তো অনেকদিনের ব্যাপার হয়ে গেল ম্যাডাম। ওসব কাগজপত্র খুঁজে পাওয়া অসম্ভব এখন। তাছাড়া ক্লায়েন্টের কাছ থেকে অনেক হার্ড কপি নিয়ে তো পাঠিয়ে দিয়েছিলাম হেডঅফিসে, ওসবের সফট্ কপিও নেই। জেরক্স কপি সব কোথায় আছে বলা খুব শক্ত।

- তবু দেখুন, চেষ্টা করে – ফোন রাখল অলকানন্দা। - অপদার্থ – কথাটা বেরিয়ে এল মুখ থেকে অস্ফুট ভাবেই।

কেটে গেছে আরেকটি সপ্তাহ। এর মধ্যে অশোক কানোড়িয়ার টেলিফোন এসছে আরও দুবার। প্রথম বার কেসটার তাড়াতাড়ি ফয়সালা করার গতানুগতিক অনুরোধ, আর গতকাল ফোনে একটু কড়া কথাই শোনালেন কানোড়িয়া – আপনি কি সব ইনভেস্টিগেশন শুরু করেছেন আবার আমার কোম্পানির নামে? পুরনো সব ডকুমেন্টস চাইছেন? কেন আমার কেস ঝুলিয়ে রাখছেন? আমার লোকসান হলে কিন্তু আপনাকে কী আপনার ব্যাঙ্ককে আমি ছাড়ব না। বন্ধ করুন এ সব – প্রায় ধমকের স্বর।

কেমন যেন একটা জেদ চেপে গেল এবার। এ কেসের ফয়সালা একটা করতে হবে আজকেই। জি-এম-এর সাথে কথা বলে ইন্টারন্যাল ইনভেস্টিগেশন ইউনিটের

হাতেই তুলে দেবে এ ফাইল। কিন্তু এগুলো না কাজ – সেক্রেটারি জানালো জি-এম ইউরোপ গেছেন কনফারেন্সে, ফিরবেন আরও সপ্তাহখানেক পরে। অগত্যা আবার অপেক্ষা, ক্যাবিনেটে তুলে রাখল ফাইল।

এর পরবর্তী ঘটনার জন্য মানসিক প্রস্তুতি ছিল না একেবারেই।

পরের দিন। কাজে ব্যস্ত ছিল, ভিজিটিং স্লিপ নিয়ে এল পিয়ন – সাক্ষাৎপ্রার্থী, কে এক মনোজ গোয়েল। কোনও কোম্পানির তরফের লোক কিনা লেখা নেই কিছু। আসতে বলে আবার নিজের কাজে মন দিল অলকানন্দা। কয়েক মিনিট পরে দরজা খুলে ঘরে ঢুকল বেশ লম্বা রোগা চেহারার একটি লোক – বছর তিরিশ-পঁয়তিরিশের মত হবে বয়েস, চোয়ালের হাড় দুটো উঁচু আর জ্বল জ্বল করছে দুই চোখের বুদ্ধিদৃপ্ত দৃষ্টি। ঘরে ঢুকে চারদিকে তাকিয়ে নিয়ে বেশ ভাল করে দরজা বন্ধ করল লোকটি। মুখ তুলে তাকিয়ে আছে অলকানন্দা।

- গুড মর্নিং ম্যাডাম, আমার নাম গোয়েল, মনোজ গোয়েল। আমি সামান্য কেরানির কাজ করি এই ব্যাঙ্কেরই মোরারজি নগর ব্রাঞ্চে। কিন্তু এসেছি প্রাইভেটলি আপনার সাথে দেখা করতে – ব্রাঞ্চ থেকে কোন অফিসিয়াল ভিজিট নয় – ভাঙা ভাঙা ইংরিজিতে জানালো লোকটি।

- কে পাঠিয়েছে আপনাকে? সাক্সেনা? – একটু রুক্ষগলায় প্রশ্ন অলকানন্দার।

- আজ্ঞে না ম্যাডাম, ক্যাজুয়াল লিভ নিয়ে এসেছি আমি আপনার সাথে দেখা করতে, উনি জানেন না কিছু, কেউ-ই জানে না।

- ওঃ, তাই বুঝি? তা' আপনি এসেছেন কেন?

- দেখুন ব্রাঞ্চে আমাদের সেকশানে অনেকেই জানে যে আপনি প্রিমিয়াম একস্‌পোর্ট-ইম্‌পোর্ট-এর কেসটা নিয়ে ইনভেস্টিগেশন করছেন, পুরনো ডকুমেন্ট সমস্ত খোঁজ করছেন। আমি প্রাইভেটলি একটা কথা বলতে এসেছি আপনাকে, যদি ভরসা দেন তো বলি।

- কী বলতে চান, বলুন। কিন্তু আমি ভীষণ ব্যস্ত, বেশি সময় দিতে পারব না – কোনমতে ধৈর্য রাখছে অলকানন্দা।

- একটা কথা পরিষ্কার করে বলছি। কাগজপত্র, পুরনো ডকুমেন্টস্, আপনি যা খুঁজছেন কিছুই পাবেন না। জোর করলে আপনাকে যা পাঠানো হবে সব দুনম্বরী – ঠিক খবর ওতে কিছুই পাবেন না। একস্‌পোর্ট-ইম্‌পোর্ট-এর মালিক অশোক কানোয়াড় অত্যন্ত ঘোড়েল লোক – এই কোম্পানি ওর শুধু মুখোস একটা। আসল কারবার কোটি কোটি টাকা হাওলা করার। গতবার ৫০০ কোটি টাকার এল-সি খুলেছিল, কিন্তু আসলে তার অনেক বেশি টাকা পাচার করেছিল বাইরে ইম্‌পোর্ট করার নাম করে। আমদের ব্যাঙ্কে এল-সি খোলার সাথে সাথে আরও ৪-টে ন্যাশনালাইজড্ ব্যাঙ্কের সাথে যোগসাজশে অত্যন্ত সাধারণ একাউন্ট হোল্ডারদের নামধাম ব্যাঙ্কের রেকর্ড থেকে চুরি করে সেইসব নামে কোটি কোটি টাকা বিদেশে ভুয়ো কোম্পানির নামে পাচার করেছে। এখানে মসজিদবন্দরের এক অফিস থেকে এক বেনামী কোম্পানি খুলে বারোটা বিভিন্ন ইম্‌পোর্ট-একস্‌পোর্ট কোড ব্যবহার করে দেখানো হয় যে মিডল্-ইস্ট এবং কয়েকটি সাউথ-ইস্ট এশিয়ান দেশ থেকে মাল ইম্‌পোর্ট করা হয়েছে। আসলে স্মাগলড্ হয়ে আসে সোনার বার আর হীরে – কাস্টমসের সাথে বন্দোবস্ত আছে ভালমতই। কাগজপত্রে পাবেন অন্য হিসেব। অত্যন্ত চালু লোক ঐ অশোক কানোড়িয়া, হাতে রেখেছে সবাইকে, সে ব্রাঞ্চের সব স্টাফ থেকে আরম্ভ করে হেড অফিসের অফিসার এমনকি খোদ জি-এম পর্যন্ত সবাই মাঝে মাঝে ভেট পায় ওর কাছ থেকে। আপনি বোধহয় এই পজিশনে নতুন এসেছেন – নইলে আগেই নাম শুনতেন ওর। আপনার আগের যিনি ছিলেন ম্যানেজার এই পোস্টে উনি রাতারাতি বদলি হয়ে যান একটু খোঁজ খবর করার চেষ্টা করেছিলেন এ সব ব্যাপারে কিছু সন্দেহ হওয়ায়। এই সব কারবারের জন্য যেকোন গন্ধা কাজ করতে পারে।

এখানকার আন্ডার ওয়ার্ল্ডের সাথেও বিস্তর জান-পরিচয় আছে অশোক কানোড়িয়ার। খুন খারাবি করাতে অনায়াসেই পারে।

হাঁ করে তাকিয়ে আছে অলকানন্দা – এ সব কথা আমাকে বলে কী লাভ আপনার? আমকে কী ভয় দেখাতে এসেছেন?

- আজ্ঞে না ম্যাডাম। আমার লাভ লোকসান নেই কিছু। তবে মনে হচ্ছে আপনি জেনুইন মানুষ, কিছু না জেনে সাপের গর্তে পা দিয়েছেন। লাভের কথা জিগেস করছেন? ঐ লোকের মুখোশ খুলে দিতে পারলে বিশেষ খুশি হব। আমি মারাঠি, শিবসেনার ভক্ত। আমাদের এখানে এসে অন্য প্রদেশের লোক ব্যবসা করুক কোন আপত্তি নেই। কিন্তু এরকম ভণ্ড, চোরাকারবারির মুখোশ খুলে দিতে চাই। এর আগে একবার চেষ্টা করেছিলাম, সুবিধে হয় নি বিশেষ। এবার আমি তৈরি অনেক বেশি। কাগজপত্র যা খুঁজছেন কিছু দিতে পারি আমি – চুপিচুপি কপি করে রেখেছিলাম আরও আগেই, ব্রাঞ্চে সব নষ্ট করে ফেলার আগেই। এখন বলুন এসবের মধ্যে নিজেকে জড়াতে আপনি চান কিনা – তা'হলে কিছু কিছু ডকুমেন্টস্ দেব আমি জোগাড় করে। তবে বিপদ আছে এতে – আপনার আমার চাকরি নিয়ে টানাটানি হতে পারে। জানেও মেরে দিতে পারে।

অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে অলকানন্দা – কী বলছে, কেন বলছে সামনে বসা লোকটা, বিশ্বাস করতে পারছে না কিছু। মুখের দিকে তাকিয়ে থেকেই হাত বাড়িয়ে টেবিলে রাখা জলের গ্লাস্-টা হাতে তুলে নিল ঢাকা খুলে।

উঠে দাঁড়ালো এবার মনোজ গোয়েল। একটুকরো কাগজ এগিয়ে দিল – এটা রাখুন, আমার প্রাইভেট টেলিফোন নম্বর লেখা আছে। যদি দরকার মনে করেন আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আর যদি জড়াতে না চান নিজেকে, আমি বুঝে নেব - আমাদের আজকের কথাবার্তার তো সাক্ষী নেই কেউ, আমি ভুলে যাব অনায়াসেই, আপনিও মনে রাখবেন না। দুহাত তুলে "নমস্তে" জানিয়ে আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল মনোজ ঘর থেকে।

চুপচাপ নিষ্ক্রমণের দিকে তাকিয়ে নিজের চেয়ারে বসেছিল অলকানন্দা – অন্যমনস্ক ভাবে হাত তুলে বিদায় দেবার ইংগিত জানিয়েছিল কিনা খেয়াল করতে পারছে না। বেরুবার সময় আস্তে আস্তে ঘরের দরজাটা বন্ধ করতে ভোলে নি মনোজ গোয়েল – হাসিটুকু তখনও মিলিয়ে যায় নি মুখের।

এরপর ক'দিন অশোক কানোড়িয়ার মুখখানা যেন সর্বক্ষণ ভেসেছে চোখের সামনে। রাতের ঘুমেরও ব্যাঘাত ঘটেছে থেকে থেকে। মনে মনে কিছু ঠিক করে উঠতে পারছে না অলকানন্দা। অফিসে উর্ধতন কারও সাথে এ বিষয়ে কথা বলার আগে অন্য কারও সাথে আলোচনা করতে পারলে ভাল হ'ত।

সামনের শনিবার নিলয়কে ডিনারে বলার কথা চিন্তা করে মনে কিছুটা স্বস্তি পেল অলকানন্দা।

-৯-

প্রাক্তন স্বামীটিকে এবার পুলিশষ্টেশনে এনে আরও ভাল করে জেরা করার সুযোগ পাবার আগেই ঘটনা চক্রের ঢেউ বইল অন্যদিকে। জোড়াখুনের রহস্যের কোন কিনারা হতে না হতে আরেকটি খুনের ঘটনায় তটস্থ হয়ে উঠেছে মুম্বাই শহর। এবারের ভিকটিম সান্তাক্রুজ অঞ্চলের বাসিন্দা এক যুবক – নাম মনোজ গোয়েল। সন্ধ্যের পর বাস থেকে নেমে পায়ে হেঁটে বাড়ি ফিরছিল। প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ অনুযায়ী এক মোটরবাইকের পিছনে বসা আরোহী নাকি গুলি চালায় পাশ দিয়ে যাবার সময়। প্রায় অন্ধকার রাস্তার আলোতে মোটরবাইকের নম্বর সঠিক কেউ দেখতে পায় নি। একটি অবিবাহিতা বোন ও মার সাথে যুবকটি বাস করত ভান্ডুপ অঞ্চলে তিরুপতি কলোনির একটি ফ্ল্যাটে। নিজেও অবিবাহিত, একটি নামী প্রাইভেট ব্যাঙ্কে কাজ করত। এই খুনেও মুম্বাইয়ের মাফিয়া কিলারদের হাত আছে বলে সন্দেহ করছে পুলিশ

– 'সুপারির' বিনিময়ে কাজ করে এরা। ফরেনসিক রিপোর্ট অনুযায়ী এ গুলি ছোঁড়া হয় ০.২২ বোরের কোল্ট-লুগার রিভলবার থেকে। এরকম অস্ত্রও মাফিয়াদের হাতে প্রচুর।

তবে আরেকটি তথ্য বিশেষ করে তলিয়ে দেখার মত। আন্ধেরি-ইস্ট অঞ্চলের জোড়াখুনের মৃত মহিলাও তো ঐ প্রাইভেট ব্যাঙ্কেই কাজ করতেন। আর ঐ মহিলার হ্যান্ডব্যাগ তল্লাসি করে যে সব কাগজপত্র পাওয়া গেছে তার মধ্যে এক-টুকরো কাগজে হাতে লেখা টেলিফোন নম্বর ছিল একটা। সম্প্রতি খোঁজ করে জানা গেছে ওটি মনোজ গোয়েলের মোবাইল ফোন নম্বর। এর মধ্যে এই রহস্যের কোন চাবিকাঠি লুকিয়ে আছে নাকি?

স্থানীয় থানার তদন্তকারী অফিসারের দৃঢ় বিশ্বাস যে ঐ কাগজে হাতের লেখার মালিকের পরিচিতি নির্ণয় করা এই হত্যা রহস্যের সমাধান প্রচেষ্টার পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ সূত্র।

সত্যি ভীষণ চিন্তান্বিত মুম্বাই সেন্ট্রাল অফিসের সিনিয়র ক্রাইম ইনস্পেকটর সুনীল আপ্তে।

****

মাতৃগর্ভ

দীপ্তি দত্ত

মায়ের গর্ভে দেখেছিলেম এক বিচিত্র দুনিয়া,

রক্ত-মাংসের দেওয়াল ঘেরা ঘন অন্ধকার গুহা।

কেমন করে গেলাম সেথায়, মা বলেন নানা রূপকথা

তবে বিজ্ঞান বলে পিতাই মাতৃগর্ভে ভ্রূণ স্থাপনের হোতা।

নিরাকার থেকে আকার মেলে সময়ের গতির তালে,

মায়ের খিদেয় আমার খিদে, মায়ের ঘুমে ঘুম আসে।

মায়ের আনন্দে আমার আনন্দ, মায়ের দুঃখে দুঃখও হত মনে,

মায়ের সাথে সন্তানের যোগসূত্র হয়ত একেই বলে।

তবে সেই যোগসূত্র ছিন্ন করে পৃথিবীতে যেদিন এলাম

নিরাপদ আশ্রয় হারিয়ে তাই হয়ত সেদিন

কেঁদেছিলেম চিঁ চিঁ উচ্চস্বরে।

****

মুদ্রণ প্রমাদ

তরুণ ভট্টাচার্য

(লেখাটির শেষাংশ প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য। অবশ্য প্রবাসে অপ্রাপ্তবয়স্কদের বাংলা পড়ার সম্ভাবনা সীমিত।)

মুদ্রণপ্রমাদ – ইংরিজিতে যাকে বলে Printing Error – হাস্যকর ও শোচনীয় পরিস্থিতি সৃষ্টিতে এক অনবদ্য ভুমিকা পালন করে আসছে। ছাপার ভুলের দোষারোপ সচরাচর করা হয় Printer's Devil কে। যদিও Printer's Devil কথাটির আদি অর্থ হচ্ছে ছাপাখানায় শিক্ষানবীশ, কথাটির উৎস কিন্তু একটু ভূতুড়ে ব্যাপার থেকে। পুরনো দিনে বিশ্বাস ছিল, সব ছাপাখানাতেই এক শয়তান ভূত বিচরণ করে যার কাজ হচ্ছে নানা বিপত্তি সৃষ্টি করা – যেমন বানান বদলে দেওয়া বা কথা বদলে দেওয়া। গুগল সাহেবকে জিজ্ঞেস করলে অবশ্য আরও অনেক কিংবদন্তির উদাহরণ পাবেন।

পুরনো দিন থেকেই শুরু করি – সুবর্ণভূমি গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সাহেব পরিদর্শক পায়ের ধুলো দেবেন। তাই বেশ কিছুদিন থেকেই সারা স্কুলে ও গাঁয়ে সাজ সাজ রব। প্রধান শিক্ষকমহাশয় দিনরাত ইংরাজি শব্দ মুখস্থ করে আসছেন সাহেবকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য। যথাদিনে সাহেব ঘোড়ার গাড়ি থেকে নামলেন। স্কুলের কমন রুমে সাহেবকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলেন শিক্ষকমহাশয়। সুসজ্জিত আরাম কেদারার দিকে হাত দেখিয়ে বললেন – 'Garlic Garlic!' সাহেব অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। সাহেবও কিছুই বুঝতে পারছেন না, আর শিক্ষকমহাশয়ও নাছোড়বান্দা। শেষমেষ সাহেব বিরক্ত হয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন – 'Stop it!'

রহস্যটা হচ্ছে – বাংলা থেকে ইংরাজি শব্দের অভিধানে রসুন শব্দটি ছাপার সময়ে, মুদ্রণপ্রমাদে র এর বদলে ব ছাপানো হয়েছে। তার ফলে রসুন হয়ে গেছে 'বসুন'। শিক্ষকমহাশয় তাই বসুন বসুন কথাটির তর্জমা করে নিয়েছেন Garlic Garlic। শিক্ষকমহাশয় তার ভুলের কারণ ব্যখ্যা করে বোঝাবার সুযোগ পাননি বলেই মনে হয়, তার কারণ ঘটনাটির পরেই তাকে সুবর্ণভূমি থেকে গোবরডাঙায় বদলি করা হয়।

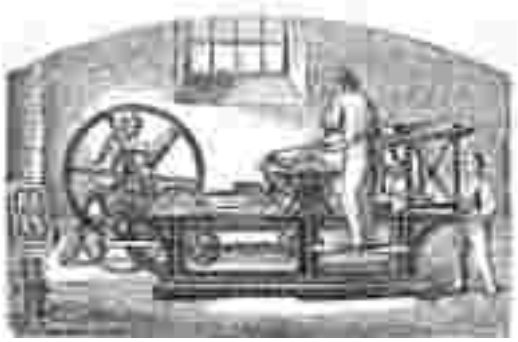

পরবর্তীকালে গোপীবল্লভপুরের উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে রবীন্দ্রজয়ন্তী অনুষ্ঠানে কবিগুরুর 'কচ ও দেবযানী' নাটকটি শ্রুতিনাটক হিসেবে পাঠ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। অনেক বাছাই করে দুজন ছাত্র ছাত্রীকে নির্বাচন করা হল। শুরু হল নিয়মিত মহড়া। সাংস্কৃতিক বিভাগের শিক্ষিকা অনেক যত্ন করে তৈরি করলেন অনুষ্ঠানের খসড়া। সেই খসড়া পাঠানো হল কলকাতার ছাপাখানায় ছাপাবার জন্য। যথাসময়ে ছাপাখানা থেকে কয়েকশ কপি ডাকযোগে পাঠানো হল স্কুলে। সময়ের অভাবে ও যোগাযোগের অসুবিধার জন্য (তখন তো আর ইমেল ছিল না) প্রুফ দেখার আর সময় হয়নি। অনুষ্ঠানের শুরুতে যখন অনুষ্ঠান সূচি দর্শকদের মধ্যে বিতরণ করা হল, চারদিকে চাপাহাসি শুরু হল। কারণ? কচ ও দেবযানী মুদ্রণপ্রমাদে ছাপানো হয়েছে স্কচ ও দেবযানী। পরদিন ছাত্রীরা স্কচ পান করে দেবযানীর মাতাল ভঙ্গিতে ও জড়ানো উচ্চারণে কবিতা পাঠের অনুকরণে মেতে উঠল। তাতে সাংস্কৃতিক বিভাগের শিক্ষিকার চাকরি নিয়ে টানাটানি পরেছিল কিনা আমার ঠিক জানা নেই। তবে ঘটনাটি যে চায়ের আড্ডায় সবার মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলেছিল তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

ঠিক উল্টো এক বিড়ম্বনায় আমি পড়েছিলাম চাকরিতে শিক্ষানবীশ হয়ে যোগদান করার পরে। বিহারের এক শিল্পনগরীতে প্রথম চাকরিতে যোগদান করার পর কর্মস্থল থেকে থাকার ব্যবস্থা করা হয় একটি হস্টেলে। একসঙ্গে বেশ কয়েকজন নব্যযুবক সেই হস্টেলে পাশাপাশি ঘরে থাকত। হস্টেলটিতে রান্না করত পাশের গ্রামের এক পাচক। মধ্যাহ্নভোজনের জন্য রোজ প্রায় দু

ঘণ্টার ছুটি থাকত ও তখন আমরা সবাই দল বেঁধে হস্টেলে খেতে আসতাম। একদিন দুপুরে হস্টেলে এসে দেখি, সেই পাচক কোনও বিশেষ কাজে বাড়ি চলে গেছে। রান্নাবান্না হয়নি। এদিকে সবাই প্রচণ্ড ক্ষুধার্ত। তখন সবাই মিলে ঠিক করা হল পাউরুটি ও ডিমের অমলেট তৈরি করে খাওয়া হবে। কিন্তু রান্না ঘরে পাউরুটি শেষ। তাই বিহারি দারোয়ানকে ডেকে বলা হল তাড়াতাড়ি পাশের বাজার থেকে পাউরুটি নিয়ে আসতে। কিন্তু তার বোঝার ক্ষমতা আর স্মৃতিশক্তি নিয়ে সবারই সন্দেহ ছিল, তাই একজনকে বলা হল একটা কাগজে লিখে দিতে। সে বাঙালী লোক, হিন্দি লিখতে পারেনা। তাই সে তাড়াতাড়ি ইংরাজিতে লিখে দিল। বেশ কিছুক্ষণ পর খিদের জ্বালায় যখন সবার মেজাজ বেশ গরম, দেখা গেল দারোয়ান আপন মনে হিন্দি গান গাইতে গাইতে খালি হাত দোলাতে দোলাতে আসছে। কাছাকাছি আসতেই সবাই একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল – 'Bread কিউ নেহি লায়া?' দারোয়ান খুব শান্তভাবে উত্তর দিল – 'লায়া হ্যায়, লায়া হ্যায়।' তারপর ধীরেসুস্থে পকেট থেকে এক প্যাকেট দাড়ি কামাবার ব্লেড বের করে দিল। এরকম দুর্ঘটনার কারণ – তাড়াহুড়োতে আমাদের বন্ধুটি bread এর বদলে blade লিখেছিল। তখন তার মাথায় কি ঘুরছিল, তা রহস্যই রয়ে গেল। কিন্তু এও তো মুদ্রণপ্রমাদ এর জন্যই?

শুনেছি ইংরাজি থেকে হিন্দি শব্দের এক অভিধানে umbrella র হিন্দি ভুল করে ছাপা হয় 'ছাতি'। বোধহয় ছাপাখানার কর্মচারী বাঙালী ছিলেন ও হিন্দির জ্ঞান সীমিত ছিল। সেই অভিধান পড়ে হিন্দি ভাষা আয়ত্ত করেন আমাদের পাড়ার রঘুদা। কারণ রঘুদা চাকরি সূত্রে কিছুদিনের জন্য লখনউ যেতে বাধ্য হন। একবার খুব

জোরদার বৃষ্টির সময় umbrella নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে দেখেন একজন মহিলা বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে যাচ্ছেন। দয়ালু রঘুদা ভাবলেন সদ্য শেখা হিন্দি শব্দ প্রয়োগের এই সুযোগ – হিন্দিতে মহিলাকে বললেন 'আপ হামারা ছাতি মে আ জাইয়ে।' মহিলা তো কষে এক চড় লাগালেন রঘুদাকে। রঘুদা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারলেন না কোথায় ত্রুটি হল! পরে হিন্দিভাষী বন্ধুমহলে গল্প করতেই হাসির হুল্লোড় উঠল। কারণ হিন্দিতে ছাতি মানে বুক, ছাতা মানে umbrella। সেই অভিধানের প্রকাশকের বিরুদ্ধে রঘুদা ক্ষতিপূরণের মামলা করে উঠতে পেরেছিলেন কিনা আমার জানা নেই,

তবে আজও আড্ডায় আমার এই কাহিনী হাসির খোরাক যোগায়।

আরেক হাস্যকর পরিস্থিতির এক অনবদ্য অভিনয় রয়েছে 3 Idiots হিন্দি ছায়াছবিটিতে। একজন দুষ্টু ছাত্র স্কুলের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ভাষণে 'চমৎকার' এর জায়গায় টাইপ করে দিল 'বলাৎকার' এবং এক দক্ষিণ ভারতীয় ছাত্র যার হিন্দি জ্ঞান সীমিত, স্কুলের অনুষ্ঠানটিতে বার বার পড়ে গেলেন 'আমাদের শিক্ষক আমাদের উপর বলাৎকার করেন'। দেখেননি? ছবিটি দেখুন।

আজকাল অবশ্য বিজ্ঞাপনে চমক সৃষ্টি করার জন্য ইচ্ছাকৃত ভাবেই একই উচ্চারণের অন্য শব্দ (ইংরাজিতে যাকে বলে Homonym) অহরহ ব্যবহার করা হয়। যেমন চুল কাটার দোকানে সাইনবোর্ড We live to dye, একটি থাই রেস্টুরেন্টের নাম Thai tanic, ডিমের দোকানে সাইনবোর্ড Egg-citing, Pizza র দোকানে বিজ্ঞাপন 'Buy our pizza, we knead the dough'।

আজকাল বিদেশে এর একটা সুপ্রচলিত অজুহাত হচ্ছে typo অর্থাৎ typographical error। অবশ্য এর সুরাহার জন্য রয়েছে spell check। কিন্তু তা সত্ত্বেও নানা বিপত্তির সৃষ্টি হয়। যেমন সম্প্রতি একটি চাকরির বিজ্ঞাপন দেখলাম – পদটির নাম হচ্ছে Shit Team Leader। আসলে পদটি ছিল Shift Team Leader এর। বহুদিন কোনও আবেদন পত্র না জমা পড়ায় কর্মকর্তারা নানা ভাবনাচিন্তা করতে গিয়ে আসল কারণটি সনাক্ত করেন, কিন্তু ততদিনে এ নিয়ে social media তে হাসির হুল্লোড় পড়ে গেছে।

শুনেছি বহুদিন আগে যখন রেডিওই ছিল জনপ্রিয় প্রচার মাধ্যম, একদিন আবহাওয়ার বিজ্ঞপ্তিতে 'আজ রাতে কলকাতাবাসীদের তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে অনুরোধ করা হচ্ছে কারণ আজ রাতে সারা শহরে ঘন বর্ষণ হবার সম্ভাবনা রয়েছে' – এই ঘোষণাটিতে মুদ্রণপ্রমাদে 'ঘন' হয়ে যায় 'গন' ও 'বর্ষণ' হয়ে যায় 'ধর্ষণ'। যথা সময়ে ভুলটি ধরা পড়ে যায়। নয়ত দেবদুলাল বাবু সেদিন খবর পাঠের সময় হয়ত ভয়ানক বিষম খেতেন।

টাকা পয়সা আদান প্রদানের কাজে মুদ্রণপ্রমাদের প্রভাব খুবই বিপত্তিকর। বহুদিন পর কলকাতায় গিয়ে একবার ব্যাঙ্কের পাসবুক আপডেট করাই। জমা টাকার অঙ্কটা দেখে খুবই পুলকিত হয়ে বেশ মোটা টাকা তুলে নিলাম। বাকি টাকা তুলতে যেদিন গেলাম, ব্যাঙ্কের ম্যানেজার অপ্রত্যাশিতভাবে তার ঘরে ডেকে চা দিয়ে আপ্যায়ন করে করুণ কণ্ঠে বললেন, 'কাল ভুল করে আপনার ব্যালেন্স লিখতে গিয়ে একটা বেশি শূন্য লেখা হয়ে গেছে (যার ফলে ১,০০০ হয়ে যেতে পারে ১০,০০০)। দয়া করে টাকাটা ফেরৎ দিয়ে দিন'। আমি যদিও সঙ্গে সঙ্গে অনুরোধ রক্ষা করি, সবাই কি তা করবে? আমরা মাঝে মাঝে শুনি, অমুকের চেকে ভুল করে বেশি টাকা লেখা হয়ে গেছে, টাকা পেয়ে তিনি চম্পট দিয়েছেন আর পুলিশ ইত্যাদি তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

আরেকটি মজার পরিস্থিতি উল্লেখ করে শেষ করছি। এক মফঃস্বল শহরে রবীন্দ্রজয়ন্তীতে গান চলাকালে বেশির ভাগ দর্শকই হলের বাইরে আড্ডায় মশগুল। এক সময় ঘোষণা হবার কথা 'এখন যৌথ সঙ্গীত পরিবেশনা করবেন শ্রী অমুক ও শ্রীমতী অমুক'। ঘোষণা শুনেই সব দর্শক একছুটে হলের ভিতরে হাজির। কারণটা কিন্তু গায়ক গায়িকা নামকরা বলে নয়। যৌথ কথাটিতে 'থ' এর জায়গায় মুদ্রণপ্রমাদে 'ন' ছাপানো হয়েছিল। ঘোষক না ভেবে চিন্তে তাই পড়ে শুনিয়েছেন।

আমার একজন বিদেশি শিক্ষক বলেছিলেন – তুমি যদি চাও তোমার কোনও দীর্ঘ বিবৃতি সবাই ধৈর্য ধরে পড়ুক, তাহলে ওপরে confidential লিখে দিও। সবাই উৎসুক হয়ে পড়বে। কেউ confidential লেখার কারণ জানতে চাইলে typo বা মুদ্রনপ্রমাদ বলে চালিয়ে দিও।

দেখলেন তো? মুদ্রণপ্রমাদের উপকারিতাও কিন্তু অনেক – বলুন সত্যি কিনা?

****

বিজয়ার পত্র

স্বর্গীয় কবি সন্তোষ কুমার দে-র "শেষ সঞ্চয়" বইটি থেকে নেওয়া

দূর থেকে লিখিলাম গুটিকয় ছত্র
বিজয়ার শুভাশিস সহ এই পত্র।
লক্ষ্মীর মত হও ভরা ধনধান্যে
সম্মান দিও যথাযত সম্মান্যে।
সরস্বতীর মত হও মহাপন্ডিত
তর্ক বিচারে কভু হোয়োনাকো খণ্ডিত।
সীতা ও সতীর দুখ পেওনা অদৃষ্টে,
তবু নাম থাকে যেন সতীদের লিস্টে।
সংসারে সুখী হও পটু গৃহকর্ত্রী
মনে রেখো সংহিতা, গীতা ও গায়ত্রী।
তোমাদের গৃহে থাক অবিচল শান্তি,
উপেক্ষা করে নিও ছোট ভুল-ভ্রান্তি।
গৃহকর্তাটি যদি হন কভু রুষ্ট
পরিহাস-প্রিয়তায় কোরো তারে তুষ্ট।
বিজয়ার শুভাশিস জানালাম বোনটি
প্রবাসীর চিঠি পেলে খুশি হবে মনটি।

****

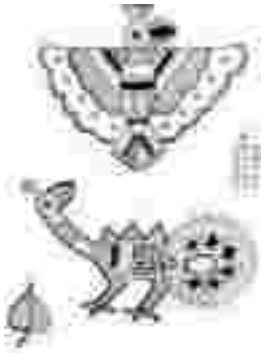

বেট ৩৬০

দেবাশীষ ব্যানার্জী

অবনীবাবুর আজকাল মন খুব খুশী। চারিদিকে কেমন যেন খুশীর ফোয়ারা ছুটছে। আকাশে বাতাসে টাকা উড়ছে। লোকে আনন্দে মত্তহারা। সেই আনন্দে অবনীবাবু মেতে উঠতে চাইছিলেন।

অবনীবাবু অফিস থেকে ফিরে টিভি দেখছিলেন। আজকাল টিভিতে সারাক্ষন বেটিং এর ad দেখায়। অস্ট্রেলিয়া থেকে কলকারখানা তো সব উঠে যাচ্ছে। আর তার বদলে গজিয়ে উঠছে নতুন নতুন বেটিং কোম্পনি। হয় sports bet না হলে ladbroke অথবা crown bet। সব কোম্পানী উঠে পড়ে লেগেছে যাতে সবাই অনেক অনেক টাকা বেটিং করে জিতে যায়। ওই তো একটা ভুঁড়িওয়ালা লোককে দেখায় যে মোবাইল ফোন টিপে টিপে ঝুড়ি ঝুড়ি টাকা কামিয়ে ফেলছে। না হলে স্যামুয়েল জ্যাকসন দেখা দিচ্ছে বেটিং এর মা হয়ে। আর কিসে না বেটিং হচ্ছে! ফুটি তো ছেড়ে দিলাম, সঙ্গে আছে ক্রিকেট, টেনিস, নেটবল, বাস্কেটবল, রাগবি, এমন কি গ্রামে গঞ্জের খেলার উপর দিব্যি বেটিং চলছে। আহা কি চমৎকার ব্যবস্থা। বেটিং কর আর সুটকেস ভর্তি করে টাকা বাড়ী নিয়ে যাও। আগেকার হিন্দী সিনেমায় ওই রকম এক বাক্স টাকা পেতে অজিতের টাইগারকে পুরোনো জাহাজ ঘাটে লাল নীল আলো জ্বালিয়ে, পুলিশকে ধোঁকা দিয়ে জান খতরায় দিতে হতো। আজকাল আর সে সব কষ্ট করার দরকার নেই। শুধু মোবাইল ফোন থাকলেই হবে। ফোনের উপর আঙ্গুল বোলাও, ডান থেকে বামে বা নিচ থেকে উপরে, তারপর সুযোগ বুঝে টিপে দাও। ব্যাস বেট লেগে গেল। এবার খেলা দেখো আর টাকা কামাও। এ যেন রথ দেখা ও কলা বেচা। আর বেট ভুল হলে ক্যাশ ব্যাক। তা হলে আর চিন্তা কি!

এই সব দেখে অবনীবাবু ভাবলেন যে এবার কপাল ফিরল বলে। ঠিক করে ফেললেন যে এবার বেটিং-এ নামতে হবেই হবে। কিন্তু প্রথমেই সমস্যা দেখা দিলো ফোনটা নিয়ে। অবনীবাবুর ফোনটা বেশ মোটা-সোটা শক্ত ধরণের। তাতে ১, ২, ৩, ৪ নম্বর আছে, একটা ছোটো স্ক্রিনও আছে। কিন্তু সেই স্ক্রিনে আঙ্গুল বোলালে কিছুই হয়না। শুধু ফ্যালফাল করে চেয়ে থাকে আর তারপর নিভে যায়। অগত্যা শেষকালে ওনার অনেক দিনের বন্ধু নকুড়বাবুর শরণাপন্ন হলেন। নকুড়বাবু এইসব ব্যাপারে অনেক ফান্ডা আছে।

- শোনো নকুড় আমার একটা সাহায্য চাই।
- বলে ফেল।
- তুমি একবার এসে আমার ফোনটাকে একটু জাগিয়ে তোলো!
- ঠিক আছে আমি কাল যাব তোমার বাড়ী।

পরের দিন নকুড় বাবু এসে হাজির হলেন। বললেনঃ

- বলো কি ব্যাপার।
- দেখো আমি ভেবেছি যে এবার আমি বেটিং-এ নামতে চাই। কিন্তু ওই টিভির ad এর মতো স্ক্রিনে আঙ্গুল বোলালে কিছুই হচ্ছে না!

নকুড়বাবু ফোনটা দেখে বললেন যে এই ফোনে ঔ সব বেটিং তো হবেনা। তোমাকে smart ফোন কিনতে হবে। না হলে ওসব বেটিং ফেটিং কিচ্ছু করা যাবে না।

- তা এই smart ফোনের দাম কত?
- এই ধরো নিদেনপক্ষে $৫০০ আর একটু ভালো লেটেস্ট মডেল হলে $৮০০।
- সে তো অনেক টাকার ধাক্কা!
- আরে সেই সব ফোন হচ্ছে ঘুমন্ত রাজকন্যার মতন! কপালে যেই আঙ্গুল ছোয়াবে তখনই জেগে উঠবে। তারপর সেই জেগে ওঠা ফোন নিয়ে তুমি অনেক কিছু করতে পারবে - যেমন সিনেমা দেখ, বেটিং করো, facebook, twitter, email, গেমস খেলা আরো কতো কি! এই দেখো আমার নতুন smart ফোন।

অবনীবাবু ফোনটা নেড়ে চেড়ে দেখে বললেন !-!

- আরে এখানে তো কোনো নম্বরের বাটন দেখছি না? খালি একটা কাঁচ!
- ওই কাঁচের মধ্যে বাটন আছে।

এই বলে নকুড়বাবু দেখিয়ে দিলেন কি করে কাঁচ থেকে বাটন ফুটিয়ে তুলতে হয়!

অবনীবাবু আর কি করেন! নতুন ফোন কেনার জন্য বেরোলেন। অনেক দোকানে ঘুরে ঘুরে শেষকালে একটা নতুন smart ফোন কিনেই ফেললেন। বাড়ী এসে ফোনে চার্জ দিয়ে sim card লাগিয়ে তৈরী হলেন বেটিং করার জন্য। কিন্তু কপাল এখনো মন্দ। ঘুমন্ত রাজকন্যার মতন ফোন ঠিকই জেগে উঠলো অবনীবাবুর আঙুলের ছোঁয়া পেয়ে। তবে বেটিং-এর ব্যবস্থা কিছু দেখতে পেলেন না। রাজকন্যা আবার ঘুমিয়ে পড়ল। অবনীবাবু আবার নকুড়বাবুকে ডাকলেন।

-!ওহে নকুড় smart ফোন তো কিনেছি, কিন্তু এখানে বেটিং এর তো কিছু দেখছি না!

- আরে ফোন কিনলেই হবে? তোমাকে তো এবার App ডাউনলোড করতে হবে!

- সেটা আবার কি?

- আরে App মানে application. সেটা ডাউনলোড করে ফোনে install করার পর তুমি বেটিং চালু করতে পারো।

- তুমি একবার এসে এইগুলো সব করে দাও। আমার দ্বারা হবে না।

নকুড়বাবু সময় করে এলেন একদিন। সব কিছু দেখে বললেন ভাই অবনী তোমার তো দেখছি internet খুব slow আর wifi দরকার App ডাউনলোড করতে হলে। তুমি একটা high speed internet এবং wifi বাড়ীতে লাগাও। অবনীবাবুর মাথায় হাত। সে তো আরো অনেক টাকার ধাক্কা! আচ্ছা ওই ভুঁড়িওয়ালা লোকটা তো দেখি সুইমিং পুলের ধারে বসে বেটিং করে। তা আমি সেই রকম করতে পারি না কেন?

- আরে ওই সব লোকেরা ডাটা কেনে। সেই জন্য ওরা সুইমিং পুলের ধারে বসেই বেটিং করতে পারে।

- সে কি আবার ডাঁটা কিনতে হবে? তা হলে তো চিনের দোকানে যেতে হবে। তবে ডাঁটা চচ্চড়ি কিন্তু বেশ খেতে। আহা ঠাকুমা কি দারুন বানাতো! তুমি তো একবার খেয়েছিলে আমাদের বাড়ী তে।

- আরে এ ডাটা সে ডাঁটা নয়। এ হলো ইংলিশ data.

- ইংলিশ ডাঁটা আমি জীবনে শুনিনি। আজকাল ইংলিশরাও ডাঁটা খেতে শিখে গেছে?

- আরে ধুত্তরি। ডাঁটা নয়। তখন থেকে বলছি data. মানে এই যে বেটিং করবে তাতে data আপলোড হবে ডাউনলোড হবে। সেই data টি না কিনলে মোবাইল থেকে বেটিং করা যাবে না। আর সে data কিনতে গেলে চিনের দোকানে না গিয়ে যেতে হবে Telstra বা Optus এর দোকানে।

অগত্যা অবনীবাবু ছুটলেন Telstra-র দোকানে। সেখান থেকে data কিনে ফেললেন। তারপর এসে হাজির হলেন নকুড়বাবুর বাড়ীতে। নকুড়বাবু App ডাউনলোড করে অবনীবাবুর নতুন ফোনে বেটিং করার ব্যবস্থা সব করে দিলেন।

ব্যাস এখন সব কিছু রেডি। শুধু বেটিং করাই বাকি। এবার সাউথ আফ্রিকা খেলতে এসেছে অস্ট্রেলিয়ায়। টেস্ট ক্রিকেট আরম্ভ হলো। ব্যাটিং-এ দেখাচ্ছে অস্ট্রেলিয়া জিতলে ১ ডলারে পাবেন ১.২০ আর সাউথ আফ্রিকা জিতলে ১ ডলারে পাবেন ২ ডলার। একদম ডবল। সাউথ আফ্রিকা তো বেশ ভালোই টীম। জিতে যাবার সম্ভাবনা খুবই উজ্জ্বল। আর বেটিং করে যদি পয়সা করতেই হয় তা হলে ছোট খাটো পয়সা না জিতে বড় রকমের বাজিমাত করাই ভালো। না হলে তো cash back . অবনীবাবু লাগিয়ে দিলেন $৫০০, যে সাউথ আফ্রিকা এই টেস্টে জিতে যাবে। অবনীবাবু খুব উৎসাহ নিয়ে টিভিতে খেলা দেখতে বসলেন। সাউথ আফ্রিকা ভালোই শুরু করলো। অবনীবাবু ও খুব উত্তেজিত। কড়কড়ে ৫০০ ডলার হাতে আসবে এবার। খেলা চলেছে। আস্তে আস্তে অস্ট্রেলিয়া সাউথ আফ্রিকা কে চেপে ধরলো। অবনীবাবুর মুখ চুপসে আসতে লাগলো। শেষকালে অস্ট্রেলিয়া টেস্ট ম্যাচ জিতে গেল। অবনীবাবু খুব হতাশ হয়ে বেটিং-এর দোকানে গেলেন $৫০০ cash back করে আনতে। অনেক খরচ হয়ে গেছে বেটিং-এর ব্যবস্থা করতে, তার ওপর আরো $৫০০ এর বেটিং। বেটিং এর দোকানের কাউন্টারে গিয়ে বললেন - বেটিং তো ঠিক হলো না। যাইহোক আপাতত cash টা এবার back করে দিন।

কাউন্টারের ওপার থেকে লোকটা সব কিছু দেখে টেখে একটা ৫০ ডলারের নোট এগিয়ে দিলো। অবনীবাবু অবাক হয়ে বললেনঃ

- একি! ৫০ কেন? আমি তো ৫০০ ডলারের খেলেছিলাম!

- sorry mate. cash back is only up to $50.

- সে কি? সে রকম তো আমি কিছু দেখিনি বা শুনিনি আগে ওই সব Ad এ!

- Listen carefully mate. It is said a bit quickly and at the end of the Ad.

অবনীবাবুর মাথা ঘুরতে লাগলো। বেট এর দুনিয়ায় মাথা ৩৬০ ডিগ্রী ঘুরে এলো!

****

পৃথিবী বলে

সোনালি গুপ্ত

পৃথিবী বলে, প্রকৃতি ভাই
না সহিতে পারি এ মানব লাঞ্ছনা,
বিষিত বায়ু, দূষিত নদ
ধূসর মলিন বন বনান্তর।
পশু পক্ষী করে ক্রন্দন।

পৃথিবী বলে হে মানব জাতি,
দিতেছি এ গম্ভীর সুচনা,
হানিব আকাল, ঘোর বরষণ,
দাবানল, খরা,
ভয়ার্ত ভুকম্পন।

শুধরাও তব জীবন যাপন,
করোনা এ ধরণীকে যাতনা
জানিয়া রাখিও প্রলয় আনিব
ধংসিব সবে,
রহিল মোর বচনা।

****

আমি
এবং রবীন্দ্রনাথ - ১

শ্রীময়ী ভট্টাচার্য

আমি যখন জন্মেছিলাম, আমার রং ছিল ভয়ানক কালো। বাবা নাকি সিস্টারদের বলেছিল, এ আমার মেয়ে নয়। পাল্টাপাল্টি হয়েছে। কিন্তু কেউ শোনেনি। বাবার নিজের রঙ নিয়ে গর্ব ছিল বোধহয়। সাদা চামড়ার লোকেরা শুনলে কি হাসবে ভাবুন!

আমার দিদির ডাকনাম ছিল দোয়েল। তার সাথে মিলিয়ে আদর করে দিদি আমার নাম রাখে কোয়েল। বরাবরের অপছন্দের নাম আমার। কিন্তু আমি বোঝার বয়সে পৌঁছে বুঝলাম গোটা পৃথিবী আমায় ওই নামেই ডাকে, অগত্যা..

তো এহেন দোয়েল-কোয়েল পাখি খেলতে যেত শ্যামলীমাসির বাড়ি। শ্যামলীমাসি আর সত্যবানমামা। এঁরা এক দম্পতি। মাসি এবং মামা, কারণ দুজনের সাথেই আমাদের পরিচয় মায়ের সূত্রে। এঁরা দুজন আলাদা মানুষ। বিবাহিত হওয়াটা এঁদের একমাত্র পরিচয় নয়। ওঁদের বাড়িতে একটা বড় খেলার মাঠ ছিল। আর, ওঁরা দুজনেই ছিলেন টেগোর ইন্সটিটিউটের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী।

আমি তখন ছোট। সবে নার্সারি টু। আমার ওই বাড়িতে যাতায়াত মূলত খেলাধুলোর জন্য। ছোটবেলায় আমার কাছে সবচেয়ে বড় বিস্ময় ছিল, আমার বাবা বা মা সকাল থেকে উঠে দৈনন্দিন কাজ নিয়ে কথা বলে, বা বলে না। বাবা অফিস যায় আর সন্ধ্যেবেলায় আড্ডা মারতে বেরোয়। মা রান্নাবান্না করে আর সন্ধ্যেবেলায় দিদির বন্ধুদের পড়ায়। অথচ কেউ একবারের জন্যও খেলতে যেতে চায় না! কী ভীষণ বোরিং! আমি তখন ভগবান-টগবানে বিশ্বাস করি। আমি রোজ তাকে বলি, ঠাকুর আমি যেন কখনও বাবা মায়ের মত না হয়ে যাই। যেন রোজ খেলতে যাওয়ার অদম্য ইচ্ছেটা আমার মন থেকে মুছে না যায়। হা ইশ্বর!

শ্যামলীমাসির কাছে দিদি কবিতা, নাটকও শিখতো। দিদি ক্লাস থ্রি। দিদিরা সেবার 'ছাত্রের প্রতিশ্রুতি' শ্রুতিনাটকের আকারে করছে। রোজ রিহারস্যাল। আমারও খুব সুখের দিন। মা দিদির সাথেই বসে থাকে, রিহারস্যাল শোনে, আর আমি সন্ধ্যে পেরিয়ে রাত অবধি খেলি। অনুষ্ঠানের দিন একদম কাছে। পুরোদমে মুখস্থ চলছে পার্ট। হঠাৎ, ঠিক দুদিন আগে দিদির ধূম জ্বর। কী হবে এবার? সবার নজর পড়ল আমার উপর। আমার বয়স তখন চার। পড়তেও শিখিনি একবর্ণও। শ্যামলীমাসি তাও একবার বলল, একটা লাইন বলার চেষ্টা করতে। আর ওমা, আমি গড়গড় করে বলে ফেললাম নাটকটা! কখন যে শুনতে শুনতে আমার মুখস্থ হয়ে গেছে সব ডায়ালগ, আমি নিজেই জানিনা! অনুষ্ঠানের পর মায়ের কাছে শুনেছি, সব দর্শকের কোলে অন্তত একবার করে ঘুরেছিলাম আমি।

সেই প্রথম রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার আলাপ, আর ওঁর হাত ধরে আমার হিরো হওয়া।

তারপর একবছর পেরিয়ে গেছে। নিলভনার সাথে বন্ধুত্ব হয়েছে। ক্লাসের যেকোনো কাঁদুনে বাচ্চার স্কুলতুত মা আমি। আর ওদিকে দিদি ক্লাস ফোর। যাদবপুর বিদ্যাপীঠ, যে স্কুলেই আমার গোটা ছোটবেলা কেটেছে, তার সব ভাল, শুধু, আমাদের সময়ে একটা অ্যাডমিশন টেস্ট হত ক্লাস ফোর থেকে ফাইভে ওঠার, যা ছিল যমের থেকেও ভয়ঙ্কর! আমরা ছিলাম ঘোর কট্টরপন্থী বাঙালী পরিবার। ফলে বাংলা মিডিয়াম ছাড়া কথাও পড়ানোর কথা আমার বাবা মা কখনও ভাবতই না। আর কাছাকাছি তেমন ভাল

মেয়েদের বাংলা মিডিয়াম স্কুল নেই বলে ওদের ধারণা ছিল। ফলে এখানেই ফাইভে চান্স পেতেই হবে।

আর তখন আবার ছেলেদের মায়েরা ভীষণ গর্বিত হয়ে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনে পাঠাতে চাইছেন ছেলেদের। বুকে পাথর রেখে ছেলেকে হস্টেলে রাখবেন, তবু পড়াশুনো এবং মানুষ হওয়া শিখবে ছেলেরা। আমার মায়ের দুঃখে চোখ ফেটে জল। কেন যে রামকৃষ্ণ মিশনে মেয়েরা পরতে পারে না! আমার মেয়ে দুটো মানুষ হবে তো?

যাই হোক, তো আমার চতুর্দিকে সবাই তখন উন্মাদের মত পড়াশুনো করে চলেছে। আর বাবা মায়েরা ফর্ম তুলতে ছুটছে, নয় ফর্ম ভরছে।

এমনি এক সকালে আমি কলম ধরলাম।

‘নরেন্দ্রপুর খুব শান্ত।

সবাই হয়েছে ক্লান্ত।

এ’প্রান্ত, ও’প্রান্ত...

সবাই উদ্ভ্রান্ত।’

না। উদ্ভ্রান্ত শব্দটা আমি জানতাম না অবশ্যই। কারুর মুখে শুনেছিলাম, বানানটাও ধার করে লেখা।

বয়স তখন পাঁচ। নার্সারি থ্রি। মা যখন আনন্দে ডগমগ, রোয়াব নিয়ে মাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, ‘তোমাদের রবীন্দ্রনাথ যেন প্রথম কবিতা কবে লেখে?’ মা খুব গম্ভীর হওয়ার চেষ্টা করে বলেছিল, ‘আট বছর বয়সে।’ মা কোনমতে ঠোঁট কামড়ে হাসি আটকাচ্ছিল তখন, কিন্তু আমার চোখে ছিল যক্ষের ধন জয় করার অহংকার – ‘আমি একটু আগেই লিখলাম।’

তারপর নাকি একটু ভেবে বলেছিলাম, ‘হুহ! তাহলে কে বড়? আমি, না রবীন্দ্রনাথ?’

****

আমি
এবং রবীন্দ্রনাথ – ২

শ্রীময়ী ভট্টাচার্য

আমাদের বাড়ি ছিল গানের বাড়ি। আমার মাসি ছিল রবীন্দ্রভারতীর স্বর্ণপদকধারী। যদিও তারপর কিছুই করেনি, সংসারে আজেবাজে কাজ করা ছাড়া। আমার বাবা গান শেখেনি কখনো, কিন্তু গাইত ভালোই। আমার ঠাকুমার কিরকম একটা যেন জামাইবাবু হতেন সঙ্গীত বিশারদ তারাপদ চক্রবর্তী আর তা নিয়ে ঠাকুমা বেশ গর্বিত থাকতেন। বাবার ভুত্তান মামা, যাঁর শুধু নামই শুনেছি আমি, তারাপদদাদুর প্রিয় ছাত্র ছিলেন। তাই থেকেই নাকি বাবার এই গানের গলা। তদুপরি বাবার

কেন যেন ধারণা ছিল, বাবার গলাটা অবিকল হেমন্তের মত। সেখানেই শেষ নয়, বাবাকে নাকি রাস্তাঘাটে লোক দেখলেই বলত, ঠিক যেন উত্তমকুমার। (জানিনা, বাবা-মা প্রেম করার সময়, বসন্ত বিলাপের মত কোন ঘটনা

ঘটেছিল কিনা।) আমি যদিও দু'ক্ষেত্রেই কোন মিল কখনো খুঁজে পাইনি, কিন্তু এরকম ভাবতে কার না ভালো লাগে, বলুন? মেনে নিতেই বা ক্ষতি কি?

আমার মা আবার ছিল ক্লাসিক্যালের নাড়াবাঁধা ছাত্রী। মা গান শিখত পণ্ডিত অমরেশ চৌধুরীর কাছে। প্রতি রোববার আমাকে আর দিদিকেও বগলদাবা করে নিয়ে যেত মা। ছোটবেলা থেকে, টাচউড, আমার ভাগ্য বড়ই সুপ্রসন্ন এসমস্ত বিষয়ে। বয়স তখন ৬। প্রথমদিন গেছি। ক্লাসে গান হচ্ছে। মায়েরা সবাই বেশ উচ্চস্বরে কখনো সরগম, কখনো আআ করে গান গাইছে। আমি মাথামুণ্ডু কিচ্ছু বুঝছি না। হঠাৎ কোন শব্দ ছাড়া এতজন পুর্ণবয়স্ক ভদ্রলোক-ভদ্রমহিলা অকারণে চিৎকার করছেন কেন? (খড়্গহস্ত মানুষজনের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি এই বাক্যের জন্য। বয়স।)। ভাগ্যক্রমে পাশেই রাখা ছিল একটা ছোট্ট বিছানা, কি জানি কার জন্য। আমি পাশ কাটিয়ে টুক করে গিয়ে ওই বিছানাটায় সটান ঘুম দিলাম। আর ভাগ্য ভাবুন, মা যখন আমাকে এই মারে তো সেই মারে, মাস্টারমশাই বললেন, 'আরে ওকে বকিস না, ওর মধ্যে সুর আছে, তাই ওর সুরের ছোঁওয়ায় ঘুম এসে যায়।' আর পায় কে?

এদিকে বয়স বাড়ছে, টক্করও বাড়ছে আমার রবীন্দ্রনাথের সাথে। কিন্তু গান লেখাটা পেরে উঠছি না কিছুতেই। এমনিতেই আমার বাড়িতে সকাল থেকে রাত, ওই তখনকার দিনের রেকর্ড প্লেয়ারে দেবব্রত বিশ্বাস গেয়ে চলতেন। এমনকি শনিবার রাতে যখন কিনা পাশের বাড়ি থেকে ভেসে আসছে 'সুপারহিট মুকাবলা'র গান, আর আমার কান দুটো কুকুরের মত খাড়া হয়ে উঠছে, তখনও। দুর্বিষহ দিন ছিল সেসব। কারণ আমার বাবা-মায়ের মতে হেমন্ত, কিশোর কুমার এবং গীতা দত্ত ছাড়া যেকোনো হিন্দি গান শোনাই মহাপাপ। গজল তাও চলতে পারে। মাঝেমধ্যে।

না। কিন্তু প্রতিবাদের ভাষা তো খুঁজে বের করতে হবে আমায়। অনেক ভেবে বুঝলাম, ভাষা খুঁজে লাভ নেই। আমার ভেতর তো সুর আছে, তার সদ্ব্যবহার করি!

আমিও এবার তারস্বরে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে শুরু করলাম

বাড়িতে। সবার প্রায় কান ঝালাপালা হবার দশা। মা তড়িঘড়ি ছুটে এসে বলল, 'এসব কী গাইছিস তুই? এটা কী সুর?' আমি ভ্রূকুঞ্চন করে তাকালাম মায়ের দিকে। (গান কিন্তু থামাইনি।) এ'সূত্রে বলে রাখি, আমার ভ্রূ দুটো অবিকল চন্দ্রকান্তা'র ক্রূর সিং-এর মত। এখন তো কেটেকুটে তাও ভদ্র করেছি। কিন্তু তখন ভ্রূ উপরে তুললে আমার কপালে এভারেস্টের চুড়া অবধি দেখা যেত।

মা আবার ধাক্কিয়ে বলল, 'কিরে?' আমি আমার অহঙ্কারের সুরে বললাম, 'কথাগুলো রবীন্দ্রনাথের, সুরটা আমার। এখন থেকে এভাবেই গাইব আমি।'

****

বিশ্বাস

অজানা

নীমকরোলী বাবার গল্প বলার আগে, সূত্রপাতে আসা যাক। তাঁর সঙ্গে পাঠকদের খানিক পরিচয় করিয়ে দিই।

অনেক বছর আগে – ভারতে তখন ব্রিটিশ প্রশাসনের যুগ। ফারাক্কাবাদ স্টেশন থেকে টুন্ড্লা অভিগামী ট্রেনে উঠেছিলেন লক্ষ্মণদাস নামে এক তরুণ সাধুবাবা। এক হাতে চিমটে এবং অপর হাতে কমন্ডলু নিয়ে, অর্ধনগ্ন সেই সাধু ট্রেনে উঠে একটা ফার্স্ট ক্লাস কম্পার্টমেন্টের মধ্যে গিয়ে বসেছিলেন।

একটু পরেই এক শ্বেতাঙ্গ টিকিট ইন্স্পেক্টর বাবু সেই কম্পার্টমেন্টে ঢুকে, সাধুকে দেখে একেবারে স্তম্ভিত। নিজেকে সামলে নিয়ে সাধুকে যখন টিকিট দেখাতে বললেন তখন অবশ্যই নেতিবাচক উত্তর পেয়ে অত্যন্ত ক্ষেপে গেলেন। সাধুকে যারপর-নাই তিরস্কার করে, অপমান করে তিনি পরের স্টেশনে নামিয়ে দিলেন।

সাধুবাবা অম্লানবদনে একটা গাছতলায় তাঁর চিম্টে গেড়ে বসে পড়লেন। সেই গ্রামটির নাম ছিল নীমকরোরী।

এরপর সবুজ সিগন্যাল পেয়ে স্টেশন ছেড়ে ট্রেনের এগিয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু, এ কি! ড্রাইভার শত চেষ্টা করেও ইঞ্জিনে স্টার্ট দিতে পারল না। অথচ ইঞ্জিনে কোন সমস্যাও খুঁজে পাওয়া গেল না।

খানিক ভাবনাচিন্তা করলেন হত্তা-কত্তারা। তারপর সেই ট্রেনে আরোহী কয়েকজন ভারতীয়ের পরামর্শে, সাধুকে পুনরায় গাড়িতে তুলে নেওয়া হল। একগাল হেসে সাধু বললেন, "চল্ ভওয়ানী"। ট্রেন এবার এগোতে আরম্ভ করল।

এই ঘটনার পর, সেই স্টেশনের সূত্র ধরে তাঁর নতুন নামকরণ হল নীমকরোরী বাবা। পরবর্ত্তীকালে নীমকরোরীর পরিবর্ত্তে নীমকরোলী নামেই পরিচিত হলেন।

* * *

আমার বাল্যকাল এবং কৈশোর কাটে ইলাহাবাদে। প্রতি বছর ইলাহাবাদ শহরে সারা মাঘ মাসটা জুড়ে, সঙ্গমের তীরের মস্ত গ্রাউন্ডের ওপর মেলা চলে। সেই সময়টাতে ভারতবর্ষের অনেক জায়গা থেকে সাধু-সন্ন্যাসীরা চলে আসেন এখানে। মাঘমেলা গ্রাউন্ডের ওপর তাঁবু খাটিয়ে কল্পবাস করেন তাঁরা।

আমার বাবা ছিলেন সাধু-সন্তদের অনুরাগী। তিনি মাঘমেলার সময়ে প্রায়ই চলে যেতেন কল্পবাসী সাধুদের তাঁবুতে। আমিও সঙ্গ নিতাম। সন্ধ্যার সময়ে, গঙ্গার তীরে খাটানো সারি সারি তাঁবুগুলো তখন মুখর হয়ে থাকত নানা ভজনের সুরে, ধূপধূনোর গন্ধে। তারায় ভরা নীল আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে সহসা এক মায়াময়, অপার্থিব জগতে ঢুকে পড়তাম আমরা দুজনে। আবার ধূপধূনোর গন্ধের সঙ্গে, হাওয়ায় ভেসে এসে নাকের ওপর আছড়ে পড়ত গাওয়া ঘিয়ে ভাজা পুরি, তরকারি আর হালুয়ার সুগন্ধ। তাঁবুতে তাঁবুতে কাঠ কয়লার আগুন জ্বেলে রান্নাবান্না করতেন শিষ্যরা। রান্নার গন্ধ অনায়াসে গিয়ে মিশত সাধুদের আখড়াগুলোর আধ্যাত্মিক পরিবেশে।

তা এমনি এক মাঘমেলার অবসরে নীমকরোলী বাবা ইলাহাবাদ এসেছিলেন। উঠে ছিলেন ইলাহাবাদ বিশ্ব বিদ্যালয়ের এক অ্যাকাডেমিকের বাড়ি।

উত্তরপ্রদেশ জুড়ে তখন নীমকরোলী বাবার খুব হাঁকডাক। আমার বাবা ওঁর কথায় সতত পঞ্চমুখ। তাঁর কাছ থেকেই শুনতাম, নীমকরোলী বাবা নাকি বাক্সিদ্ধ। অর্থাৎ যখন যাকে যা বলে দিতেন, সব ফলে যেত। বাবা বলতেন সাধুবাবার আশীর্বাদে অনেকে যেমন সাফল্যের শীর্ষে পৌঁচেছে, তেমনি আবার তাঁর বিরাগ-ভাজন হয়ে কেউ কেউ নাকি সুখ-সাফল্য-সমৃদ্ধির তুঙ্গ থেকে আছাড় খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়েছে শক্ত মাটিতে।

একদিন সন্ধ্যাবেলা বাবাকে বাইরে যাবার জন্য তৈরি হতে দেখে জিজ্ঞেস করলাম তিনি কোথায় যাচ্ছেন।

বাবা বললেন, "নীমকরোলী বাবা এসেছেন মকর সংক্রান্তিতে গঙ্গাস্নান করবেন বলে। নেমেছেন অ্যালেনগঞ্জে প্রফেসর ব্যানার্জীর বাড়িতে। সেখানেই যাচ্ছি। তুইও আসবি নাকি সাধুবাবাকে দর্শন করতে"?

সেই বছর আমি বারো ক্লাস পাশ করে ইউনিভার্সিটিতে ঢুকেছি। সাধু-সঙ্গ থেকে সরে এসে তখন মন আমার বিচরণ করতে আরম্ভ করেছে জীবনের নিছক পার্থিব প্রলোভন-সিক্ত আনাচে কানাচে।

ভেবেচিন্তে বললাম, "নাঃ। শুনেছি নীমকরোলী বাবার চারিদিকে বহু মানুষের ভিড়। তার মধ্যে আমি . . . একেবারে অবান্তর"।

- তা অবশ্য ঠিক", বাবা বললেন, "ওঁর ইলাহাবাদে আসার সংবাদ শুনে নাকি আই.জি. পুলিশ থেকে শুরু করে, ইউ.পী. গভর্নর, ডায়রেক্টর অফ্ এডুকেশন – মায় স্বয়ং ভারতের প্রধানমন্ত্রীর নিজস্ব সচিব – অনেকেই প্রফেসর সাহেবের বাড়িতে আনাগোনা করছেন। সকলেই তাঁর আশীর্ব্বাদ চান"।

শুনেটুনে সন্ত্রস্ত হয়ে আমি আবার বললাম, "তাহলে তো আমি আরোই যাব না"।

অথচ একটু পরেই বাবা যখন বেরিয়ে যাচ্ছেন, হঠাৎ বলে ফেললাম, "নীমকরোলী বাবাকে জিজ্ঞেস কোরো না যদি আমাদের বাড়িতে একবার আসেন"।

এক মিনিট হাঁ করে আমার দিকে চেয়ে থেকে "আচ্ছা" বলে বেরিয়ে গিয়েছিলেন বাবা।

পরদিনটা ছিল রবিবার। সকাল ন'টার মধ্যে হৈ চৈ পড়ে গিয়েছিল মুখার্জীদের বাড়িতে! অর্থাৎ আমাদের পিতা-পুত্রীর সংসারে!

আসলে আগের দিন সন্ধ্যায় আমার বাবা, ভি.আই.পি.-দের ভিড় ঠেলে, গিয়ে হাজির হতে পেরেছিলেন নীমকরোলী বাবার কাছাকাছি। তারপর সভয়ে, সলজ্জে এবং সসংকোচে মেয়ের আবেদনটি পেশ করেছিলেন তাঁর কাছে।

একটুক্ষণ নীরব থেকে নীমকরোলী বাবা নাকি বলেছিলেন, "ঠিক হ্যয়, চলেঙ্গে তুম্হারে ঘর। কল্ সবেরে"।

আজকালকার দিনে ভি.আই.পি.রা যেমন মোটর গাড়ির কন্‌ভয় নিয়ে ভ্রমণ করে থাকেন, অনেকটা সেই স্টাইলেই গোটা ছয়েক রিকশার কন্‌ভয় নিয়ে তিনি এসে উপস্থিত হয়েছিলেন আমাদের বাড়ির সামনে।

তারপর বাবার হাত ধরে অনেকগুলো সিঁড়ি অতিক্রম করে উঠে এসেছিলেন দোতলায়, আমাদের ফ্ল্যাটে।

মুহূর্ত্তের মধ্যে আমাদের ছোট্ট বসার ঘরে লোক পিলপিল করতে লাগল। রিক্সাওয়ালা, চৌকিদার, দারোয়ানদের পাশাপাশি এসে দাঁড়ালেন পাড়া-প্রতিবেশীরা। প্রত্যেকেই নীমকরোলী বাবার দর্শনোন্মুখ।

তিনি হনুমানভক্ত। তাই বজরঙ্গবলী হনুমানজির প্রিয় বেসনের লাড্ডুর ছোট্ট একটা ঠোঙা বাবা ধরিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর হাতে। বড় জোর আট-দশটা লাড্ডু ছিল সেই ঠোঙায়।

অন্ততঃ ঘন্টাখানেক তিনি ছিলেন আমাদের বাড়িতে। তার মধ্যে পঞ্চাশ-ষাটজন দর্শনার্থী এসে জুটেছিলেন আমাদের সেই বসার ঘরে। কিন্তু, আশ্চর্য, কি ভীষণ আশ্চর্য, সবার হাতে গোটা একটা করে লাড্ডু দিয়েও ছোট ঠোঙাটা খালি হল না! লাড্ডু ফুরিয়ে গেল না!

এরপর যে ক'দিন তিনি প্রফেসর সাহেবের বাড়ি ছিলেন, আমি রোজ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যেতাম। তিনি খুব আদর করে আমাকে কাছে বসিয়ে গল্প করতেন। আমিও শুদ্ধ ঘিয়ে ভাজা মটরশুটির কচুরি খেতে খেতে ওঁর অ্যাটেনশন উপভোগ করতাম।

এর কয়েক বছর পর আমি শুনেছিলাম যে নীমকরোলী বাবা এমনি ভাবেই তাঁর কিছু ভক্তদের মাঝে কমলালেবু বিতরণ করেছিলেন। ওঁর ব্যাগে মাত্র চার-পাঁচটা কমলালেবু থাকাসত্ত্বেও স্টক অফুরন্তই ছিল শেষ অবধি।

আরও শুনেছিলাম যে ভক্তদের মাঝে তিনি আর একটি নামেও

প্রচলিত – চমৎকারী বাবা। সূক্ষ্মদেহে নাকি তিনি প্রায়ই ঘুরে বেড়াতেন যত্রতত্র।

যাই হোক্, সেদিন সকালে আমাদের বাড়িতে সাধুবাবার আসার স্মৃতি আজও আমার মনে অক্ষয় হয়ে আছে।

মাথায় হাত রেখে আমাকে প্রভূত আশীর্ব্বাদ করেছিলেন তিনি। অতি অল্প সময়ের সেই সাক্ষাতে আমার প্রতি মায়া পড়ে গিয়েছিল তাঁর।

এই প্রসঙ্গে আর একটা গল্প না বলে থাকতে পারছি না। কয়েক বছর আগে ব্রজেশ পান্ডে নামে আমাদের এক বন্ধুর পরিচিত (এবং আমাদের সম্পূর্ণ অপরিচিত) মেলবোর্নে এসেছিল একটা কন্‌ফারেন্সে যোগ দিতে। ব্রজেশ আই.আই.টি. কানপুরে কম্প্যুটিং বিভাগে অধ্যাপক। এতটাই ঘরকুনো যে ভারতে অন্যত্র কোথাও সে কোনদিন বেড়াতে যায় নি। এমন কি নয়ী দিল্লীতেও সে পা রেখেছিল মাত্র কয়েকদিন আগে। কারণ সেখান থেকেই যে তাকে প্লেন ধরতে হয়েছিল!

এ হেন ব্রজেশ পান্ডেকে আমরা মেলবোর্ন এয়ারপোর্ট থেকে তুলে আমাদের বাড়ি নিয়ে এসেছিলাম এক বিকেলে।

সেদিনই চায়ের টেবিলে বসে কথায় কথায় ব্রজেশ বলল, ও নৈনীতালের ছেলে এবং একমাত্র কানপুর ছাড়া ভারতে

আর কোথাও কোনদিন বেড়াতে যায় নি।

আমি হঠাৎ বলে উঠলাম, নৈনীতাল! সেখানে তো নীমকরোলী বাবার আশ্রম আছে। তাই না? আর তাঁর প্রতিষ্ঠিত হনুমানজী কী গড়ি?

ব্রজেশ চম্‌কে আমার দিকে চেয়ে বলল, আপনি কি করে জানলেন নীমকরোলী বাবার নাম?

বললাম, তিনি ইলাহাবাদে একবার আমাদের বাড়ি এসেছিলেন। ওঁর স্নেহ আর সঙ্গও কয়েক দিন পেয়েছিলাম। সে অনেক বছর আগের কথা।

ব্রজেশ তখন ওর গলায় ঝুলন্ত সোনার চেনে সংলগ্ন মাঝারি সাইজের লকেটটা তুলে ধরল আমাদের সুমুখে। দেখলাম, নীমকরোলী বাবার ছবি!

ব্রজেশের পরিবারে ওর বাবা, মা, ভাইবোনেরা সকলে নীমকরোলী বাবার শিষ্য।

ব্রজেশেরও দেখলাম গভীর আস্থা তাঁর ওপর।

এরপর যে কটা দিন আমাদের সঙ্গে ছিল, আমার কত্তাটি ওকে সতত নিজের তত্ত্বাবধানে রেখেছিল। অজানা শহরে, অজ্ঞাত পথে ঘাটে যাতে ভ্রান্ত না হয়ে পড়ে সেই জন্য বাজারে, শপিং মলে – এমন কি ওর কন্‌ফারেন্স ভেন্যুতেও – আমার কত্তা পাশে থাকত ওর সারাক্ষণের পথচালক এবং ড্রাইভার হয়ে।

ভারতে ফিরে যাবার দিন তাই ব্রজেশ অভিভূত হয়ে আমাদের বলেছিল, মেলবোর্ন আসার আগে খুব চিন্তায় ছিল ও। অসহায় বোধ করেছিল এই ভেবে যে সম্পূর্ণ অপরিচিত এই শহরে কোনও বিপদে পড়ে যাবে না তো! নীমকরোলী বাবাকে স্মরণ করতে করতেই নাকি ওর সারাটা সময় কেটেছিল প্লেনে।

"ঔর দেখিয়ে বাবা কা চমৎকার! য়ঁহা আতে হী আপ্‌সে মিলা দিয়া বাবাজী নে! ম্যায় বিল্‌কুল বেফিক্র হো গয়া"।

ব্রজেশের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে এখানে এসে নীমকরোলী বাবার কৃপাতেই আমাদের সঙ্গে ওর দেখা হয়ে গিয়েছিল। তারপর থেকে ওকে আর কিছু ভাবতেই হয় নি। আমাদের ছত্রছায়ায় থেকে এক্কেবারে নির্ভাবনায়, নিশ্চিন্তে কেটে গিয়েছিল ওর কয়েকটা দিন।

ব্রজেশের অনড় আস্থা দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। আমারও বিশ্বাস, পরবর্ত্তীকালে নীমকরোলী বাবার আশীর্ব্বাদ আমাকে জীবনের অসমতল পথে এগিয়ে চলতে সাহায্য করেছে।

****

এ জীবন ভালোবেসে

নির্মাল্য কুমার মুখোপাধ্যায়

একটাই জীবন। এই জীবন নিয়ে আমি কী করব?

হেন মানুষ নেই যার মনে এই প্রশ্ন একবার না একবার, চেতনে বা অবচেতনে, স্বপনে বা জাগরণে উঠে এসে ধাক্কা না মেরেছে। এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে খুঁজতে আজ সভ্যতা এই অবধি এসেছে — ভাবনার কিন্তু সঠিক কোন ধ্রুব, কোন চূড়ান্ত, সর্বজনগ্রাহ্য উত্তর মেলেনি।

কারও কাছে পার্থিব সুখ শেষ কথা। গাড়ি বাড়ি ভাল রোজগার সংসার ছেলে মেয়ে – তাঁদের ভাল শিক্ষা ভাল পেশা আবার ভাল রোজগার – এই এক বৃত্ত। এই বৃত্তকে সম্পূর্ণ করা, পরম্পরায় আবর্তিত করাই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য।

এই দলের সংখ্যাও বেশ ভারি।

সমস্যা হল, এঁরা মাঝে মাঝে, কেন কে জানে, ভেতর থেকে বুক কাঁপিয়ে হঠাৎ নেমে আসা দীর্ঘশ্বাসের দিকে তাকিয়ে হতভম্ব হয়ে যান।

এই সেই অজানা জায়গা। এই সেই অচেনা অরণ্য। সবই তো পেলাম। 'প্রমোদে ঢালিয়া দিনু মন, তবু কেন, কেন কাঁদে রে-?'

কেন এতো একা লাগা! কেন সব ফাঁকা ফাঁকা! কেন সবই বৃথা মনে হয়? কেউ নেই কেন আজ আমার পাশে? সারাজীবন যাদের জন্য এতো কিছু করলাম, নিজেকে বঞ্চিত করলাম, তারা আজ সব দূরে। পাশে থেকেও কত দূরে!

তিনি শিল্পের কাছে, সাহিত্যের কাছে, সঙ্গীতের কাছে হয়তো কোনদিন সেইভাবে এগিয়ে আসবার অবকাশ পাননি। যদি আসতে পারতেন, ভালবাসতেন, তাহলে তাঁর এই দীর্ঘশ্বাস, পতনের আগেই, রূপান্তরিত হতো কাব্যে গানে নৃত্যে সঙ্গীতের রসাস্বাদনে।

সবাই স্রষ্টা নয়, হওয়ার প্রয়োজনও নেই। কিন্তু রসগ্রহণেও সেই অনির্বচনীয় আনন্দ। অমৃতের প্রতিটি বিন্দু মূল্যবান। জীবনদায়ী। শিল্প সাহিত্য হল মানুষের সেই বন্ধু, যে তাঁকে কোনদিন ফেরাবে না, কোনদিন বলবে না – আয়াম বিজি, সরি।

বরং সে একলা নিদ্রাহীন রাতে, অন্ধকারে পাশে এসে বসবে। কাঁধে হাত রাখবে — কোন অভিযোগ নেই তার। সে এসেছে শুশ্রূষা করতে, শান্তি দিতে। পাশে থাকতে।

মানুষ তাঁর জীবনের সমস্ত অনুভব দিয়ে তিল তিল করে গড়ে তুলেছে সৃজনশীলতার এই বিপুল সম্পদ। তাই আমরা যখন, যে অনুভবেই পড়িনা কেন, রাগ দুঃখ হাসি কান্না মান অভিমান, সব কিছু নিয়ে অসামান্য সব সৃষ্টি, জমা করা আছে মানব জাতির এই অপূর্ব ভাণ্ডারে। সেখানে নানা ভাষায় ছন্দে গানে ধরা আছে সেই সব অনুভূতিকে। রূপান্তরিত করা হয়েছে আনন্দের বার্তায়। সে শুধু অপেক্ষায় আছে আরেকজন মানুষ এসে কখন তাঁর দরজায় একবার কড়া নাড়বে।

আধ্যাত্মিক চেতনা মানুষের সবচেয়ে বড় আবিষ্কার। এই আবিষ্কার কিছু মহামানবের সারাজীবনের রক্তক্ষরণের ভেতর দিয়ে তাঁদের অনুভবে এসেছে। তাঁরা সেই অনুভব আমাদের ভেতর ছড়িয়ে দিয়েছেন। সেই অনুভব থেকে শিষ্যর অদর্শনে হাউ হাউ করে কেঁদে ওঠেন তারই গুরুদেব, সেই অনুভব থেকে লেখা হয় অজস্র গান, কবিতা, গদ্য, স্তোত্র। লেখা হয় – প্রেম, পূজা, প্রকৃতির

মত মহান সব কবিতা — লেখা হয় বিশ্বের সঙ্গে কুটুম্বিতা স্থাপনের কথা। গাওয়া হয় ভজন, শাস্ত্রীয় সঙ্গীত। আঁকা হয়, তৈরি হয় ক্রুশবিদ্ধ প্রভুর মূর্তি — যাতে করে এক মুহূর্তের জন্যেও কেউ যেন না ভোলে যে কী বিপুল যন্ত্রণা পেয়েও এই মানুষটা বলে যেতে পারেন — এঁরা জানে না এঁরা কী করছে - প্রভু তুমি এঁদের ক্ষমা কর।

আমি যে একা নই, সারা বিশ্বের সঙ্গে নিবিড় ভাবে সম্পৃক্ত, এই কথা অনুভব করিয়ে দেয় আধ্যাত্মিকতা। বলে যায়, জীবন একটা কিন্তু একটা নয় – শত সহস্র প্রাণীর ভেতর, হাজার হাজার গ্রহ তারার ভেতর, লক্ষ লক্ষ নীহারিকার ভেতর, অচেনা অজানা সব গ্যালাক্সির ভেতর যতদূর এই অসীমে আমার প্রাণ যায় — ততদূর বিস্তৃত এই মহাজীবনের মগ্ন- চেতনা।

****

সম্পর্ক
- তিনটে অনু গল্প

স্বাতী মিত্র

- গল্প ১ -

রজতশুভ্র শোয়া অবস্থাতেই ঘাড়টা সামান্য ঘুরিয়ে দেখলেন রীনা এখনো ঘুমিয়ে আছে। কিছুক্ষণ সময় নিয়ে সাবধানে খাট থেকে নেমে শোবার ঘর লাগোয়া ব্যালকনিতে গিয়ে যেই আস্তে করে দরজা বন্ধ করতে যাবেন, কানের পাশ দিয়ে খবরের কাগজটা উড়ে সজোরে শোবার ঘরের মেঝেতে গিয়ে পড়ল। কাগজ দেবার ছেলেটিকে সত্যি বাহবা দিতে হয়। কি নিশানা! কিন্তু বেশী কিছু ভাবার আগেই রীনার ঘুম জড়ানো বিরক্তি মাখানো আওয়াজ শুনে বুঝলেন শুরু হল আজকের দিন, আজকের কথোপকথন চলবে সকাল থেকে দুপুর হয়ে রাত্রি অবধি।

ঘরে ঢুকেই শুনলেন রীনা গজগজ করছে।

"কাল সারাটা রাত একটু ঘুমাতে পারলাম না একজনের নাক ডাকার আওয়াজে। যা কপাল আমার - দিনভর কাজ করো আর রাতে বাবুর নাক ডাকা শোনো। সকালে যেই একটু চোখ লাগবে তখনই খবরের কাগজ ড্রোন হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে ঘরে।

রজতবাবুও এতদিনে শিখে ফেলেছেন কোন কথার উত্তর কীভাবে দিতে হয়। তাই রীনার অভিযোগের বলটাকে তুলে তারই কোর্টে ফেললেন। --"আচ্ছা আমি নাক ডাকলাম? আমি ঘুমোলাম কখন যে নাক ডাকব? সারা রাত তো পুরো বিছানা হিলিয়ে তুমি এপাশ ওপাশ করলে আর তার সঙ্গে তোমার চুড়ির আওয়াজ। অত চুড়ি পরে শুতে যাও কেন?"

"যাও তো একদম বাজে বকবে না! কত যেন চুড়ি কিনে দিয়েছ যে হাত ভরা চুড়ি পড়ব আর এই বুড়ো বয়েসে তোমাকে জাগিয়ে রাখার জন্য চুড়ির আওয়াজ তুলব।

পড়ে তো আছি খালি শাঁখা আর বাঁধানো পলা। তাও তো পলাটা মেয়ে দিয়েছিল বলে!"

"তুমি মিছে কথা বোলো না! তোমাকে আমি গয়না কিনে দিই না?! গত মাসেই তো কানের দুল কিনলে, কিনা ঊনচল্লিশতম বিবাহবাষির্কী! কখনো শুনেছ লোকে ঊনচল্লিশতম বিবাহবাষির্কী পালন করে? কিন্তু তুমি তো তুমিই। সব সময়ে সবার থেকে আলাদা আর তাইতো তোমার নাক ডাকা বুড়ো এখনও তোমার সব ফরমাইশ পুরো করে চলেছে। Always at your service Madam."

"আহা কত সোহাগ রে! শোনো কাল রাতে না ঘুমিয়ে আমার মাথা এমনিতেই ধরে আছে, তুমি আর বকবক করে আমাকে অসুস্থ করে দিও না, তাহলে কিন্ত রান্না টান্না করতে পারব না, দুপুরে না খেয়ে থাকতে হবে। আর শোনো সকালের চাটা আজকে তুমি বানাবে গো? কতদিন তোমার বানানো চা খাইনি!"

অগত্যা চা বানাতে গিয়ে রজতবাবু বুঝলেন প্রথম রাউন্ডে রীনা পয়েন্ট পেলেন । সারাদিন বাকী আছে। তাঁকে আরও সতর্ক হতে হবে।

সকাল গড়িয়ে দুপুর হল।

রান্না ঘর থেকে রীনাদেবী আওয়াজ তুলে বললেন "তোমাকে কতবার বলেছি ছোটো মাছ আনবে না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাছ পরিষ্কার কর তারপর রান্না কর। এখন ফোলা হাঁটু নিয়ে লেংচে মড়ি। বাবুর আর কি খেয়ে দেয়ে ঢেঁকুড় তুলতে তুলতে দিবানিদ্রা দেবেন আর আমি হাঁটুর ব্যথায় কোঁকাব।"

দরদী গলায় রজতবাবু বললেন "আহা আগেই বলতে পারতে তাহলে তোমাকে সাহায্য করতে পারতাম। চল তুমি একটু বসো তো দেখি, আমি তোমার হাঁটুতে ব্যাথার মলমটা লাগিয়ে দি।" মলম লাগাতে লাগাতে রজতবাবু আবেগের বশে বলতে শুরু করলেন – "যাই বল মৌরলা মাছটা তুমি খুব ভাল বানাও। ছোটোবেলায় মা ও বানাত। তুমি তো বেশ তেল-টেল দিয়ে স্বাদ আনো কিন্ত মা যে কি করে করতো কম তেলে কম মশলায় অত ভাল রান্না!"

রীনা ককিয়ে উঠে বললেন – "হে ভগবান! এত দিনে জানলাম শত্রুর সঙ্গে ঘর করছি। পায়ে মলম লাগিয়ে মনে ছুঁড়ি বিঁধছে। শোনো আমি এখন ব্যাথার বড়ি খেয়ে শোবো। বিকেলের চা টা তুমি বানিয়ে নিও আর পারলে এক কাপ বেশী বানিয়ে ফ্লাস্কে রেখে দিও। ঠান্ডা পড়ছে, সন্ধে বেলায় অনেক সময় আরো এক কাপ চা খেলে ভালই লাগে, কী বলো?"

সংসারে পোড় খাওয়া রজতশুভ্র বুঝলেন দ্বিতীয় পয়েন্টটাও রীনাই পেল। এবার কিছু একটা করতেই হবে, না হলে যে আজকে গোহারান হেরে যাবেন!

রাতে খাওয়া দাওয়া হয়ে যাবার পর রীনাদেবীকে জিজ্ঞেস করলেন – "কি গো আমি কী অন্য ঘরে গিয়ে শোবো? কাল তোমার ঘুম হয়নি। আজ অন্তত ঘুমাতে পারবে।"

কিন্ত তাঁকে একদমই আমল না দিয়ে রীনাদেবী বলে উঠলেন - "বাজে বোকোনা তো, রাত্রি বেলায় হাঁপানি হলে কে দেখবে? আমি যদি পাশের ঘর থেকে শুনতে না পাই? নিজে তো ওষুধও নিতে পারোনা। বুড়ো বয়েসে আর বাহাদুরী দেখিয়ে অন্য ঘরে শুতে হবে না!"

আজকের খেলাতে জিত অবশ্যম্ভাবী ভেবে রজতশুভ্র হাসতে হাসতে বললেন – "সত্যি কথা মানো না কেন রীনা - কি আমাকে ছাড়া ঘুমাতে পারবে না! দেখ ছেলেমেয়েরা তো দূরে চলে গেছে। আছি আমি আর তুমি। একটা যদি নাতি নাতনী থাকতো তাও হয়তো সময়টা কাটতো। কিন্তু ওরা তো ব্যস্ত ওদের ক্যরিয়ার নিয়ে। আমি তো তাও হাটবাজার করতে বাইরে যাই, কম্পিউটার করি, কিন্তু তুমি? তাই সারাদিন তোমার কথা, তোমার মান অভিমান, রাতে তোমার চুড়ির আওয়াজ,

এসব শুনতে পেলেই বুঝি যে বেঁচে আছি। দুজনে আছি বলেই এসব আছে -না হলে নয়।"

রীনাদেবী ছলছল চোখে বললেন - আমি কি তা জানিনা! রাতে কখনো যদি নাক না ডাকো আমি তোমার নাকের সামনে হাত রেখে দেখি শ্বাস পড়ছে কিনা। আমার যে কি জ্বালা তুমি কি বুঝবে? সব পুরুষ মানুষই অবুঝ হয়। সারাদিন কাজের পরে কোথায় দুটো ভাল কথা শুনবো তা না দিলে তো কাঁদিয়ে।"

রীনাদেবীর জলভরা চোখের দিকে তাকিয়ে রজতশুভ্র আবার হার মানলেন। কিন্তু এই হারে তার কোনো গ্লানি নেই।

* * *

- গল্প ২ -

রাহুল যখন গুনগুন করে গাইছিল "ফিরে এস অনুরাধা ভেঙে দিয়ে সব বাঁধা" তখন আসলে সে ভাবছিল মিতার কথা। যে মিতাকে সে জানত ১৪/১৫ বছর আগে, যে মিতা বছর পাঁচেক আগে ডালাসে ঘর বেঁধেছে সহকর্মী পাঞ্জাব-তনয় রীক এর সঙ্গে কিন্তু গত ছয় মাস ধরে রাহুলের সঙ্গে রীতিমত যোগাযোগ রেখে চলেছে। কারন just friendship অথবা অন্য কিছু।

রাহুলের স্ত্রী অনুরাধা তখন রান্নাঘরে রুটি বানাতে ব্যস্ত।

সেখান থেকে সে সামান্য উঁচু আওয়াজে বলল – "আমি তো এখানেই তাহলে কাকে ফিরে আসতে বলছ - old crush নাকি নতুন কেউ? You are really disgusting Rahul!"

সেই সময় ডালাসে রবিবারের সকালে রীক কফির কাপটা মিতার হাতে দিয়ে বলল – "অব তো খতম কর ইয়ার! আওর কিতনা পরেশান করেগী উসকো? বিচারা শাদীশুদা হ্যয়।"

মিতা মুচকী হেসে বলল "Are you jealous Rick? Let me have some fun. চ্যাট ই তো করছি তার আগে যাব না। তোর তো আমার জন্য সময় হয় না – আমারও তো গল্প করার লোক চাই!"

ক্যালেন্ডার মতে একদিন এগিয়ে থাকা রাহুল রাতে শুয়ে মনে মনে হিসেব করছিল তার গানের সিডিটা তৈরী করতে কত টাকা লাগবে আর কত টাকা মিতার কাছে সে চাইতে পারে। আজ ডিনারের সময় অনুরাধার সঙ্গে বেশ ভালমত ঝগড়া হয়েছে। অনুরাধা কিছুতেই মানতে চাইছিল না যে নিজের গায়কী প্রতিভা পৃথিবীর সামনে তুলে ধরার জন্য পুরোনো বান্ধবীর থেকে টাকা ধার নেওয়া মোটেই অযৌক্তিক নয়, যদিও সে জানে গানের সিডি না চললে ধার শোধ করা তার পক্ষে অসম্ভব। আর মিতা কি সত্যি টাকা ফেরত চাইবে? মনে হয় না। ও তো এখন ডলারে রোজগার করে। আজকাল রাহুলের মাঝে মধ্যে মনে হয় অনুরাধার সঙ্গে বোধহয় বেশী দিন থাকতে পারবে না। ও ওর ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের চাকরী নিয়েই খুশী। বোধহয় একটু অহংকারীও। বাংলা মাধ্যমের প্রাইমারী স্কুল শিক্ষক রাহুলের প্যাশন নিয়ে কোনো উৎসাহ নেই। রাহুল বুঝে পায় না ও কি তাহলে মিতার বদলে অনুরাধাকে পছন্দ করে ভুল করেছে? সম্পর্ক কি এভাবেই বদলে যায়?

মোটামুটি একই সময় ১২ ঘন্টা পিছিয়ে থাকা মিতা রিকের সঙ্গে long drive এ যেতে যেতে খিলখিলিয়ে হেসে বলল – "আমি শুধু অপেক্ষা করছি কখন রাহুল টাকা ধার চাইবে। আমি ভাল করেই জানি টাকা ধার চাইলেও কোনোদিন ও সেটা শোধ করবে না। যেদিন ও টাকার কথা তুলবে তখনই আমি ওকে মোক্ষম ঝাড়টা দিয়ে ব্লক করে দেবো! রাহুলের হুল ফোটানো গায়ে জ্বালা ধরানো কথা আমি এখনো ভুলিনি।"

মিতার এখনও মনে আছে যখন ও মরিয়া হয়ে বারবার রাহুলকে ফোন করে, দেখা করে, ওকে বিয়ে করার জন্য অনুরোধ করেছিল তখন রাহুল কীভাবে নির্মম হয়ে বলেছিল – "A clear rejection is better than a fake promise"। মিতা একা সব সামলেছে। রাহুলকে জানতেই দেয়নি কিছু কিন্তু এখন মিতা দেখাবে rejection কাকে বলে।

* * *

- গল্প ৩ -

রাকা চুপ করে বসে ভাবছিল ও কি কাজটা ঠিক করছে? মা বলেছে ও এখন বড় হচ্ছে। তাই কোনো কিছু করবার বা বলবার আগে পাঁচবার ভেবে নিতে, না হলে সারা জীবন পস্তাতে হবে। রাকা কি করবে? ও যে ভীষণ একা। মা বলে ও নাকি ঘরকুনো। কিন্তু রাকা কী করে মা কে বোঝাবে যে যতই নামকরা স্কুলে মা ওকে পাঠাক না কেন রাকা তো রাকাই থাকবে। গত সাত বছর থেকে ওরা এখানে আছে। বাড়িতে ওরা এখনো ডাল তরকারী খাওয়া ইন্ডিয়ান অথচ বাড়ির বাইরে ওকে আমেরিকান হতে যেতে হয়। রাকা যে পারে না নিজেকে বদলে নিতে। ফলে রাকা নিজেকে নিজের মধ্যে গুটিয়ে রাখে। এই গুটিয়ে থাকা রাকার বেস্ট ফ্রেন্ড তার ল্যাপটপ। তার তেরো বছরের জন্মদিনে মা ওকে গিফ্ট করেছেন। আর এই বন্ধু ল্যাপটপই তার বিপদ ডেকে এনেছে। সেদিন বাড়িতে বোর হচ্ছিল বলে রাকা তার ল্যাপটপে কিছু উল্টোপাল্টা সাইট সার্ফ করছিল। আগেও করেছে কিন্ত এবার সেটা ডিলিট করতে ভুলে গেছিল! পরে মা সেটা দেখতে পেয়ে যা কান্ড করল - শুধু যে রাকাকেই বকাবকি করল তা নয়, তার সৎবাবা রীককেও যা-তা বলে ঝাড়ল। আচ্ছা রীক এর কী দোষ? রীক রাকার সৎবাবা হলেও রাকাকে বেশ ভালবাসে। রাকা শুনেছে তার বাওলজিকাল বাবা রাকার ফাস্ট জন্মদিনের এক মাস আগেই তার মাকে ছেড়ে চলে যান। তার পর থেকে মা তাকে একা হাতে মানুষ করেছে। মা রাকাকে নিয়ে অনেক চেষ্টা করে ইউ এস এ এসে সেটল করে। রাকার মাসতুতো দিদি মৌমীদি একবার রাকাকে চুপিচুপি বলেছিল যে রাকার আসল বাবা নাকি তার মার ফাস্ট হাসব্যান্ড নয় আর সেই জন্যই তিনি মাকে ছেড়ে গিয়েছেন। সে সব নিয়ে অবশ্য রাকার কোনো মাথাব্যাথা নেই। সে, মা আর তার নতুন বাবা রীক খুব ভাল আছে। রীককে রাকা দেখছে গত পাঁচ বছর থেকে, যদিও মা ওঁকে বিয়ে করেছে চার বছর আগে। মা আর রীক একই অফিসে কাজ করত। রীক এরও আগে একটা বিয়ে হয়েছিল কিন্তু ও বলে সেটা ভীসা পাবার জন্য করেছিল। রাকা তো ভেবে অবাক হয় লোকেদের লাইফে কত কমপ্লিকেশন আর ওর লাইফ টা কি সুন্দর, কোনো প্রবলেম নেই! অবশ্য এখন মাঝে মাঝে মনে হয় লাইফে প্রবলেম না থাকাটাও একটা প্রবলেম। এই এখন যেমন হচ্ছে। স্কুল হলিডেতে যখন কোনো হলিডে অ্যাকটিভিটি থাকেনা তখন মা অথবা রীক পালা করে বাড়ি থেকে কাজ করার চেষ্টা করে। কিন্তু বাড়ী থাকলেও ওরা তো কাজই করে। আর রাকার তো সময় কাটতে চায় না এবং তখনই ও উল্টোপাল্টা কাজ করে ফেলে। আর তাই তো সেদিন মা বকার পরে মার ওপর রাগ করে মার মোবাইল থেকে না পড়া মেসেজ ডিলিট করতে গিয়েছিল। এই মেসেজ ডিলিট করার ব্যাপারটা ওর ক্লাসমেট ডোনা ওকে বলেছিল একবার। ডোনার বাবা যখন বেশী ড্রিংক্ করে বাড়িতে ঝামেলা করে তখন ডোনার মা বাবার মোবাইল কায়দা করে সরিয়ে নিয়ে মেসেজ পড়ে, ডিলিট করে আর বোধহয় আরও কিছু করে। কিন্ত রাকা যখন মার মোবাইলটা নিয়ে আনরেড মেসেজ দেখতে গেল দেখল কোনো এক রাহুল সেন এর থেকে তিনটে মেসেজ এসে পড়ে আছে, তার মধ্যে একটা আবার অডিও। ঐ মেসেজ গুলো পড়ে নিয়ে ডিলিট করার পরে রাকা কৌতুহলের বশে রাহুলের আগের মেসেজ গুলোও পরে ফেলল। আর তারপর ১৩ বছরের রাকা সোস্যাল নেটওয়ার্ক থেকে রাহুল সেন সম্বন্ধে খবর যোগার করার চেষ্টা করতে গিয়ে রাহুলের মা বাবার সন্ধান পেল। মাত্র তিন দিনের মধ্যে রাকা রাহুলের বাবা শ্রী রজতশুভ্র সেন এর পছন্দ অপছন্দ মোটামুটি সব জেনে ফেলল। দেখল রাকার মত তাঁরও পছন্দের রং সবুজ। ভাল লাগে পাহাড় আর জঙ্গল। ইস রাকার যদি একটা রজতের মত বন্ধু থাকত তাহলে কত ভাল হত! ভাবা মাত্র রজতকে রাকা একটা ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট দিয়ে এটাও লিখল রজতকে সে দাদু বলে ডাকতে পারে কিনা। রাকার মনে হয় একটা ইন্ডিয়ান দাদু হয়ত ওর মনের কথা বুঝতে পারবে। তার স্কুলের বন্ধু নীতীশ তো কত ওর দাদুর কথা বলে। ও এখন স্কুল

হলিডেতে দাদু-দীদার কাছে কলকাতায় আছে, কত ছবি পোস্ট করেছে। রাকার নিজের দাদু-দীদা তো কবে মারা গেছেন আর রীক এর মা বাবার সঙ্গে মার কথা তেমন হয়না। সবাই তো তাদের ইচ্ছে মত চলে তাহলে সে কেন একটা দাদু তার জন্য খুঁজে নিতে পারবে না? আর রাহুল যদি মার বন্ধু হয় তাহলে তো মা রাগ করবে না। কিন্ত রাহুল কি সত্যি এখনো মার বন্ধু? এই রে রাকা যে আবার কনফিউসড হয়ে যাচ্ছে। রজতশুভ্র কে লেখা মেসেজ আর ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট নিয়ে রাকা যখন মন স্থির করতে পারছে না সেই সময় মা মিতা দরজায় নক করেই ঝড়ের বেগে ঘরে প্রবেশ করে বেশ রাগী গলায় বললেন – "ডিড ইউ হ্যান্ডল মাই মোবাইল?" অজান্তেই রাকার আঙুল সেন্ড বাটন ক্লিক করে দিল।

****

পেরাইভেসি

তরুণ ভট্টাচার্য

ছেলেবেলায় আমাদের মফঃস্বল শহরে ডাকঘরের পিওনকে সবাই খুব কদর করত। কারণ তিনি সবার সুখ দুঃখের খবর পৌঁছে দিতেন এবং সবার হাঁড়ির খবর রাখতেন। তখন বেশিরভাগ লোকেই পোস্টকার্ডে চিঠি লিখত। আমাদের পিওনকাকু বিলি করার আগে চিঠিগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ে নিতেন। যার বাড়িতে ভাল খবরের চিঠি থাকত, সেখানে গিয়ে সদর্পে ঘোষণা করতেন – আজ মিষ্টি না খেয়ে যাচ্ছি না। খুশির খবরে (এই যেমন কারও নাতি হয়েছে বা কেউ পরীক্ষায় ভাল ফল করেছে বা কারো মামলায় জয়লাভ হয়েছে ইত্যাদি) অভিভূত হয়ে বাড়ির লোকেরা পিওনকাকুকে পেট ভরে জলখাবার খাওয়াত। কেউ কেউ আবার দু পাঁচ টাকা বকশিশ দিত। যারা নিরক্ষর ছিল, তারা পিওনকাকুকে দিয়েই চিঠি পড়াত। ভাগ্যিস ইংরাজিতে কেউ চিঠি লিখত না! কারণ পিওনকাকুর বিদ্যার দৌড় সীমিত ছিল। মাঝে মাঝে রাস্তা ঘাটে দেখা হলে পিওনকাকু আবার সেসব খবরের ওপর ভিত্তি করে সবার সুখ দুঃখের খোঁজ নিতেন।

তা সেই সব দিনগুলোতে পেরাইভেসি (আপনারা যাকে ইংরাজিতে privacy বলেন) কোথায় ছিল বলতে পারেন? আসলে প্রাইভেসি কথাটা তখন বাঙালী সমাজে আবিষ্কারই হয়নি।

চিঠির কথাই যখন শুরুতে মনে পড়ল, চিঠি তো এদেশে একটি অতি পেরাইভেট বস্তু। অন্যের চিঠি পরা একটি

অতি গর্হিত কাজ। স্বামী স্ত্রী কখনও একে অন্যের চিঠি খুলবে না, বাবা মা কখনও ছেলে মেয়ের চিঠি খুলে দেখতে পারবে না। ওদিকে আমাদের ছেলেবেলায় বাড়িতে মেয়েদের নামে বন্ধ খামে চিঠি এলে সবার আগে বাবা মার censor committee খুঁটিয়ে দেখে নিত প্রেমপত্র কিনা। তাই পাড়ায় দাদারা সবসময় লজেন্স বিস্কুটের ঘুষ দিয়ে ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের দিয়ে এই পেরাইভেট কাজটি সম্পন্ন করত। ছোটদের অসাবধানতা বা বোকামোর ফলে কখনও কখনও আবার ধরা পড়ে কেলেঙ্কারি হত। কয়েক বছর আগে মেলবোর্নে মঞ্চস্থ কাঞ্চনরঙ্গ নাটকটিতে এমনি একটি মজার পরিস্থিতি ছিল।

দেশে পারিবারিক সমস্যাগুলো – এই যেমন স্বামী স্ত্রীর মন কষাকষি, শাশুড়ি আর বউয়ের ঝগড়া, প্রতিবেশীর সঙ্গে খটমট – এগুলো পাড়ার লোকজনের সঙ্গে আলোচনা না করলে, তাদের উপদেশ, সমবেদনা না পেলে শান্তিই হত না। এগুলো যে একেবারে ব্যক্তিগত ব্যাপার এবং পাড়ার লোকেদের থেকে গোপন রাখা উচিৎ, সে চেতনাই তখন সৃষ্টি হয়নি। উত্তর কলকাতা – যেখানে পুরনো বাড়িগুলো একেবারে গায়ে গায়ে ঘেঁষা, সবার বাড়ির খবর এখনও পাড়ার লোকেদের নখদর্পণে। পুরনো কলকাতায় কারও বাড়ি খুঁজতে যান, বাড়ির নম্বর বললে খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। পাড়ার লোকেরা জিজ্ঞাসা করবে – তিনি কোথায় কাজ করেন? অর্থাৎ সবার পেশা ইত্যাদি সবাই জানে। এদিকে এদেশে আবার আপনি 'কোথায় কাজ করেন' প্রশ্নটি পেরাইভেট জগতে নাক গলানো।

মনে পড়ে মেয়েদের ফুলশয্যার রাতে আড়ি পাতা বা উঁকি মারার কথা? এই স্ত্রী আচারগুলো না হলে, বিয়েই জমত না। চিন্তা করে দেখুন বিদেশে কারও শোবার ঘরে আড়ি পাতার ফল কি হতে পারে। Eavesdropping এর জন্য মামলা অবধারিত।

বিদেশে privacy regulation এর এখন রমরমা। কোনও বড় প্রতিষ্ঠানে ফোন করুন – অমুক নম্বর টিপলে 'আমাদের privacy regulation এর বিশদ বিবরণ শুনতে পাবেন।' বাস্তবিকে কেউ এই privacy regulation ধৈর্য ধরে শোনে কিনা আমার সন্দেহ আছে। তবে এই ব্যবস্থা রাখতেই হবে – নিয়ম পালন করার জন্য।

অস্ট্রেলিয়ায় প্রথম এসে আমার বন্ধুপত্নী স্বামীর বাঙ্কের ATM card নিয়ে টাকা তুলতে যায়। কিছু একটা সমস্যা হওয়াতে ব্যাঙ্ক কর্মীর সাহায্য চাইতেই মহা বিপদ সৃষ্টি হয়। অন্যের কার্ড নিয়ে মহিলা টাকা তোলার চেষ্টা করছে – ব্যাঙ্ক ATM card টি কেড়ে নেয়, স্বামীকে ব্যাঙ্কে ডেকে পাঠায়, আরেকটু হলে পুলিশকেও খবর দেওয়া হচ্ছিল। মহিলা তো হতবাক – আরে স্বামীর কার্ড তো স্ত্রীরও। তাছাড়া স্বামী স্ত্রীর মধ্যে আবার গোপনীয়তা কি? একে অন্যের পিন নম্বর জানবে, পাসওয়ার্ড জানবে এটাই যে স্বাভাবিক সেটা এই উন্নত দেশের বাসিন্দারা মানতেই চায়না, বলুন?

এই privacy এখন এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে পরিচয়পত্র ছাড়া জীবন প্রায় অচল হতে চলেছে। পাসওয়ার্ড ও পিন শব্দ দুটি ভবিষ্যতের যে কোনও বাংলা অভিধানে এই নামেই অন্তর্ভুক্ত হতে বাধ্য। এই পাসওয়ার্ড / পিন একবার চুরি হয়ে গেলে চূড়ান্ত কেলেঙ্কারি অবধারিত। ব্যাংক থেকে টাকা হদিস তো নিমেষের মধ্যে সম্ভব। কিন্তু মাঝে মাঝে কিছু চমকদার ঘটনা মুখরোচক হয়ে ছড়িয়ে যায়। যেমন vodafone থেকে একবার সব গ্রাহকদের বিবরণ ফাঁস হয়ে যায়। অন্যদিকে একটি ওয়েবসাইট যেখানে বিবাহিত কিছু পুরুষ নারীসঙ্গ লাভের জন্য সদস্য হয়, তাদের পুরো বিবৃতি কেউ ফাঁস করে দেয়। তাতে কিছু বিবাহবিচ্ছেদ, পারিবারিক অশান্তি, প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মামলা বেশ কিছুদিন ধরে চলে। এই সব ওয়েবসাইটে গোপনীয়তা রক্ষার জন্য যেমন বেশ কিছু দক্ষ কর্মী নতুন নতুন পন্থার উদ্ভাবন করতে থাকে, তেমনি কিছু দুষ্টু (কিন্তু অতি বুদ্ধিমান) লোকেদের

কাজ হল কিভাবে এই ওয়েবসাইটে নিরাপত্তার প্রাচীর ভেঙ্গে প্রবেশ করা যায় তা বার করা। এই hacker রা কিন্তু কিছুটা গুপ্তচর বৃত্তিতেও লিপ্ত। আমেরিকা আর চিনের মধ্যে তো এই নিয়ে মাঝে মাঝেই দ্বন্দ বেঁধে যায়। কখনও দেখা যায় এক দেশ আরেক দেশের প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রীর সব কথোপকথন আড়ি পেতে শোনে। কারণ বোধ হয় প্রধানমন্ত্রী মাঝে মাঝে দেশের অতি পেরাইভেট কথা স্ত্রীকে বলে মনটা হালকা করেন।

মনে পড়ে গেল বাংলাদেশ থেকে আগত এক শরণার্থী সম্প্রতি ভিসার জন্য দরখাস্ত করলে তাকে দেশ থেকে কিছু জরুরী কাগজপত্র আনতে বলা হয়। ইমেলে সেই সব কাগজ তার বন্ধু দেশ থেকে পাঠায়। তার নিজের কম্পিউটার নেই বলে বেচারি ইমিগ্রেশন দপ্তরকে তার পাসওয়ার্ড ইত্যাদি চিঠি লিখে জানায়, যাতে তার ইমেল থেকে তারা কাগজপত্র সংগ্রহ করে নেয়। ইমিগ্রেশন তার ব্যাক্তিগত ইমেল খুলতে নারাজ, ওদিকে তার সাময়িক ভিসার দিন প্রায় শেষ হয়ে আসে। বেচারি কিছুতেই বুঝতে রাজি নয় যে এদেশে পেরাইভেসির কারণে অন্যের ইমেল খোলা গুরুতর অপরাধ।

আরেকবার দেশে ব্যাঙ্কে টাকা তুলতে গেলে, একজন কর্মীকে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করি আমার অ্যাকাউন্টে কত টাকা আছে বলবেন? তিনি আমাকে বসতে বলে হঠাৎ সজোরে ঘোষণা করলেন আপনার অ্যাকাউন্টে xxx টাকা আছে! স্থানীয় লোকেরা আমার দিকে ফিরেও তাকালো না, কিন্তু আমি খুবই অপ্রস্তুত হয়ে গেলাম। বুঝলাম দেশে এখনও পেরাইভেসির শিষ্টাচার প্রবর্তন হয়নি।

পেরাইভেসির আরেক চরম প্রতিফলন দেখতে পাই চিকিৎসা সংক্রান্ত ব্যাপারে। চিকিৎসার নথিপত্র হচ্ছে অতি গোপনীয় তথ্য। একে অনেকে স্বেচ্ছায় না জানালে, শারীরিক অসুস্থতার বিশদ বিবরণ জিজ্ঞেস করা চরম অভদ্রতা। রোগীর অনুমতি ছাড়া হাসপাতালে ফোন করে কোনও আত্মীয় বন্ধুর শারীরিক অবস্থার খোঁজ নেওয়ার চেষ্টা করুন – নার্সরা কিছুতেই জানাবেনা। রোগীর অনুমতি ছাড়া দ্বিতীয় ব্যাক্তি ডাক্তারের চেম্বারে রোগীকে দেখা কালীন উপস্থিত থাকতেই পারবে না। আমাদের কারখানার এক কর্মীকে দুর্ঘটনায় আহত হওয়ায়, তড়িঘড়ি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কিন্তু কর্মীর খোঁজখবর পাওয়া খুব কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। কারণ রোগীর অনুমতি ছাড়া আমাদের খবর দেওয়া হবে না – ওদিকে কর্মীটি চায়না কর্মক্ষেত্রে কাউকে কিছু জানাতে। জানিনা দেশে আজকাল এ নিয়ে গোপনীয়তা রক্ষা করা হয় কিনা।

সম্প্রতি দেশ পত্রিকাটিতে পড়লাম, আজকাল দেশেও কিশোর কিশোরীরা চায়না যে অভিভাবকেরা তাদের

মোবাইল ফোনে হাত দিক বা ঘরের ছড়ানো ছেটানো জিনিস হাতড়ে দেখুক। লেখক মন্তব্য করেছেন যে আমাদের ছেলেবেলায় একটি টেবিল বা একটি ড্রয়ার (তাও তালা দেওয়া নয়) ছিল আমাদের একমাত্র পেরাইভেট সম্পত্তি। ছেলে মেয়ে চাকরি পেলে পরিবারের সবাই সদর্পে তাদের মাইনের পরিমাণ সবাইকে জানিয়ে বেড়াতো। আজকাল এ ভাবাই যায় না।

যে ভাবে বিদেশে পেরাইভেসির চাপ বেড়েই চলেছে, ভয় হয় ভবিষ্যতে কেউ আর আমাদের আসল নাম ধরে ডাকবে না। সবাই একে অন্যকে ছদ্মনাম ধরে ডাকবে – পেরাইভেসি রক্ষা করতে হবে যে। আর পোস্টকার্ডে চিঠি? সে তো ইমেল আর হোয়াটসঅ্যাপের দৌলতে কবেই উঠে গেছে। ভাগ্যিস সেই পিওনকাকু আর বেঁচে নেই। নইলে দুঃখে হার্টফেল করতেন।

****

অবশেষে অনিমেষের...

দিলরুবা শাহানা

মাত্র ত্রিশ মিনিটে কলকাতায় পৌঁছে বিস্মিত জোহরা চৌধুরী ওরফে জারা। এতো কাছে কলকাতা! জোহরা ভেবে কুল পেলনা কেন তার ষাট ষাটটি বছর লাগলো এই মাটিতে পা রাখতে? এই তার পিতৃভূমি, এরই মাটির তলায় কোনও এক জায়গায় চিরঘুমে শুয়ে আছে তার পিতা। জায়গাটার হদিশ সে জানে না। জানার কথাও নয়, তখন অনেক ছোট ছিল সে। তারপর তো ভাল করে বুঝবার বয়স হতে না হতেই ভিটেমাটি ছেড়ে ছিন্নমূল মানুষে পরিণত হওয়া। শুরু হল পালানোর পালা। এই মাটির প্রতি, এর মানুষের প্রতি রয়েছে তার অভিমান, অনুযোগ।

এবারও নিজে যেচে এখানে সে আসেনি। ওরা ডেকে এনেছে নাতনীসহ জোহরা চৌধুরীকে। ওরা কারা? ওরা হল কোন এক ভারত-জার্মান সংস্থা। ভিটে থেকে বিতাড়িতদের তৃতীয় প্রজন্মকে পূর্বপুরুষের ভিটে চিহ্নিত করতে, ইতিহাস জানতে উদ্বুদ্ধ করার এক প্রয়াস অথবা কোন এক প্রকল্প হাতে নিয়েছে সংস্থাটি। তারই জের ধরে জোহরার প্রকৌশলী নাতনী তাহিরা দাওয়াত পেয়েছে কলকাতা ভ্রমণের। ওরা যখন জানলো তাহিরার পিতামহী জোহরা চৌধুরী যিনি আসলে কোলকাত্তাইয়া এবং এখনও বেঁচে আছেন, তখন উৎসাহ তাদের উপছে পড়লো। তাকেও প্রায় ধরে বেঁধে নিয়ে এসেছে তারা।

এখানে আসার আগেই তার ইন্টারভিউ নিয়েছে ওরা। সংগঠকরা নিজেরা জোহরা স্মৃতিশক্তি দেখে অবাক! কলকাতায় কোন রাস্তায় তার বাবার ছোট্ট দোতলা বাড়ী ছিল ঠিকানাসহ সে বাড়ী তার মনে এখনও গেঁথে আছে। প্রকল্প সংগঠকরা খোঁজ নিয়ে এর মাঝেই জেনেছে ওই দোতলা এখনও আছে তবে এখন সেটি তিনতলা হয়েছে। জোহরার বাবা মাহমুদ চৌধুরী ও একই পাড়ার পরিতোষ চৌধুরী দু'জনে চৌধুরী এন্ড চৌধুরী নামে ব্যবসার মালিক ছিলেন। ব্যবসা কিসের তা জোহরা বা জারা জানতেন না। তবে বসবাসের পাকা দালানকোঠা দুই চৌধুরীরই ছিল এটা তার খুব মনে আছে।

জারার বাবা ছেচল্লিশ কি সাতচল্লিশ সালে মারা যান। চারপাশে আতঙ্কময় অস্থিরতা, এমন পরিবেশে জীবন অনিশ্চিত। অসহনীয় পরিস্থিতির চাপে রাস্তায় পড়ে আচমকা মৃত্যু। মরদেহ অপরিচিত কয়েকজন হৃদয়বান লোক বাড়ী নিয়ে এসেছিল। নিকটজন কেউ ছিল না ওদের। তারপরও মা তাকে নিয়ে নিজস্ব এই বাড়ীতে টিকে থাকতে চেষ্টা করেছেন। পরিতোষকাকা ব্যবসার লাভের হিসসা দিয়ে যাচ্ছিলেন। পড়শীরাও সহানুভূতির চোখে দেখছিলেন জারা ও তার বিধবা তরুণী মাকে। সময় গড়ালো সজল চোখের সহানুভূতিও শুকিয়ে গেলো। পরিচিতরা ধীরে ধীরে অপরিচিত হয়ে উঠলেন। চারদিকে কিসের যেন ছায়া। কারা যেন বাড়ীটাকে হস্তগত করার চেষ্টায় মেতে আছে।

এমনি সময়ে এক রাতের অন্ধকারে পরিতোষবাবু তার কিশোর ছেলে অনিমেষকে নিয়ে হাজির। ফিসফিস করে বললেন - বৌদি পালাতে হবে এক্ষুণি!

কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে জারার মা জানতে চাইলেন - কোথায়?

- আপাততঃ বনগাও বা পেটরাপোল। যশোর সীমান্ত কাছে। সুযোগ সুবিধামত ওপারে চলে যেতে পারবেন।

কান্নারুদ্ধ গলায় জারার মা বলেছিলেন - কার কাছে যাব? ওখানেতো কাউকে চিনিনা দাদা!

- চিনতে হবেনা। আমার পিসীর বাড়ী যাবেন। এই নিন অনিমেষের মা দিয়েছে শাঁখা ও সিঁদুর। হাতে পরে নিন, সিঁথিতে সিঁদুর ঘষে নিন। প্রাণ বাঁচাতে ইচ্ছা নাহলেও অনেক কিছু করতে হয় বৌদি।

সেই ঘুটঘুটে অন্ধকার রাতে ঘুমন্ত বালিকা জারাকে কিশোর অনিমেষ পাঁজাকোলে নিয়ে রামচাঁদ ঘোষ লেন ছাড়িয়ে বড় রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা গাড়ীতে তুললো। পরিতোষবাবু ও জারার মা দুই হাতে যতটুকু সংসার ধরে তা নিয়ে গাড়ীর কাছে আসলেন। তখন জেগে উঠে ভীত জারা যেই চিৎকার করে উঠতে যাবে ওর ঠোঁটে আলগোছে আঙ্গুল রেখে কানের কাছে মুখ নিয়ে অনিমেষ বললো - চুপ চুপ জারা! ভয় নেই। ওইতো কাকীমা উঠছে গাড়ীতে। এখানে বিপদ, মহা বিপদ রে।

পরিতোষবাবু জারার মায়ের হাতে বড়সড় এক প্যাকেট দিয়ে বললেন - এতে টাকা আছে। লোকজনকে বলবো আপনি ব্যবসা বিক্রি করে চলে গেছেন। আপনার আরো প্রাপ্য আছে পরে একসময়ে দিয়ে দেব। আর একটা কথা বৌদি আমার পিসী জানেন আপনি কে তাও ওই শাঁখাসিঁদুর দু'টো পরে থাকবেন। আশপাশের সবাইতো ভাল না।

- আমরা তো...

কথা শেষ করতে পারলেন না জারার মা। পরিতোষবাবু বলে উঠলেন - অনিমেষ যাচ্ছে সঙ্গে। সময় নেই। রাত পোহাবার আগেই শহরের সীমানা ছাড়তে পারবেন। আপনার স্রষ্টাকে স্মরণ করুন।

শেষে ভদ্রলোকের গলাটা ধরে আসলো। তারপর শুরু যাত্রা। সে রাত এবং পরের দিনও কাটলো যানবাহন বদল করে করে রাস্তায়। পরদিন সন্ধ্যা নামার পর ওরা এক গ্রামে এসে পৌঁছাল। তারপরও অনেকটা পথ হাঁটতে হল। আসার পথে বোঝা কমাতে গিয়ে অনেক কিছু ফেলে দিতে হল। আকাশে ম্লান চাঁদ যখন দেখা দিল তখন ক্লান্ত শ্রান্ত ক্ষুধার্ত অবস্থায় এক আশ্রয়ে ঠাঁই মিললো। আধো আলো আধো অন্ধকারে টিনের ঘরের বারান্দায় সাদা থান পরা বয়স্ক এক নারীর দেখা মিললো। ওই মহিলা নির্লিপ্ত গলায় বললেন - এসো ঘরে।

তারপর নীচু গলায় বললেন - কেউ জানবে না তোমরা কারা, শুধু ঠাকুরঘর ও রান্নার জায়গায় যাবে না।

সেই রাতে গুড়মুড়ি আর পানি খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল ওরা। অনিমেষ পরদিনই ফিরে গিয়েছিল। যাওয়ার আগে অনিমেষ জারার মাকে বললো - কাকীমা ভয় পাবেন না এই ঠাম্মা আপনাদের ওপার যাওয়ার ব্যবস্থা করছে, শীগগীরই যাওয়া হবে।

জারার দুই কাঁধে হাত রেখে ঝাঁকুনি দিয়ে অনিমেষ বললো - ভালো থাকিস! আবার আসবো তোদের দেখতে।

ঘরের মাঝেই সারাদিন কাটতো জারার। কতদিন ওই ঠাম্মার বাড়ীতে ছিল আন্দাজ নেই। এর মাঝে দু-তিনবার অনিমেষ এসে দেখে গেছে ওদের। সে চা-পাতা, চিনি, বিস্কুট-কেক ও সাবান নিয়ে আসতো। গ্রামে এসব জিনিস সহজলভ্য নয়। জারারা কলকাতা শহরের মানুষ, তারা এসবে অভ্যস্ত। অনিমেষ আসলেই ওরা মা-মেয়ে স্বস্তি ফিরে পেতো। জারার সময় খুব ভাল কাটতো অনিমেষের সাথে সাপলুডো খেলে, গল্প শুনে। অনিমেষ ঠাম্মার চোখের আড়ালে জারার মায়ের হাতে একটি এনভেলপ গুঁজে দিয়ে যেতো।

একরাতে ঘুম ভেঙ্গে জারা শুনতে পেলো অনিমেষের ঠাম্মা খুব নীচু গলায় কিছু বলছেন। একটা কথা কানে আসতেই ছোট্ট বালিকা জারা লজ্জা পেল, সমস্ত শরীরমন এক অজানা আবেশে বিবশ হল। সাথে সাথে মায়ের উত্তর শুনে আনন্দ উধাও হল।

- না এ হয়না পিসিমা! অনিমেষ খুব ভাল ছেলে কিন্তু আমরা যে অন্য ধর্মের।

- বউ আমারও বুদ্ধিনাশ হয়েছে গো। তোমায় শাঁখাসিঁদুর পরা দেখে আমি ভুলেই গেছি তোমার আসল পরিচয়। যাক আগামী সপ্তাহেই তোমাদের ওপার যাওয়া হবে।

পরিতোষের চেনাজানা লোকেরা তোমার পিসতুতো নাকি মাসতুতো দাদার খোঁজ পেয়ে যোগাযোগ করেছে।

- আপনার মায়া মমতা ভুলব না পিসি।

- শোন বউ গয়নাগাটি সব নিয়ে যেওনা, আমার কাছে রেখে যেও। অনিমেষের বাবা পরে পাঠিয়ে দেবে। মেয়ের বিয়েতে কাজে লাগবে।

দু'তিনদিন পরই অনিমেষ এসেছিল। শেষবারের মতো তাদের দেখাসাক্ষাৎ। তখন ঠাট্টাচ্ছলে ঠাম্মা বলেছিলেন - অনিরে তোর বিয়ে প্রায় দিয়েই দিচ্ছিলাম, তবে পাত্রী কাছে থেকেও অনেক দূরের রে।

কথা বলতে বলতে জারার দিকে তাকিয়ে খুব হাসলেন।

সেবার যাওয়ার সময় অনিমেষ আর জারার কাঁধ ঝাকুনি দিয়ে বলল না কিছু।

আবারও এক রাতের অন্ধকারে ওদের যাত্রা শুরু। যাওয়ার আগে অনিমেষের দিদিমা জারার মায়ের ভারী কিছু গহনা নিজের কাছে রেখে দিলেন, প্রায় জোর করেই। নিরাপদে থাকবে এই আশ্বাস অবশ্য দিয়েছিলেন। টাকার খবর তার অজ্ঞাত ছিল। তারপর জীবন চললো আপন নিয়মে। ভালমন্দ দুইয়ের মাঝ দিয়েই গেছে। জারার মা মাঝে মাঝে অনিমেষের ঠাম্মাকে গহনা রেখে দেওয়ার কারণে গালমন্দ করতেন, আবার কখনো বা দু'হাত তুলে ওদের সবার জন্য দোয়া করতেন, মঙ্গল চাইতেন। বলতেন ওদের কারনেই মারাত্মক অসম্মান ও ক্ষতির হাত থেকে বেঁচে গেছেন।

জারা ভাল ছিলেন, ভাল আছেনও। বয়স কম বলে নতুন দেশে, নতুন অনেক কিছুর সাথে অভ্যস্ত হয়েছেন সহজে। সুন্দরী বলে তাড়াতাড়িই কিশোরী জারার ভাল বিয়ে হল। বনেদী, বিত্তশালী শুধু নয় বিদ্যাচর্চ্চাও ছিল ওই পরিবারে। জারা মানিয়ে নিয়ে চলেছে। মাকে কাছে রাখার রেওয়াজ ছিলনা। তাই তুতোভাইয়ের সংসারে তার অসংস্কৃত বউয়ের সাথে বসবাস করতে গিয়ে জারার মা অনেক কিছু সহ্য করেছেন। কথা থেকে খাদ্যাভ্যাস সবকিছুর জন্যই জারার মায়ের তকমা জুটেছিল 'কলকাইত্তা বিবি'।

এতো বছরের মাঝে একবারই বাপের দেশের জন্য মন ব্যাকুল হয়েছিল জারার। তখন মুক্তিযুদ্ধ। জারা নেত্রকোনায় পরিচিত একজনের গ্রামের বাড়ীতে সপরিবার আশ্রয় নিয়েছিলেন। ওই গ্রামের অনেক তরুণ মুক্তিযুদ্ধে গেল। ওদের মাঝে কালাম, শহীদ ও তাপস এরা ঢাকা শহরে কিসব গোপন আক্রমণ চালানোতে জড়িত ছিল। এদের বলা হতো গেরিলা যোদ্ধা। এই যোদ্ধারা মাঝে সাঝে গ্রামে আসতো। আধপেটা খাওয়া শীর্ণ, প্যাকাটি চেহারা, মলিন কাপড়চোপড়ে ওদের দেখা যেতো। তবে চোখে তখনও তাদের আগুন খেলে যেতো। যে এক আধদিন তারা গ্রামে থাকতো গ্রামের সবাই মিলে ওদের খুব আদরযত্ন করতো। জারাও তাদের মাঝে একজন। এরা কলকাতাও যেতো প্রশিক্ষণ ইত্যাদিতে। জারার খুব ইচ্ছে করতো ওদের কাছে বাপের দেশের গল্প শুনতে। গল্প বলার মতো সময় ও মন ওদের ছিলনা তখন।

আজ কলকাতা এসে নিজবাড়ীর সামনে দাড়িয়ে ওই ছেলেগুলোর মুখ মনে পড়লো। ওরা ঠিকানা নিয়েছিল তবে এসেছিল কিনা জানায়নি। কালাম অপারেশনে গিয়ে ধরা পড়েছিল, স্বাধীন দেশ আর দেখা হয়নি তার। বাড়ীটা দেখে জারা আশ্চর্য হলেন। জীর্ণশীর্ণ ছোটখাটো এক বাড়ী। নিজে ছোট ছিলেন বলেই কি তখন তার কাছে বাড়ীকে বড় মনে হতো? অনিমেষ চৌধুরীকে দেখে জারার মনে হল হায় ইনি কেন বড় হলেন, বুড়িয়ে গেলেন! কেন আগের মতো রইলেন না। জারার আসার কথা শুনে ওই বাড়ীর সামনেই অপেক্ষা করছিলেন অনিমেষ।

বাপের বাড়ী দেখে যতটা না স্মৃতিকাতর হলেন জারা অনিমেষকে দেখে তার চেয়ে বেশীই হলেন। শুকনো পাতলা দীর্ঘদেহী অনিমেষের মাথা ঢাকা সাদা চুলে আর কালো ফ্রেমের পুরু গ্লাসের ওপারে এখনো ঝকঝকে দুই চোখ। সাদাকালো ঘনচুলে সুখী সুখী গোলগাল চেহারার জারাকে দেখে বিস্মিত অনিমেষ পুরনো সেই ঢঙ্গে বলে উঠলেন - তা তু তু তুই মানে তুমি কবে এলে জারা?

- এইতো আসলাম তা তুই ছেড়ে তুমি বলা যে?

- এইরে একেবারে ওপারের মতো!

- মানে কি অনিমেষদা?

- এইতো এলাম বললিনা তো তাই।

- আজ কথা শুনাচ্ছো ভাষা ভুলে গেছি বলে। আর শোন ওপারের লোকেরা আমাদের বলতো আমরা নাকি হালুমহুলুম করে কথা বলি।

- কেন রে?

- ঠাট্টা করে বলতো খেলুম-গেলুম হালুম-হুলুম তাই ওদের মতো কথা বলা রপ্ত করেছি।

- ভারী অন্যায় ভারী অন্যায়!

তাহিরা বলে উঠলো - দাদু রবীঠাকুরের স্ত্রী মৃণালিনী যশোরের মেয়ে বলে কথার জন্য হেনস্তা সহ্য করেছেন, বুদ্ধিমতী তো তাই তিনমাস বোবা হয়ে থেকে ঠাকুরবাড়ীর কথাবলার কায়দা রপ্ত করে তবেই কথা বলতে শুরু করেছিলেন।

- তোর নাতনী দেখি অনেক জানে! তা তোরা ওপারেই শুধু চলে যাসনি, অজানা দেশে অনিকেত হয়ে গেলি যে?

কথাটা বুঝতে জারার একটু অসুবিধা হচ্ছে দেখে তাহিরা এগিয়ে এসে মর্মে বেঁধে এমন উত্তর দিল - শুনুন দাদু ওদের উন্মূলন করে ছেড়েছেন ওদের তো অনিকেত হওয়ারই কথা, নয় কি?

- জারা তোর নাতনী কি সাহিত্য পড়ুয়া?

- না অনিমেষদা ও কারিগরী পড়েছে।

- আচ্ছা এই বাড়ীর মালিক এখন কারা দাদু?

- জবরদখল করে কোনও এক মাড়োয়ারী আছে।

পরদিন জারাকে নাতনীসহ রেষ্টুরেন্টে খেতে ডাকলেন অনিমেষ। জারা বললেন - কাল বৌদির সাথে আলাপ করিয়ে দেবে অবশ্যই।

বিষণ্ণ হাসি মেশানো অনিমেষের উত্তর – থাকলে তো দেব।

জারার নাতনী নীচু গলায় বললো - তোমার মতোই অবস্থা, সঙ্গিনী বিদায় নিয়েছেন।

রেষ্টুরেন্টে গল্পও হল অনেক। অনিমেষ কখনো বিয়েই করেননি শুনে ওরা দু'জনে বিস্মিত ও ব্যথিত হল।

তাহিরা ঠাট্টা করে জানতে চাইলো - কার জন্য এই যোগী বেশ দাদু?

উত্তর না দিয়ে সাথের শান্তিনিকেতনী ঝোলা থেকে কারুকাজ করা কাঠের একটি বাক্স বের করে টেবিলে রাখতে রাখতে বললেন - জারার জন্য।

কথাটা শুনেই খুশী আর লজ্জায় মাখানো এক হাসি বাহাত্তুরে জারার মুখে খেলে গেল। তাহিরা মুগ্ধ বিস্ময়

নিয়ে বাক্সটির কারুকাজ দেখছিল আর ভাবছিল এতে নিশ্চয় স্মৃতিময় পত্রাবলী চুপ করে আছে। তাহিরার বিস্মিত হওয়া তখনও বাকী ছিল। ঢাকনা খুলে বাক্সটি জারার দিকে এগিয়ে দিলেন অনিমেষ। ভারী গহণাগুলো চিকচিক করছিলো। গহণা ঘটিত কোন গল্প তাহিরার জানা ছিল না, তাই বিস্ময়ে সে হতবাক।

আর অনিমেষের সব ভার যেন আজ লাঘব হল। জারার শুরু হল নতুন করে পুরনো সবকিছু মূল্যায়নের পালা।

****

ইউরোপে কয়েকদিন

লুৎফর রহমান খান

লন্ডনের সেন্ট প্যাংক্রাস স্টেশন থেকে গত সেপ্টেম্বরের এক সকালে আমরা ইউরোস্টারে চেপে রওয়ানা দিলাম ব্রাসেলস এর উদ্দেশ্যে। ততদিনে ব্রেক্সিট ভোটের ফলাফল জানা হয়ে গেছে। তবে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ছাড়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণের অনেক আগে থেকেই ইংরেজরা নিজেদের দেশকে কিছুটা স্বতন্ত্র ভাবতো। ইংল্যান্ডের রাস্তার গাড়িতে ড্রাইভার বসে ডান দিকে, আর ইউরোপের অন্য দেশে বাম দিকে। ইংল্যান্ড ছাড়ার আগে কাস্টমস এর বাধা পার হতে হলো, যা ফ্রান্স থেকে বেলজিয়াম বা হল্যান্ড যেতে প্রয়োজন হয়না।

ইউরোস্টারের কল্যাণে দ্রুত পৌঁছে গেলাম ব্রাসেলস ষ্টেশনে। বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলস শহরে তিনটি বড় স্টেশন: উত্তর ব্রাসেলস, মধ্য ব্রাসেলস এবং দক্ষিণ ব্রাসেলস। বেলজিয়ামের প্রধান ভাষা তিনটি — ডাচ (ফ্লেমিশ), ফরাসি ও ইংরেজী। সে কারণে স্টেশনের নাম থেকে শুরু করে রাস্তাঘাটের সাইন বোর্ডে তিনটি ভাষার ব্যবহার লক্ষণীয়।

ব্রাসেলসে যে হোটেল নিয়েছিলাম সেটি ট্রেন স্টেশনের কাছেই, হাটা পথ। ট্যুরিস্টরা ভিড় করে গ্র্যান্ড প্যালেসে ও তার আশে পাশে। সেখানে অনেকগুলি হোটেল আর রেস্তোরাঁ। আমাদের হোটেলটা ছোটো, দেয়ালগুলি সুন্দর ছবি আর মার্বেলের কারুকার্যে সাজানো। বিকেল থেকে জমজমাট হয়ে গেল রেস্তোরাঁগুলি, সব মহাদেশের লোকজন চোখে পড়লো। সাইকেলের আরোহী প্রচুর। তারা আবার মাথায় হেলমেট পরে না। ওরা গবেষণা করে দেখেছে বোধ হয় যে হেলমেটের উপকারিতা উল্লেখযোগ্য নয়। আমার পিএইচডির সুপারভাইজার অধ্যাপক ডার্ক ভ্যান আউধিউসডেন বেলজিয়ামের বাসিন্দা, রাত্রে তাঁর বাড়িতে গেলাম। অবসর নেবার আগে ডার্ক লুভেনের ক্যাথোলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতেন। তাঁর স্ত্রী লীভা এখনও সেখানে সঙ্গীত বিষয়ের শিক্ষক। লীভা এক সময় ব্যাংককে একটা স্কুলে পড়াতেন। আমার মেয়ে কাঁকনকে তাঁর বেশ মনে ছিলো। লুভেনে ওদের বাড়িতে অনেক স্মৃতিচারণ হলো।

পরদিন সকালে ট্রেনে করে বন্দর নগর অ্যান্টোয়ার্প পৌঁছালাম। হীরা ব্যবসায়ের জন্য শহরটি বিখ্যাত। ডার্ক আমাদেরকে ঘুরিয়ে দেখানোর জন্য অ্যান্টোয়ার্প এসেছিলেন, তাঁর সাথে আমি আর আমার নাতনি করবী গেলাম বেলজিয়ামের বিখ্যাত চিত্রশিল্পী পল রুবেন্স এর বাড়িতে, যা এখন একটি মিউজিয়াম। আমার স্ত্রী লুলু বাইরের কোনো খাবারই পছন্দ করেনা, শুধুমাত্র ভারতীয় বা বাংলাদেশি ছাড়া। তাই খুঁজেপেতে একটা ভারতীয় রেস্তোরাঁয় ঢুকলাম । কাউন্টারের পিছনে বাংলাদেশের একটা মানচিত্র দেখে বাংলায় আলাপ জমাতে গিয়ে আবিষ্কার করলাম যে ভাঙা ভাঙা সিলেটি বলতে পারলেও ওরা বাংলা তেমন জানেনা। অনর্গল ফরাসি, ডাচ আর ইংরেজী বলে, আর পাঁচজন বেলজিয়ামবাসীর মতো। অ্যান্টোয়ার্প স্টেশন থেকে ট্রেন নিলাম অ্যামস্টারডামের পথে। ঘন্টা খানেকের মধ্যেই পৌঁছে গেলাম ভ্যানগগের দেশে।

অ্যামস্টারডাম সেন্ট্রাল স্টেশনে নেমে বিস্ময়ে লক্ষ করলাম অগুনতি সাইকেল। হাজার খানেকেরও বেশি সাইকেল স্টেশনের আশে পাশে, গাড়ি রাখার ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। বাস-ট্রাম চলছে ঘন ঘন। সন্ধে বেলাটা আশে পাশে ঘুরে বেড়ালাম,ঘন বসতি, শুধু হাঁটতে গেলে সাইকেল দেখে চলতে হয়। পুরো শহরটা জলাশয়ে ভরা। অনেকগুলোতে নৌকা বিহারের ব্যবস্থা আছে। প্রচুর ট্যুরিস্ট আসে এ শহরে। একটা সুভেনীরের দোকানে ঢুকে দেখি মারিজুয়ানা বিক্রি হচ্ছে, আইনসংগত ভাবেই।

পরদিন সকাল সকাল ট্রাম ধরে গেলাম বিশ্ববিখ্যাত রাইখস মিউজিয়ামে। বিশালমিউজিয়াম, তেমন দেখাই হলোনা। কোনো কোনো পেইন্টিং এর সামনে ভিড় বেশি,যেমন রেম্ব্রান্ডটের নাইট ওয়াচ। চিত্রশিল্পের কিছুই বুঝিনা, তবু ভাল লাগলো। করবী ছবি আঁকতে পছন্দ করে, ও বেশ উপভোগ করছিলো। ভ্যানগগের মিউজিয়ামটিও কাছেই, তবে সেখানে যাওয়ার আর সময় হলোনা। দুপুরের পর সেন্ট্রাল স্টেশন থেকে ট্রেনে করে যাত্রা, এবারের গন্তব্য প্যারিস।

ইউরোপে অনেকগুলি রেল কোম্পানি আছে, যাদের ট্রেনগুলি দ্রুতগামী এবং আরামদায়ক ভ্রমণের উপযোগী। ইংল্যান্ডের ইউরোস্টার (Eurostar),হল্যান্ডের থালিস (Thalys), ফ্রান্সের TGV, জার্মানির ICE উল্লেখযোগ্য কোম্পানি । এসব ট্রেনের টিকেট যত আগে কেনা যাবে তত সস্তায় পাওয়া যাবে। আমাদের থালিস ট্রেনে ওঠার কথা দুপুরের পরপরই । সময়মতো স্টেশনে এসে জানলাম যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে ঐ ট্রেনটা যাচ্ছে না। ঘন্টা তিনেক পরে অ্যামস্টারডাম - প্যারিস রুটের আর একটা থালিস ট্রেনের সাথে অনেকগুলি কামরা জুড়ে দেওয়া হলো, কার্যতঃ দুটো ট্রেন একসাথে চললো। আমাদের প্যারিস নর্থ স্টেশনে এসে পৌঁছাতে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গেল।

ফ্রান্সে এই প্রথম যাচ্ছি । শুনেছিলাম ওরা ইংরেজী জানেনা, জানলেও বলতে চায়না। স্টেশনের অল্প দুরের একটা হোটেলে যাওয়ার জন্য একটা ট্যাক্সি নিলাম, দেখলাম ড্রাইভার ইংরেজী বললো। হোটেল থেকে বাইরে আসতেই চোখে পড়লো একটা দোকানের বাংলায় লেখা সাইনবোর্ড। ঢুঁ মারলাম দোকানে। মুদি দোকান, মাছ মাংস থেকে শুরু করে নিত্য ব্যবহার্য সবই আছে। সারি সারি মদের বোতলও চোখে পড়লো। ওদেশে লিকার বিক্রির জন্য লাইসেন্স লাগেনা বা পাওয়া খুব সহজ। বাঙালি দোকানী আমাদের পেয়ে খুশিই হলো। একটু আধটু জিনিস কিনে দাম দিতে যাবো, দুটি কিশোর ছেলে এসে ঢুকলো, তেরো চৌদ্দ বছর হবে বড়জোড়। কিছু বিস্কুট ইত্যাদি তুলে নিয়ে ফরাসি ভাষায় যা বললো তার অর্থ বাড়ি থেকে ইউরো আনতে পারেনি পরদিন দাম দিয়ে দেবে। দোকানীরা ধুরন্ধর, এ রকম দেখে অভ্যস্ত, শক্ত করে হাত চেপে ধরে বিস্কুটের প্যাকেট উদ্ধার করে নিলো। পরে ওদের কাছে শুনলাম বছর খানেক ধরে এ ধরণের ছিঁচকেদের সংখ্যা বেড়ে গেছে। শুদ্ধ ফরাসি বলছিলো কিশোর দুটি, তাই সদ্য আসা রিফুউজি বলেও মনে হলোনা। প্রথম দিনের এই ছোট্ট ঘটনায় আমরা অবাক হয়েছিলাম।

পরদিন সকালে হোটেল বদল করে ট্রেন স্টেশনের ঠিক উল্টোদিকের একটা হোটেলে চলে এলাম। প্যারিসে দেখার জিনিস অনেক, দুটো দিন শুধু হাতে। ঠিক করলাম আইফেল টাওয়ারটা দেখতেই হবে। বিকেলের দিকে রওয়ানা হলাম বাসে চেপে, যাতে আলোকসজ্জিত টাওয়ার দেখতে পাই। দিক নির্দেশনা ভালো করে নিয়ে রেখেছিলাম, Tour Eiffel নামের স্টপেজে নেমে পড়লাম। বাস স্টপেজের নাম শুনে ভাবলাম ইংরেজী ভাষী ট্যুরিস্টদের কথা ভেবে নামটা ওরকম। পরে ভুল ভাঙলো - ফরাসি ভাষায় Towerকে Tour বলে, উচ্চারণও আলাদা।

আমাদের ধারণা ছিলো আইফেল টাওয়ার অনেকগুলি নিরাপত্তা বলয় পার হয়ে বিশেষভাবে তৈরী বিশাল চত্তরে অবস্থিত, কাছে গিয়ে মনে হলো পাড়া ঘরের পিছনে কেউ একটা মস্ত মিনার বানিয়ে রেখেছে। নিচে অনেক মানুষের জটলা ঢুকতে গেলে বডি সার্চও করছে, তবে পরিবেশটা ঘরোয়া। চারটি স্তম্ভের ওপরে লোহা দিয়ে নির্মিত এই স্থাপত্য নয়নজুড়ানো। কিছুক্ষণ পর সন্ধ্যা নেমে আসলে ঝলমলে আলোয় ভরে গেল টাওয়ারটা, চোখ ফেরানো যায়না তখন। লোহা বা প্লাস্টিকের ছোট ছোট টাওয়ার বিক্রি করছে একগাদা ফেরিওয়ালা, ওদের কেউ কেউ আমাদেরকে দেখে হিন্দি বলছিলো, বুঝলাম প্রতি বছর যে এক কোটির মতো দর্শনার্থী আসেন এখানে উপমহাদেশের অনেকে আছেন তাঁদের মধ্যে ।

ফেরার পথে আবার বাসে উঠে বসলাম, তখন রাত ন'টার মতো। গ্যারে দু নরদ (নর্থ স্টেশন) থেকে আইফেল টাওয়ার বাস পথটি অনেকগুলি মনোরম প্রাসাদ ও বাগানের পাশ দিয়ে যায়, আসার সময়ে সেগুলি দেখেছি। ফেরার সময় একটা বিচিত্র অভিজ্ঞতা হলো । বাসে ভিড় ছিলো বেশ। চার পাঁচটি মেয়ে দাঁড়িয়ে ছিলো বাসে। মনে হলো ওদের একজন মার্কিন আর বাকিরা ফরাসি। কিছু কিছু ইংরেজী বলছিলো মাঝে মাঝে, তাতে মনে হলো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে। রাস্তার পাশে গুচি বা লুই ভুটনের দোকান দেখে মার্কিন মেয়েটি জিজ্ঞাসা করলো, "তোমরা এখান থেকে কিছু কেনো ?" একটি ফরাসি মেয়ে মাথা

নাড়লো, "আমাদের সাধ্যের বাইরে।" "তাহলে একটা মালদার বয়ফ্রেন্ড জুটিয়ে নাও" — এই সব সাধারণ কথাবার্তা। হঠাৎ খেয়াল করলাম বাসে সবাই শশব্যস্ত, ঐ মেয়েগুলির একজন অজ্ঞান হয়ে মেঝেতে পড়ে গেছে। অন্য বাসযাত্রীদের মতো আমরাও ঘাবড়ে গেলাম, দ্রুত চিকিৎসা করা দরকার। অবাক হয়ে লক্ষ্ করলাম মেয়েটির সঙ্গীরা একদম শান্ত, পায়ে হাতে মালিশ করছে। বাসচালককে থামতেও মানা করলো, বললো, "আমাদের বান্ধবীর এ রকম হয়। আমরা জানি, তাই ওকে একলা ছাড়িনা।" আমরা যারা ফরাসি বুঝিনা, তাদের সুবিধার্থে ইংরেজীতেও বললো কথাগুলো । একসময় মেয়েটির জ্ঞান ফিরে এলো, আর ওরা পরের স্টপে সবাই নেমে গেল। মেয়েগুলির বন্ধুত্বের দৃঢ়তা আর আত্মবিশ্বাসের প্রশংসা মনে মনে করলাম বাকি পথটা।

পরদিন সকালে বের হলাম লুভর (Louvre) মিউজিয়ামের উদ্দেশ্যে। এবার নিলাম ট্যাক্সি, গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছিলো। মিউজিয়ামের প্রবেশ পথে চমৎকার একটা কাঁচের পিরামিড আকৃতির ভবন যার ভাস্কর্যও অসাধারণ। লম্বা লাইন পার হয়ে যখন মূল ভবনে ঢুকলাম, এর বিশালতায় মুগ্ধ হয়ে গেলাম। অমুল্য সব চিত্র কর্ম স্থান পেয়েছে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এই মিউজিউয়ামে । একবেলা কেন, কয়েকদিনেও ফুরোবেনা এর ছবি আর ভাস্কর্য দেখে শেষ করা। দা ভিঞ্চির মোনালিসা স্বচক্ষে দেখলাম। ভ্যানগগ, রাফায়েল, রেম্ব্রান্ডট, কারাভাজিও আরও কত নামকরা শিল্পীর কাজ স্থান পেয়েছে এখানে।

বিকেলে ট্রেনে করে গেলাম একজন বাঙালি চিত্রশিল্পীর বাসায়, তাঁর নাম শাহাবুদ্দিন। বিশ্বমানের এই বাংলাদেশি পেইন্টার অনেক বছর ধরে বাস করছেন প্যারিসে। দুই মেয়ে মূল ফরাসি সংস্কৃতি ও রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত, তবু স্বচ্ছন্দে বাংলা বলে, বাংলা গান গায়। করবীর আঁকা দু'একটা ছবি শিল্পীকে দেখালাম, যার একটি সুচিত্রা সেনের পোর্টেট। শাহাবুদ্দিন সাহেব করবীকে নিজের স্টুডিওতে নিয়ে অনেক উপদেশ দিলেন। আমাদের বললেন, "আপনাদের নাতনির অনেক প্রতিভা আছে, ওকে সুযোগ করে দেবেন, না হলে বিকশিত হতে পারবেনা।" শাহাবুদ্দিন ও আনা ইসলাম দম্পতির সাথে

ঐ সন্ধ্যাটা খুবই ভালো কেটেছিলো। বেশ কিছু মধুর স্মৃতি নিয়ে পরদিন ভোরে প্যারিস ছেড়ে এলাম ।

****

তেপায়া

সঞ্চারী পাল

পর্ব ১

প্রথম অধ্যায়

"সকলি নিবে কেড়ে, দিবে না তবু ছেড়ে, মন সরে না যেতে, ফেলিলে একি দায়ে? কাঁদালে তুমি মোরে।"

“ওয়াও! ভালো গান শিখছিস তো, তোর গলাটা খুব রোমান্টিক। তোর মেরিট টেস্টে গোল্ড আটকায় কে?”

“অর্ণব! আমি তোকে ভালোবাসি।“ দুপুরের থমথমে পাড়া।

"কাঁচ ভাঙা, টিন ভাঙা, লোহা ভাঙা, শিশি বোতল ভাঙা বিক্রি আছে ছে ছে ছে ছে "...

ক্যাঁচোড় ক্যাঁচোড় করে ভাঙা ঠ্যালা গাড়িটা নীচের এঁদো গলির বাঁকে চলে গেলো। একঝাঁক পায়রা পত-পত করে উড়ে এসে বসলো অন্তরাদের চিলেকোঠায়।

দুজনে চুপ। কি গভীর সেই তিন খানি শব্দ। পবিত্র। কবেকার পুরোনো। অথচ জং পড়েনা। কাঁচ ভাঙা লোহা ভাঙা টিন ভাঙার মতো কতবার ভাঙছে আবার নতুন করে জুড়ছে। সৃষ্টি হচ্ছে প্রেমের নতুন সংকর রূপ ।

অন্তরাদের বসত বাড়িটা তিনতলা। সিস্টার নিবেদিতা স্কুলের পাশে। তিনতলার এই চিলেকোঠা থেকে গঙ্গা দেখা যায়। পুজোর ছুটির এই দুপুর গুলো অন্তরা আর অর্ণব এক সাথে কাটায়। চিলেকোঠার এই ঘরটা ওদের খেলাঘর। যা গেছে সবার হেলায় ফ্যালায় তাই দিয়ে এই পনেরো বছর ধরে দুজনে গড়েছে এক অন্য পৃথিবী।

আদম আর ইভের মতো, ওদের গ্রহের বাসিন্দা শুধু দুটো প্রাণী। এতো দিন শুধু ঝগড়া, মারপিট বেশি হয়েছে। আজ এ যেন এক নতুন সূর্য উঠেছে ওদের গ্রহে। এই প্রথম বার অর্ণবের অনুরাগে অন্তরার অন্তর ভরে উঠেছে কানায় কানায়।

বেশ কয়েকদিন ধরেই অন্তরা একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করছিলো নিজের দৈনন্দিন কাজকর্মের মধ্যে।

পরশু দুপুরে যখন দুজনে মিলে একটা তেলরঙের ছবি বানাচ্ছিল আর অন্তরা কেরোসিনে তুলিগুলো মুছে অর্ণবের পাশে রাখছিলো তখন ওকে আর ওর ন্যাপি ফ্রেন্ড মনে হচ্ছিলো না। অর্ণবের রংএর হাত অন্তরার চেয়ে ভালো বলে, অর্ণব আঁকলে ও প্যালেটে রং দেয়া, তারপিন তেল কালো হয়েগেলে নতুন তেল ঢালার কাজ করে।

এই যে ছবিটা ওরা বানাচ্ছে তার পরিকল্পনা অন্তরার। একটা লোহিত কণিকার বিস্ফোরণে সৃষ্টি হলো তান্ডব রত নটরাজ। ছবিটা এঁকেছে অন্তরা। ফার্স্ট টোনের টানগুলো অন্তরার। সেকেন্ড টোন থেকে শুরু হয় অর্ণবের হাতের জাদুগরি।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ঢং ঢং করে দুটো বাজলো ঘড়িতে। অর্ণব, আঁকার তুলি হাতে, মুখের দিকে তাকিয়ে অন্তরার। এই তিনটি শব্দের জন্য তৈরি ছিলোনা সে। অন্তরা হাতের তুলি ইজেলে রেখে অর্ণবের ঠোঁটে ঠোঁট ডুবালো।

ঘরের মধ্যে গুমোট গরম। টেবিল ফ্যানটা গুটগুট করে চলছে ধীরে ধীরে।

"কেমন লাগলো? আমাদের প্রথম প্রেমের চুম্বন?"

কাঁপা কাঁপা গলায় অর্ণব বললো, "ভা-লো, কিন্তু তোকে তো আমি ওরম চোখে দেখিনা।"

"মানে? দেখিস না এখন দেখবি।"

"আমি আজ বাড়ি যাই বুঝলি, কাল আসবো।"

"তুই আমাকে এই অবস্থায় ফেলে যাবিনা। আমাকে ছুঁয়ে দেখ।"

অর্ণব ঢোঁক গিলে অন্তরার কপালের এলোপাথাড়ি চুলগুলো সরিয়ে দিতে যাচ্ছে, এমন সময় অন্তরা ওর বুকের সবথেকে স্পর্শপ্রবণ জায়গার ঠিকানা দেখালো অর্ণবকে, আর কিছু বোঝার আগেই তাকে জড়িয়ে ধরলো অন্তরা।

অর্ণব ৫ফুট ১০ ইঞ্চি আর অন্তরা ৫ফুট ৬ইঞ্চি। পাশাপাশি হাঁটলে অন্তরা অর্ণবের বুকের কাছে পরে।

দেয়ালের ঈশান কোনে একটা মাকড়সা বড়োসড়ো ভিমরুলকে গ্রাস করার চেষ্টা করছে। ভোঁ ভোঁ আওয়াজ করে প্রাণপণ চেষ্টা করছে ভিমরুলটা খুদে মাকড়সার জাল থেকে বেরোনোর। কিন্তু বৃথা চেষ্টা।

আবেশে চোখ বুজে এলো অর্ণবের। কি সাংঘাতিক তীব্র উন্মাদনা অন্তরার শরীরকে সম্পূর্ণ অনুভবের মাধ্যমে আবিষ্কৃত তার দেহের গোপন প্রতিটি খাঁজের রহস্য ও মসৃণতায় নিজেকে উজাড় করে দেয়ার মধ্যে।

"ও মাগো! দিদিমনি, তুমি সব জামাকাপড় গুলনে ভিজাইলা গা?"
সম্বিৎ ফিরলো দুজনের। তাড়াতাড়ি ঘরথেকে বেরিয়ে অর্ণব হাতে হাত মেলালো গোপালের মার সাথে। গজ গজ করতে করতে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলো গোপালের মা।

অর্ণব ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলো। অসমাপ্ত অশনি সংকেত, আলেয়ার আলিঙ্গন, টেস্টোস্টেরোনের বিপুল তরঙ্গের ঝাপটায় অন্তরাকে আরেকবার বুকের মধ্যে ঢুকিয়ে নিলো, অর্ণব। অন্তরা সমর্পিত অর্ণবের ভেজা সুঠাম পেশীবন্ধনে। চোখ বুজে উপভোগ করছে অর্ণবের শক্ত অংশটির উষ্ণতা আর অর্ধ ভিজে দেহের পুরুষালি গন্ধ।

"গ্রহণ কর আমায়।"

"নারে! এতো সহজে এসব স্বর্গীয় জিনিস করতে নেই, কমলা লেবুর কোয়া একটা একটা করে খাওয়াতেই আনন্দ। আমাদের রক্ত মিশবেই, প্রতিশ্রুতি দিলাম তোকে।"

অন্তরার সিঁথিতে হাত দিয়ে অর্ণব বললো "আগে এটা লাল হবে তার পর তোর শরীর"।

তৃতীয় অধ্যায়

"অ দিদিমনি, অ দাদাবাবু চা নে এইচি! দোর খোলেনি ক্যানে?"

অর্ণব তড়িঘড়ি করে দরজা খুলে দিলো। চোখে মুখে চাপা উত্তেজনা। থমথমে পরিবেশ। মুখে কারোর কথা নেই। ঘুটুর ঘুটুর করে পায়রা গুলো যেন ফিসফিসিয়ে, গোপালের মাকে গোপন খবরটা দেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। নাঃ! গোপালের মার এতো সময় নেই গোয়েন্দা গিরি করার।

"দাদাবাবু তোমার মা ফোন কৈরেছেলেন, বলেচেন রেতের বেলায় বাদলা আচে, বেশিকন থেকনি কো একেনে। "
"হোলি খাউ! আই হ্যাভ এন অপোইনমেন্ট উইথ সাম ওয়ান। আসিরে। পরে বলবো তোকে। বাই।"
চায়ের কাপে দু চুমুক মেরে চলে গেলো ঝড়ের বেগে।

বৃষ্টি ভেজা শহরের গায়ে খটখটে আশ্বিনের রোদ। পেঁজা তুলোর মতো সাদা মেঘের ভেলায় ভেসেছে অন্তরার অন্তরাত্মা। নীল কাজল টানা চোখে দূরের বস্তির চিৎকারের আওয়াজ এ , বব ডিলানের গান ভেসে এলো ... "How many roads must a man walk down, before you call him a man?"

অন্তরার কেমন যেন সন্দেহ হলো, অর্ণব কি সত্যিই ম্যান হয়েছে? শরীরের গোপন পেশির দৃঢ়তাই কি পুরুষত্বের প্রমান? অর্ণবকে ওর মন জাহাজের নাবিক বানিয়ে কি ভরাডুবি হবে?

আজ ও হঠাৎ কার সাথে এতো তড়িঘড়িতে দেখা করতে গেলো? মনটা বেশ ভারী হয়ে গেলো, অন্তরার। জানালার মোটা লোহার রড টা জড়িয়ে বুক ছেড়ে বেশ খানিকটা কাঁদলো। মেঘ কালো করে এসেছে গঙ্গার দক্ষিণ কোণে। জলে ভরা বাদলের মেঘে বিদ্যুৎতের বেত্রাঘাত এর আর্তনাদ শোনা যাচ্ছে দূরে। ধূলি ঝড়ে ঢাকা পড়লো তিলোত্তমা কলকাতা। জানালা দিয়ে ঠান্ডা বাতাস গায়ে শিহরণ জাগালো অর্ণবের স্মৃতির। জানালা বন্ধ করতে গুমোট গরম ভেতরটায়।
এতক্ষন লক্ষ করেনি ঐ ভীমরুলটাকে খুদে মাকড়শাটা নিস্তেজ করে দিয়েছে। যে তুলিতে অর্ণব ছবি আঁকছিলো সেটা দিয়ে, টেবিলের ওপর চড়ে, জাল কেটে, ভীমরুলতার ডানা পরিষ্কার করে দিলো আলতো করে।
ছাড়া পেয়ে উড়ে এসে বসলো ইজেলের মাথায়। নটরাজের জটার বাঁধন খুলেগেছে, মুখের আদলটা অনেকটা অর্ণবের মতোই লাগছে।
চিলেকোঠার দরজা বন্ধ করে নিচে নেমে এলো অন্তরা।

চতুর্থ অধ্যায়

ক্যাথরিন সবে। লা মার্টিনিয়ের সবচেয়ে আকর্ষণীয় মেয়ে। স্কুলের সবাই ওকে ক্যাথ বলে ডাকে। ক্যাথ ইদানিং অর্ণবের সুইমিং এর প্রেমে পড়েছে। ক্যাথের সাথে অর্ণবের আলাপ স্কুলে। অর্ণব ক্লাস এইট এর ডিবেট চ্যাম্পিয়ান হবার পর থেকেই ক্যাথ নানান অছিলায়, প্রায়শই চোদ্দো নম্বর রাউডন স্ট্রিট থেকে ছশো মিটার হেটে এগারো নম্বর লাউডন স্ট্রিটে চলে আসে।
অর্ণবেরও ক্যাথের ইংরিজির ঝড়ে একটু আধটু ভাঙা বাংলার টানের কথা শুনতে দারুন লাগে।
সবচেয়ে সুন্দর ওর নীল দুটি চোখের মনি, তামাটে প্লিট করা ঠাকুরের মতো চুল, উন্নত নাসিকা, গোলাপি ঠোঁট আর গজদন্ত। সব মিলিয়ে ক্যাথের ব্রিটিশ রক্ত, ভিন্ন চলন বলন অর্ণবের নতুন লাগে।

আজ ইডেন গার্ডেনে ক্যাথের সাথে অর্ণবের প্রথম ডেটিং।

"আই থট, ইউ হ্যাভ ফরগটেন মি।"
"না মেমসাহেব, হাজির আমি তোমার দ্বারে।"

পেছন দিক থেকে হাঁটু দিয়ে এক গুঁতো দেয় অর্ণবকে। এতক্ষন দাঁড়ানোর জন্য রীতিমতো ফনা তুলে কেউটে সাপের মতো ফুঁসতে থাকে।

হাত ধরে একটা শেডের তলায় দাঁড়াতেই, ঝুমিয়ে বৃষ্টি নামে। ঝাঁটের তীব্রতায় দুজনেই আধ ভিজে হয়ে যায়। অর্ণবের গায়ে ফেড সবুজ রঙের টি শার্ট আর গ্রে জিন্স। ক্যাথ বাদামি রঙের মিডি পড়েছে, বাদামি চুল আর জামার রঙে ওকে স্বর্গের পরী পড়ি লাগছে। নীল চোখ দুটোতেই আটকে আছে অর্ণব। গোলাপি ঠোঁটের ওপর নিজের অবচেতনেই ঠোঁট ছুইয়ে ফেলে।

বুকটা হটাৎ অন্তরার জন্য কেঁদে ওঠে। অন্তরাকে দেখতে ক্যাথের কাছে কিছুই না। চাপা গায়ের রং, নাকটা একটু খাঁদা, চোখদুটো ভাসা, আর সব মিলিয়ে একটা অন্য রকম সৌন্দর্য, যার কাছে অর্ণব প্রতিশ্রুতি বদ্ধ সিঁথি রাঙানোর।

"হোয়ার র ইউ ম্যান? ডোন্ট থিঙ্ক মাচ। জাস্ট ডু ইট।"
"না গো, এগুলো ঠিক নয়। আমাদের এই ভাবে কেউ দেখে ফেললে মুশকিলে পড়বো দুজনেই।"
"নো ওয়ারিস বেব, নেক্সট টাইম উই উইল মিট ইন ঢাকা জায়গা লাইক আমার ড্যাডস ফ্লাট।"

অর্ণব গলার ঢোঁকটা গিলে নেয়, গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। হঠাৎ খুব হাসি পায় kinley জলের বিজ্ঞাপনের কথা মনে করে। সত্যিই তালে সেক্স এর সময় গলা শুকোয়। মনে মনে ভাবলো আজ তো বাঁচলাম, কালকে ওর বাবার ফ্ল্যাটে কি হবে কাল ভাবা যাবে।

অর্ণবের জিন্সের পেছনের পকেটে হাত ঢুকিয়ে খুব গা ঘেঁষে ওর উন্নত বক্ষদেশ অর্ণবের পাঁজরে লাগাতে লাগাতে এক ছাতার তলায় সুভাষ চন্দ্রের মূর্তিটার কাছে এলো। অর্ণব মুখ তুলে "পার্ডন মি স্যার" বলে সুখে এগিয়ে চললো ক্যাথকে ওর গাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিতে। বৃষ্টিটা একটু ধরেছে। সন্ধ্যের বিপুল জনস্রোতে ভাসিয়ে দিলো নিজেকে।

পঞ্চম অধ্যায়

গোপালের মা নরম কাপড় দিয়ে হ্যারিকেনের কাঁচ মুছছিলো। একতলাটা বেশ ঠান্ডা। বৃষ্টির পর বেশ শীতশীত করছিলো অন্তরার। একটা বাটিক সিল্কের চাদর গায়ে দিয়ে অবাক চোখে তাই দেখছিলো। কেরোসিনের গন্ধটা মাতাল করছিলো ওকে অর্ণবের স্মৃতিতে। অয়েলের তুলিগুলো কেরোসিনে ধোয় বোলে, এই গন্ধটা যেন ওদের একান্ত ব্যক্তিগত।

গোপালের মাকে দেখতে কি সুন্দর। ঠিক যেন রবীন্দ্রনাথের কৃষ্ণকলি। ঘুমটা মাথায় নয় সেও, মুক্তবেণী পিঠের পরে তারও লোটে, কালো মেয়ের কালো হরিণ চোখে মাসকারা কোথায় লাগে?

বসে বসে গোপালের মায়ের শরীরের মেদের সুসজ্জিত দুলুনি দেখতে দেখতে পরের ছবির সাবজেক্টে গোপালের মার প্ল্যানটা মাথায় এলো। শ্বেতপাথরের টেবিলের ওপরের টেলিফোনটার দিকে তাকিয়ে ভাবলো অর্ণবকে ফোন করে অনুমতি নেবে গোপালের মা যদি ওদের পরের প্রজেক্ট হয়।

অন্তরার পিতামহী ধুনুচি হাতে ধুনো দিয়ে গেলো ঘরের আনাচে কানাচে, মুখে পবিত্র আদ্রা স্তোত্রর স্রোতের মধ্যে ঘড়িটা ঢং ঢং ঢং ঢং ঢং করে বেজে উঠলো।

টেবিলের তলা থেকে কে সি নাগের অঙ্ক বই বের করে কষতে লাগলো। বাবা সকালে পঞ্চাশটা শতকরার অঙ্ক দিয়ে গেছেন। ফিরে এসে ফাঁকি মেরেছে দেখলে বকবে। লা মার্টিনিয়া স্কুল এ আই সি এস সি বোর্ড বলে অঙ্ক টার ওপর অন্তরার বাবার বিশেষ নজর।

ডিং ডং!
"তুমি মোছো আমি খুলছি"।
"ক্যামেরাটা ধর আগে, দেখিস ভীষণ ভারী, পাশের ডোর ট্রাঙ্ক কফি টেবিল টার ওপর রাখ।"
"তোমার এক্সিবিশন কেমন হলো, মা?"

"কে এসেছিলো জানিস? সৌমিত্র লাহিড়ী। ওনাকে বললুম তুই ভালো সেতার বাজাস। বোর্ড এক্সামের পর ওনার বাড়িতে গিয়ে শিখে আসবি, কি বল?"

মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে সদর দরজা বন্ধ করে দেয়।

"বাবা কখন আসবে, গো মা?"

"কি জানি! বলে তো গেলো ডি জে সি কে দেখাবে পেপার গুলো। HIV র নেচার টাকে কতগুলো স্ট্যান্ডার্ড কন্ডিশন এ মনিটর যে করা যায়,আর বেসড অন দ্যাট আউটার সেলের প্রোটিন টাকে ভাঙা যায়। এই তথ্যটা খুব দরকারি আলোচনা করা অন্যদের সাথে। প্রথমে তো বললো যাদবপুরের বায়োটেকনোলোজির হেডের সাথে মিটিং, তার পর সায়েন্স কলেজ। তোকে ফোন করেছিলো?"

"উঁ হু"।

"গোপালের মা এককাপ চা বানাও না গো, যদি হাত খালি থাকে তো।"

"আমি একুনি এনে দিচ্ছি গো, বৌদিমনি।তুমি ও এক কাপ খাবে নাকি গো দিদিমনি? তখন কার চাটা তো দুজনের কেউই খেলেনি কো।"

"আচ্ছা দাও।"

"দারুন খবর আছে রে, এই ডিসেম্বরে নিউজিল্যান্ডে ফোটো শুটিং আছে ভাবছি তোকে নিয়ে যাবো, তুই ছবি আঁকবি, টিমের সাথে যাবো, হিল্টন হোটেলের থ্রি বি হেইচ কের এপার্টমেন্ট, ভালোই লাগবে তোর, বই নিয়ে নিস পড়বি।"

অপর্ণা নিজের ঘরে যাবার আগে, শাশুড়ি মার ঘরে ঢুকে একগুচ্ছ রজনীগন্ধা ওঁর খাটের পাশের টেবিলের ফুলদানিতে দিয়ে শ্বশুর মশাইয়ের ছবিতে প্রণাম করে বললো,

"মা! আজ আমার যতো খ্যাতি সব ওনার প্রেরণায়"

"নাঃ মা! তোমার মধ্যে গুণ ছিলো, উনি তাতে ইন্ধন জুগিয়েছেন। ফুটো পাত্রে জল ঢাললে কি ধরা যেতো বলো? তুমি এই যে প্রত্যেক বার সফলতার পরে ওনাকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করো, এতেই দেখবে তুমি আরো বড়ো হবে। মানুষের দেহত্যাগের পরেও তার সত্তা থেকে যায় এই ক্ষিতি, অব, তেজ, মরুৎ, বোমের মধ্যে। আমাদের কাজ হলো ষষ্ঠম ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তার পসিটিভ রেকিকে অন্তরাত্মা দিয়ে অনুভব করা।"

অপর্ণা ওর শাশুড়িমাকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে, গলা জড়িয়ে গালে আলতো চুমু দিয়ে জিজ্ঞেস করলো, "আজ আমি রান্না করবো, কি খাবে বলো?"

"পাগলী বৌ আমার, সারাদিন তেতে পুড়ে এসেছিস এখন একটু শুগে যা, তা না এখন বুড়ি রান্না ঘরে খুন্তি নাড়তে যাবে "।

"হাউ আবাউট ফ্রায়েড রাইস আর চিলি পনির?"

"তুই যখন খেপেছিস তো কর"।

হাঁক উঁচু করে অপর্ণা বললো, "গোপালের মা সরু বাসমতি চাল বসাও, আর চালটাকে একটু শক্ত রাখো। আর ফ্রিজে এক বার দেখো তো বিনস, ক্যাপসিকাম আর কড়াই শুঁটি আছে কিনা?"

"রামুদা! প্লিজ, চৌমাথার মাদার ডেয়ারি থেকে পাঁচশো গ্রাম পনির এনে দাও।"

"মা! তুমি ফ্রি হলে একবার আসবে, ৫% সুদে টাকা খাটিয়ে, ১০% ক্ষতি করার পরেও, উফ! এটাই তো আনসার হওয়া উচিত, কেনো মিলছেনা উত্তর দেখো তো ?"

"মাথা ঠান্ডা রাখ! আর বাবা যেগুলো শিখিয়েছে পাতা উল্টিয়ে দেখ, আমি আসছি।"

পর্ব ২

প্রথম অধ্যায়

অর্ণব চাবি দিয়ে দরজা খুলে সোজা ম্যাসোনাইনে চলো গেলো।

নিচে বাবার এক মহিলা রুগী তার বাচ্চাকে রাস্তায় নিয়ে পায়চারি করছে। আজ একটু বেশিই ভিড় ডিসপেন্সারীতে। দরজা খুলেই অন্তরার দেয়া উইন্ড চেনটা বেজে উঠলো। মনটায় চাপা অপরাধ বোধ উঁকি দিলো। শরীর ছেড়ে দিলো বিছানায়। জানালা খুললে ফুরফুরে ঠান্ডা বাতাস পেতো, কিন্তু খোলা হাওয়া যেন গুপ্তচর হয়ে, ওকে সব কথা বলে দেবে তাই এ-সি চড়িয়ে সিলিঙ এর রেডিয়াম দেয়া মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সিটাকে দেখতে লাগলো।

এটাও অন্তরার তৈরি। পাশের দেয়ালের ম্যাডোনার ছবিটাও ওরই আটকানো। ঘরের গাড় বাদামি আর পিচের যুগলবন্দী তে দেয়ালের রংটাও ওর পরিকল্পনা। অন্তরা ছাড়া ওর আদৌ কোনো অস্তিত্ব আছে কিনা এই ভাবতে ভাবতে চোখ বুজে এলো।

"টিটো! দরজা খোলো, রাত এগারোটা বাজে, নীচে খাবে এসো।"

দরজা খুলে মার মুখটা দেখে জড়িয়ে ধরলো মাকে। বিয়াল্লিশ বছরের কেউ বলবে না শ্রেয়সীকে। সদ্য ফোটা ফুলের মতো তার রূপ। গায়ে ঈষৎ মেদের প্রলেপ লেগেছে বটে কিন্তু লক্ষী প্রতিমা রূপিনী আলগা চটক যেকোনো কুমারীর ঈর্ষার কারণ হবে সন্দেহ নেই। বয়সকে দর্শকের আসনে বসিয়ে, জাদুগরের মতো ম্যাজিক দেখাচ্ছে সৌন্দর্য।

"কি হয়েছে? আমার ধেড়ে ছেলের এতো আদর? নিশ্চই কোনো অন্যায় করেছো? অন্তরাকে কি কিস করেছিস?"

লজ্জায় লাল হয়ে গিয়ে চুপ করে যায়। মনে মনে ভাবে।... "মা ও কি তাহলে অন্তরা কে ওঁর হবু বৌমার আসন দিয়ে দিয়েছে?" কি ভাবে মাকে বলবে এক সাথে দু 'দুটো মেয়েকে আজ চুমু খেয়ে এসেছে? এতো বড় বীরত্বের কাহিনী সম্রাট অশোকও লেখেন নি।

মনে মনে অনিল কাপুরের এক সিনেমার গান মনে পড়লো, "এক তারাফ হয় ঘরবালি, এক তরফ বাহার বালি, এ বোলে ম্যায় আলা, বো বোলে ম্যায় আলী।"

দ্বিতীয় অধ্যায়

"পিরিরিক পিরিরিক... পিরিরিক পিরিরিক"... দুরভাষ এলো দুটো লম্বা কালো দামি চামড়া র সোফার মধ্যিখানে রাখা তেকোনা শ্বেত পাথরের টেবিলটার ওপর থেকে।

"হ্যালো!"

"কে? অপর্ণা? আমি আজ রাতে বাড়ি ফিরছিনা, কাল ব্রেকফাস্টের আগে ঢুকে যাবো।"

"আমি না খেয়ে বসে আছি, অনেক দিন পর তোমার জন্য নিজে হাতে রান্না করলাম, আর তুমি আসছোনা?"

"নাহঃ! ই-কোলাই এর কালচারটা না গ্রো হলে কিছুই হবেনা, আর এখন বাড়ি গেলে দিনের সব প্রচেষ্টার পন্ডশ্রম হবে।"

"যা ভালো বোঝো, কি খাবে রাতে?"

"কৃষ্ণাকে দিয়ে বালিগঞ্জ ফাড়ি থেকে কিছু আনিয়ে নিচ্ছি।"

"এখনো নাও নি? দোকান তো বন্ধ হয়ে গেছে।"

"ওহো! তাহলে জল খেয়ে নেবো, তোমার দেয়া ডি-টক্স ওয়াটার আছে। এমনিতেও মুটিয়ে যাচ্ছি, তোমার পাশে মানায় না, তা এই সুযোগে বডি ডি-টক্স হয়ে, ভুঁড়ি কমবে,

কি বলো?"

"দেখো তো কি বিপদ। ঠিকআছে যা ভালো বোঝো।" ফোনটা ছাড়ার পর অপর্ণার বুকটা মুচড়িয়ে উঠলো বরের দুঃখে।

গোপালের মা চলে গেছে। রামুদাও গ্যারাজে আলো নিভিয়ে ঘুমোচ্ছে। হঠাৎ অপর্ণার মনে হলো আজ রোমান্টিক ডেটিং করার... বরের সাথে। যত শিগ্গিরি পারে সব প্যাক করে গাড়ির চাবি নিতে নিতে অন্তরাকে দরজা দিয়ে দিতে বললো।

"আমি চাবি নিয়ে যাচ্ছি, তুই ঘুমিয়ে পর, ঠাম্মি যেন না জেগে যায়, তুই পা টিপে'টিপে ওপরে চলে যা, আমি দরজা খুলে ঢুকে পরব।"

গাড়ি নিজেই বের করে চালাতে লাগলো। কতদিন পর নিশি ভ্রমণে বেরিয়েছে বাহনে চেপে। কি অদ্ভুত এক মাদকতা এই রাতের মহানগরীতে। এক কুকুর দম্পতি আন্ডা গাচ্চা নিয়ে ভোউউউউউউউ করে বলে উঠলো, "শুভ যাত্রা।"

তৃতীয় অধ্যায়

ক্যাথ সে রাতে বাবার ফ্ল্যাট এ গিয়ে উঠলো। ইদানিং মায়ের সাথে সে কমই থাকে। মা'র নতুন জীবন সঙ্গীকে মন থেকে সৎ বা অসৎ কোনো বাবা বলেই মনে হয়না তার।

ড্রাইভার কে বললো মাকে বলে দিতে ও পুজোর ছুটিটা এখানেই কাটাতে চায়। সারা গায়ে শুধু অর্ণবের গন্ধ। মাতাল করা Celine Dion এর "ফলিং ইন টু ইউ" এলবামটা চালিয়ে অন্তর্বাস খুলে জাকুজিতে গিয়ে ঢুকলো। নিজের শরীরের প্রতিটি শিরা উপশিরা, আজ অভিনন্দন জানাচ্ছে অর্ণবের স্পর্শকে। হাতটা ওর কিন্তু স্পর্শটা সম্পূর্ণ অচেনা-অজানা। এ যেন নিষিদ্ধ কোনো অন্ধকার পল্লীর গভীর রাতের রোমাঞ্চকর এক অভিসার। অঙ্গে অঙ্গে অর্ণবের বাঁশির সুরে, নদীর বিপুল জলরাশির গর্জ নিনাদ সহকারে আস্ফালন হলো, ক্যাথের প্রেম জোয়ারের।

থমথমে পরিবেশ, নিস্তেজ শরীর। লাল মোমবাতির আলোয় নিজেকে নগ্ন দেখতে আজ আরো অন্য রকম লাগলো তার। জ্যাকুজির গুবগুব শব্দ। দেহের বিভিন্ন স্থানে প্রবল জলের তীব্র স্পন্দনের উন্মাদনায় খুব ইচ্ছে করছিলো অর্ণবকে স্কাইপে ডাকতে। দেখাতে যে, সে কতো ভগবান প্রদত্ত সৌন্দর্য নিয়ে জন্মেছে আর তার একছত্র অধিপতি শুধুই তার প্রাণনাথ "অর্ণব"।

জাকুচির স্পন্দন বন্ধ করে, নীল আলোয় মোড়ান জলের তলায়, সম্পূর্ণ ডুব দিয়ে, দম বন্ধ করে শুয়ে রইলো কিছুক্ষন। ফুসফুসের টনটনানিতে জলের ওপর উঠে নিঃস্বাশের জন্য আঁক পাঁক করতে করতে, প্রাণ ভোরে নিঃশাস নিয়ে, হেসে ভাবলো এইটাও অর্ণবকে বলবে, ওর কাছে অর্ণব এতটাই জরুরি যতটা এই নিশ্বাস।

পাশে রাখা দুটো বাথ রোব। গোলাপিটা ওর। আর সাদাটা ওর বাবার। মনে মনে ঠিক করে ফেললো পরের দিন অর্ণব আসলে ওকে ওটা পড়াবে।

মাথার চুলটায় একটা শাওয়ার ক্যাপ লাগালে বোধহয় ভালো হতো, ভাবতে ভাবতে সাদা পাতলা কাপড়ে চুলটা পেঁচিয়ে নিলো।

মাথাটায় খুব যন্ত্রনা করছে। ফ্রিজ খুলে দেখলো হোয়াইট ওয়াইন আছে, আর শ্যাম্পেইন। শ্যাম্পেইনটার কর্কটা বড্ড বেয়ারা। গ্যাঁট হয়ে বোতলের গলা জড়িয়ে বসে রইলো। ভাগ্যে বাবলি জুটলোনা যখন, তখন অগত্যা ওয়াইনে মন না থাকলেও সুন্দর দুটো ওয়াইনের গ্লাসে খানিকটা ঢেলে চিয়ার্স করলো মিছি মিছি।

একপাত্র নিয়ে খেতে খেতে চুলটাকে শুকোতে ড্রায়ার চালালো। আরেক পাত্র নিয়ে পূবের ছোট্ট বারান্দায় এসে ইজি চেয়ারটায় একটু বসলো। দূরের আবছায়া কুয়াশায় এক মাদারী দুই বাঁদরীকে নিয়ে ডুগডুগি বাজাতে বাজাতে ঘরে ফিরছে।

ক্যাথের হঠাৎ বুকটা ছ্যাঁক করে উঠলো। অর্ণব আর অন্তরার কথা স্কুলের সব্বাই জানে। তাহলে কি অর্ণব দুই নৌকায় পা দিয়ে চলছে? নাকি ওই বেনো জলের মতো অনধিকার প্রবেশ করছে? সবটা ঘেঁটে যাচ্ছে।

অসহ্য এই মাথার যন্ত্রনা। হাতের গ্লাসটা পড়ে দুই টুকরো হয়ে গেলো। যন্ত্রনায় কাতরাতে কাতরাতে, কুঁকড়ে কুকুর কুন্ডুলি হয়ে শুয়ে পড়লো বিছানায়।

চতুর্থ অধ্যায়

সায়েন্স কলেজের পার্কিং এই রাতেও ভর্তি হয়ে আছে, এদের কি সংসার বলে কিছু নেই? এই ভাবতে ভাবতে লিফট এ ছ-তলায় উঠলো। লিফটের দারোয়ান চিনতে পেরে সালাম ঠুকলো।

বায়োকেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্ট। ল' কলেজের দিকটা থেকে কোলাহল শোনা যাচ্ছে। এতো রাতে মানুষের মনে কোত্থেকে এতো পুলকের ঘনঘটা আসে, কে জানে? নিজের মনে গজ গজ করতে করতে বাম হাতের প্রাক্টিক্যাল রুম গুলোতে উঁকি দিলো।

বেগুনি আলোর ইউ ভি লাম্পটা জ্বলছে। বেগুনি রং এর ছটায় ঘরটাকে কেমন যেন ভুত-ভুতূড়ে মনে হলো অপর্ণার।

এজিটেটর এর ঘনর ঘনর আওয়াজ। সেন্ট্রিফিউজটা সাই সাই শব্দে ঘুরছে। গা ছমছমে পরিবেশ। বুকের ভেতরের রক্ত চলকে উঠলো, দাঁত বের করা কঙ্কালটাকে দেখে।

হঠাৎ ডান হাতের ফিউম কাবার্ড এর পেছনে হিশ হিসানি শুনে এগিয়ে গেলো অপর্ণা। ধপধপে সাদা একটা এলবিনো ইঁদুর ওর দিকে তাকিয়ে ভেংচি কাটলো।

ভয়ে গলা শুকিয়ে কাঠ। জল খেতে পি সি আর রুমের পাশে যেতে ফিসফিসানি শুনে দরজায় কান পাতলো।

"স্যার, ইউ ক্যান হ্যাভ মি।"

"হুম! উঃ! কৃষ্ না – না।"

"আহঃ।"

অপর্ণা আর না শুনে ভূত দেখার মতো দৌড়ে লিফটের কাছে চলে গেলো। হাঁফাতে হাঁফাতে, উস্কো খুশকো চুলে, মোটা ভুঁড়ি নাঁচিয়ে লিফটের কাছে এসে কৌশিক দেখলো কেউ নিচে নেমে গেলো। মনে মনে ভাবলো, ও হয়তো ওর মনের অপরাধ বোধ, অপর্ণার অশরীরী বেশে এসে ভয় পাইয়ে দিয়ে গেলো। আবার ফেরত গিয়ে ডি এন এর রেপ্লিকেশন এর সাথে তালে তাল মিলিয়ে শারীরিক ইন্টারাকশান চলতে থাকলো জোড় কদমে।

পঞ্চম অধ্যায়

অন্তরা নিজের ঘরের মশারিটা খাটিয়ে ভালো করে এপাশ ওপাশ গুঁজে নিলো। আজ গোপালের মা ওর বিছানায় নতুন চাদর পেতে দিয়েছে। প্রাণভরে সেই ঘ্রান অনুভব করার চেষ্টা করলো।

ঘন্ধটা ফিকে হলেও বেশ মনোরম। মধ্যিখানে রাধা কৃষ্ণ, আর চারপাশে গোপিনীদের ভিড়। নন্দলাল বসুর ঠিক এমনি একটা ইন্ডিয়ান আর্টস করেছিল ও'র সেভেন্থ ইয়ার আর্ট ডিপ্লোমার দিনে।

হঠাৎ মনে হলো তিনতলার ছাদের দরজাটা বোধ হয় দেয়া হয়নি। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে আলো জ্বালাতেই পায়ে ঘষটানি খেলো ঐ ভিমরুলটা। মরে কাঠ হয়ে গেছে। মাকড়শাটা ওর শরীরের সব রক্ত চুষে নিয়েছিল ততক্ষনে, যতক্ষনে অন্তরা ওকে মুক্তি দিয়ে ছিল।

সাদা একটা কাগজে ওটাকে নিয়ে, ডালিয়ার ছোট্ট চারা গাছটার পাশে পুঁতে দিলো। মনে মনে বললো, "পরের জন্মে ফুল হয়ে ফুটিস, আমি আদর করবো তোকে।"

ভাগ্যিশ ওপরে এলো, নইলে সারারাত দরজা খোলাই থাকতো, আর চোর এসে যদি ওদের নটরাজকে চুরি করে নিতো?

আকাশে চাঁদটা ধীরে ধীরে ঢাকা পড়ছে, অবাক চোখে তাকায়। কৃষ্ণ পক্ষ আসছে, তাও কত আলো। আকাশের মেঘ কেটে গেছে। শরতের মেঘ, আলোআঁধারিতে

লুকোচুরি খেলছে চাঁদের সাথে। রাতের আকাশেও রামধনু দেখা যায় তা কোনোদিন আগে দেখেনি সে।

বড়ো সিমেন্টের টবের শিউলির চারা টায় প্রথম কলি এসেছে। আকাশ বাতাস তার তেজালো সৌরভে সুরভিত। গুনগুনিয়ে কবেকার ফেলেআসা তালাদ মামুদের এক কলি গান গেয়ে উঠলো অন্তরা।

"যেথা রামধনু ওঠে হেসে,

আরো ফুল ফোটে ভালো বেশে

বলো তুমি যাবে কিগো সাথে?

এই পথ গেছে সেই দেশে। "

হঠাৎ গাড়ির ইঞ্জিনের আওয়াজ হলো নীচের গেটে। ওপরের দরজায় তালা দিয়ে, আলো নিভিয়ে, নিচে এসে, হাসি মুখে দরজা খুলে অন্তরা অবাক। একি দেখছে? এটা কি ওর মা? চোখ দিয়ে যেন আগুনের ভাঁটা বেরোচ্ছে। কোনো কথা না বলে দোতালায় গিয়ে নিজের বিছানায় শাড়ি পরেই শুয়ে পড়লো।

অন্তরা বেগতিক দেখে, মার মাথায় হাত বুলাতে লাগলো। মার সারা শরীর থরথর করে কাঁপছে। কিংকর্তব্যবিমুঢ় হয়ে জিজ্ঞেস করলো - "একটু জল খাবে মা? একটু ঠান্ডা লেমোনেড দেব?"

মৌনতা সম্মতি লক্ষণ জেনে ছুট্টে গিয়ে ফ্রিজ থেকে নিয়ে এসে টেবিলে রাখলো। বাথরুমে গিয়ে মা বমি করছে দেখে ডাক্তার কাকাইকে খবর দেবে বলে মোবাইলটা নিতে, অপর্ণা এসে ওটা নামিয়ে বললো, "তোর পরীক্ষা হয়ে গেলে আমরা দিল্লির ফ্ল্যাটে শিফট করবো।"
সাহস করে জিজ্ঞেস করতে পারলো না, "আমরা মানে কারা? ওরা দুজন, না তিনজন? না সবাই?"

ইশারায় অপর্ণা ওর হাত ব্যাগটা চাইলো। দুটো ঘুমের ওষুধ খেয়ে, চোখ বন্ধ করলো। অন্তরা জানে ওর মা তখনও জেগে তাও মশারি ফেলে, গুঁজে দিয়ে আলো নিভিয়ে চলে গেলো।

পাশের বাড়ির কার্নিশে একটা হুমদো হুলো "ঘ্যায়াও ঘ্যাঁও" করে কি যেন এক অলক্ষণে অশনি সংকেত দিতে দিতে এক লাফে কালো ঝোপের মধ্যে মিলিয়ে গেলো চোখের নিমেষে।

পর্ব ৩
প্রথম অধ্যায়

"হ্যালো "

"গোপালের মা! তোমার দিদিমনিকে একটু ডেকে দাও, বলো খুব জরুরি দরকার।"

"একটুকুন ধরো নি গো, আমি ডাকতেছি। ...অ দিদিমনি, ওপরের লাইন টা ধরো দিকি বাপু।"

"তুই আমার মোবাইলে ফোন করিসনা কেন ?"

"আমার পাড়া জানিয়ে প্রেম করতে ভালো লাগে।"

"চুপি চুপি ছাড়া প্রেম হয়না, ...স্টুপিড।"

"তোর মুখে স্টুপিডটাও স্মার্ট শোনায় আমার কানে।"

"অর্ণব! এবার গাঁট্টা খাবি, আমার মোবাইল নম্বরটা নিশ্চই সেভ করিসনা, তাই তো? আর এই বস্তাপচা ল্যান্ড লাইনটা তোর মগজে গাঁথা।"

"আর তুই যে অলরেডি সেন বাড়ির হবু বৌ ঠিক হয়ে আছিস তাই কি জানতিস?"

"ফাজলামো মারছিস? প্রেম নিবেদনটা আমি করেছি বলে, বাজিয়ে দেখছিস,নারে ?"

"কে প্রথম কাছে এসেছি?
কে প্রথম চেয়ে দেখেছি?
কিছুতেই পাই না ভেবে
কে প্রথম ভালোবেসেছি ই ই ?"

অন্তরা ওকে ব্রেক কষিয়ে বললো, "ডেফিনেটলি আমি, তুই না।"

“কেন বলছিস এ কথা?"

"আমি জেনে গেছি তুই সেদিন তড়িঘড়ি করে ক্যাথের সাথে দেখা করতে গেছিলিস।"

"আরে! তুই খামোকা চটছিস, এটা নিতান্তই জাগতিক ব্যাপার, প্রেমের ব্যাপারই না!"

"শাক দিয়ে মাছ ঢাকা যায়না রে।"

"সব দোষ আমার সাঁতারের ১০০ মি বাটারফ্লাই এর ইন্ডিয়া ন্যাশনালের ট্রফি - ওটা না পেলেই আর এ সবের ঝক্কি ছিল না। এখন তুই ই বল, ক্যাথের মতো হট গ্লু গানের শট পেছনে এগবার লাগলে ছাড়ানো কি অতই সহজ? তবে তুই নিশ্চিন্তে থাক আমার ভার্জিনিটির লকারের চাবি তোর বুক পকেটেই আছে, ক্যাথ কোনো দিন তার সন্ধান পাবে না , এক তুই যদি না নিজের হাতে তা হ্যান্ডওভার করিস।"

"তুই আয়, তোকে আজ কেমন তুলোধোনা করি দেখ।"

"আরে শাহাজাদী ! বাবার গাড়ি পেয়েছি, রেডি হ, বারাসাতের কালি পুজো দেখতে যাবো, সঙ্গে মায়ের দেয়া ২০০০ টাকা হবু বৌয়ের খাতিরদারির জন্য। এবার একটু হাস, সোনা... আমি দেখি।"

"প্লিস! আমাকে ঐসব সোনা, জান, বেবি এসব বলে ডাকিস না, আমার হাসি পায়।"

"তাহলে হিটলারনি বোমা বর্ষণ ছেড়ে, তুলো না ধুনে, হাসছেন? লক কিয়া জায়ে, আমি হাফ এন আওয়ার এর মধ্যে তোকে উড়িয়ে নিয়ে ফেলছি বারাসাতে।"

"তোর তো এখনো আঠারো হয়নি? লাইসেন্স পেলি কি করে?"

"ভুলে যাসনা আমি ব্রিটিশ সিটিজেন আর আমি তোর চেয়ে একবছরের বড়ো জানুয়ারিতে লন্ডন যখন গেছিলাম মাসির বাড়ি থেকে লাইসেন্স-এর পরীক্ষায় রীতিমতো খাতায় কলমে পাশ করেছি, তুই যে দেশে থাকবি মহারানী, আমি তোর বিনা মাইনের ড্রাইভার।"

"যাক শুনে নিশ্চিন্ত হলাম আজ জান নিয়ে বাড়ি ফিরছি, আর মরলেও শহীদ হয়ে যাবো, কেননা আমার ব্রিটিশ ড্রাইভারের হাতে মরনেও বিরাট সম্মান আছে, কি বলিস?"

"তুই শুধু শুধু ট্রাফিক বাড়াচ্ছিস, ফোন রাখ, রেডি হ, পাঁচটার আগে না পৌঁছলে, ভিড়ে কোনো ঠাকুর দেখতে পাবিনা।"

"তুই কি রং পড়ছিস ? আমিও তাই পড়বো।"

"যা পাবো তাই পড়বো তুই তাড়া তাড়ি কর।"

"বলনা, বাবা! "

"যা বলবো তাই পড়বি? পাক্কা?"

"পাক্কা।"

"মাকালী হয়ে আয়!"

"অর্ণব ! আমি তোকে চিবিয়ে খাবো।"

"বললাম, তোর স্বভাবের সাথেও খাসা মানাতো ড্রেস টা" - রাগে খট করে ফোনটা রেখে দিলো অন্তরা।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মেঘলা করে আছে সকালটা। মোবাইলের মেল চেক করে, হোয়াটসঅ্যাপ এর বক্সে ৫টা মেলের সংকেত দেখে বুকটা ধড়াস করে উঠলো, ক্যাথের। ভেতরে ঢোকার আগে, হাতটা কপালে, বুকে আর দুই কাঁধে ঠেকিয়ে চুমু খেয়ে, প্রথমেই গেলো অর্ণবের ছবিতে।

"ইপি পি পি পি " একটা গান, ..."ভালোবেসে সখি - নিভৃতে যতনে, আমার নাম টি লিখো -তোমার মনেরও মন্দিরে..."

গ্যা গ্যা গ্যা গ্যা' কম্পনে শিহরিত হোলো ফোনটা ... হোয়াটসঅ্যাপ একটা কল আসছে।!ধরতেই বাবার গলা - "হোয়াটস আপ, ইয়ং লেডি?"

"ড্যাড! আই নিড ইয়োর হেল্প।"

"মাই হোল লাইফ ইস ফর ইউ, ডার্লিং।"

"নো কিডিং, ড্যাড।"

"জাস্ট আস্ক মি, হাউ ক্যান আই, মাই বার্বি ডল?"

"হোয়াটস ডা মিনিং অফ দিস কাপল অফ লাইন্স?"

"আরে, এতো কেউ তোকে প্রেম নিবেদন করেছে, কে সেই সৌভাগ্যবান, শুনি?"

"ডিড ইউ রিমেম্বার, ডা গাই, হু গট ডা ফাস্ট প্রাইজ ইন সুইমিং লাস্ট ইয়ার?"

"আরে আমাদের মাচো স্টার, ডাক্তারের ছেলে, টিটো। ব্রিলিয়ান্ট! মাই সুগার বান!"

"ডু ইউ লাইক মাই চয়েস?"

"ভেরি গুড সিলেকশন, প্রাউড অফ ইউ, লিসেন ডার্লিং, আই হ্যাভ আ সারপ্রাইস ফ ইউ?"

"হোয়াট ইস ইট, ড্যাড ?"

"বলে দিলে কি আর সারপ্রাইস থাকবে রে, মা?"

"হিন্ট, প্লিজ! ড্যাডি, প্লিজ জ জ জ, ইউ ক্যান্ট ডু দিস টু মি!"

"ওয়েল, আই এম মিসিং ইউ।"

"দ্যাটস নট আ ক্লু?"

"ওকি টকি! গটা গো, কোম্পানির সি.ই.ও রা ওয়েট করছে রে সোনা, লাভ ইউ, বাই - সুগার বান!"

"বাই, ড্যাড।"

সারা ঘরটা খুশির সুগন্ধে মাতোয়ারা। কি অদম্য এক সুখানুভূতি, বাবাকে জানিয়ে মনটা আনন্দ গাগরী হয়ে চলকে-চলকে উছলাতে লাগলো। ওর মা ওকে যতই ধর্মে, ভাষায়, সংস্কৃতিতে ব্রিটিশ বানাতে চাক না কেন, মনে প্রাণে, ও বাবার মতোই খাঁটি বাঙালি। নিষ্ঠাভরে শুক্তনি আগে খেয়ে, ঝোলে, ঝালে, অম্বলে গুছিয়ে খেতেও জানে। শুধু বাংলাটা বুঝতে পারলেও বলতে পারেনা। ছোটো বেলায় মা বলার সুযোগ দেয়নি বোলে, যখন বড়ো হয়ে বলতে গেলো তখন ক' বলতে পারে না সব খ' হয়ে যায়।

আর ওর এই হরিবল জিভের জড়তা শুনে জ্যাঠতুত, খুড়তুতো দাদা দিদিরা হরি বোল! হরি বোল! করে, এমন পেছনে লাগতো যে বাংলা আর বলাই হলো না। খুব ইচ্ছে তাই বাবার মতোই পুরোদস্তর এক বাঙালিকে বিয়ে করে পরের প্রজন্মকে প্রকৃত বাঙালি করে ঐ দাদা দিদিদের নাক কেটে দেয়ার।

দৈনন্দিন জীবনের জাতাকলের ঘূর্ণিতে পাক খেয়ে ওর সেদিনের মাথা ব্যাথার কথাটা বেমালুম ভুলে গেলো, ক্যাথ। প্রেমের জোয়ারে গা ভাসিয়ে, কাব্যিক ছন্দে, ফোন টেনিসে চলতে লাগলো উদ্দাম নীল উড়ো চিঠিদের ধারাবাহিক টুর্নামেন্ট।

তৃতীয় অধ্যায়

গোপালের মা খেঁটে একটা ঝাঁটা দিয়ে ঘচর ঘচর করে পেছনের সান বাঁধানো দালানটা ধুচ্ছে। রামুদা গাড়ির ফুট ম্যাট গুলো ঝেড়ে গাড়িতে সুগন্ধি গুগ্গুল জ্বালিয়ে দিলো। দূরের মিষ্টির দোকানের জিলিপি ভাজার ঘিয়ের গন্ধ, ঘাড়ে করে এই পর্যন্ত নিয়ে আসছে বাতাস। মোড়ের কোণের তেকোনা বাড়িতে, প্যা পোঁ করে ভৈরব রাগের ভাঙ্গা সুরে একই লাইন "ধানা ধানা মূঢ়তা কৃষ্ণা মুরারি" অনলস প্রচেষ্টায় গেয়ে চলেছে এক কুমারী।

অপর্ণা রোজকার মতো খাবার টেবিলে ভাত বেড়ে দিলো কৌশিকের জন্য। এতো বড়ো একটা ঘটনা যে ঘটে গেছে তার সাক্ষী শুধুই অন্তরা, তাও সে কোনো প্রশ্ন করেনি, মাকে। অপর্ণা ভীষণ চাপা বলে পুরো জিনিসটাকে নিজের বুকের মধ্যে কবর দিয়ে দিয়েছে। দগদগে ঘা এর ওপরে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিব্বি চালিয়ে যাচ্ছে দাম্পত্যের নাটক। এই বয়সে শাশুড়ি মাকে আর কষ্ট দেবে না, এটাই তার মূল উদ্দেশ্য।
"দেখো! আমার আর কৃষ্ণার ছবি বেরিয়েছে, ওই যে পান পাতার ওপর ক্যান্সারের প্রজেক্টটা করেছিলাম, জাপানের সাথে। দেখো এখানে লিখেছে কত ভালো ভালো কথা।"

"ওহ! গুড। সেলিব্রেট ইট উইথ কৃষ্ণা- দেন।"

"জানো; কৃষ্ণা মেয়েটা খুব দুখী, খুব ব্রাইট। কিন্তু ওর স্বামী ভাগ্যটা খুবই খারাপ। জানো! ও আমাকে ভগবানের মতো শ্রদ্ধা করে, আর ও কিছু চাইলে, আমি না বলতে পারিনা, কেমন যেন মায়া...."

অপর্ণা নিজেকে আর সামলাতে না পেরে বাথরুমে ঢুকে জলের কলটা খুব জোরে খুলে হাউ হাউ করে খানিকটা কাঁদলো।

"তুমি চানে গেলে? তাহলে আজ রাতে ওকে ডিনারে বলবো?"

অপর্ণা চোখে মুখে জল দিয়ে, নিজেকে খানিকটা সামলিয়ে হাসি মুখে বললো, "বলোনা, তোমার যখন এতো মায়া ওর প্রতি, বেটার ঘরেই ডেকে তোলো ওকে?"

"মানে? তুমি কি রেগে আছো? আমি কি কোনো ভুল করেছি?"

"নাহঃ! অল গুড।"

"গোপালের মা কচুশাকে ইলিশের মাথা গুলো এই বেলায় দিয়ে দাও, রাতে একটু পায়েস কোরো, ফ্রিজের থেকে পাঁঠাটা বার করে, ছেড়ে গেলে একটু দই, রসুন, লঙ্কাবাটা, আর এক চা চামচ ভিনিগার দিয়ে ম্যারিনেট কোরে রেখো, আমি এসে ভিন্দালু করবো।"

"রামুদাকে দিয়ে মনজিনিস থেকে নোনতা প্যাটিস আনিয়ে নিয়ো, আসার পথে' আমি মেট্রোয় বেরিয়ে গেলাম।"

"খেলেনা?"

"নাঃ! আজ সোনার বাংলায় ক্লায়েন্টের সাথে লাঞ্চ আছে।"

"তুমি বান্ধবীকে যদি ওয়াইন খাওয়াও তো সেলারে আছে, খুব সম্ভবত ভালো শ্যাম্পেনও থেকে থাকবে একটা। আর যদি হুইস্কি খাওয়াও তো আসার পথে তুলে নিও।"

"এই যাহ! ওকে আমার বান্ধবী বলোনা, আমার বয়সের অপমান হবে, ও তো আমার হাঁটুর বয়েসী।"

দাঁতে দাঁত চিপে ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে গেলো শাশুড়িকে প্রণাম করে।

চতুর্থ অধ্যায়

সাই সাঁই করে গাড়ি ছুটলো ভি আই পি রোডের ওপর দিয়ে। হলদিরামের মুখে এসে অর্ণব বললো, "দাঁড়া গাড়িতে একটু পেট্রোল দিই।"

"তা পেট্রোল পাম্পের সামনে দাঁড়া, এখানে কি করছিস"?

"আরে ড্রাইভারের ইঞ্জিনে, গাড়ির নয়।"

"তুই শেষে নিজেকে আমার ড্রাইভার বানালি, কম সে কম সফার বল।"

"চলেন মেমসাহেব, বলেন তো লাল কার্পেট পেতে দেই, দেখেন বিবিজান কাদায় আপনার দুধ সাদা পেন্সিল হিল খারাপ না হয়ে যায়।"

"মারবো মাথায় এক গাঁট্টা, বয়েসে দশ মাসের ছোটো বোলে, লঘু জনের সাথে ইয়ার্কি হচ্ছে?"

"না বিবিজান! আপনি মনিব আছেন বটে, আপনি আমার গুরুজন ও বটে।"

"বটে ....." বলেই এক রাম চিমটি কেটে বললো,
"এই তুই থামতে কত নিবি?"

"কেনো তোর উত্তম কুমারের সব্যসাচী স্টাইলটা ম্যাটম্যাটে লাগলো? বলতো চেঞ্জ করে শাহ রুখ খান হয়ে যাই? দেখ এটা পছন্দ কিনা?
যা মিনকো আসমা বানাউ,
সীতারো সে সাজাউ,
আগার তুম কাহো ...
বল চলবে?"

"দৌড়োবে। এবার প্লিজ বি সিরিয়াস।"

"এই রে! আমি আমার বাবা ছাড়া আর কাউকে সিরিয়াস হয়ে প্রেম করতে দেখিনি যে, পরের বারে ডেটিংয়ের আগে বাবার পাঠশালায় নাম লিখিয়ে আসবো, এখন - নে! গরম গরম সিঙ্গারা আর কফি খা।"

"এই তোর কোন ভেজি সবচেয়ে ফেভারিট?"

"প্রেমের মধ্যে ভেজি এলো কোত্থেকে?"

"তোর নীল টিশার্টের ওপর লাল চিলি দুটোকে দেখে খুব তোকে খেতে ইচ্ছে করছে।"

"ঝাল খুব খাসনা, পরের দিন বাথরুমেই সারা সকাল টা কাটাবি; আমার প্রি এডভাইস, গুরুজনের কথা বাসি হলে মিষ্টি হয়, জানিস তো? ওকে! ব্যাক টু ইওর ভেজিস।... আমার লেডিস ফিঙ্গার খেতে খুব ভালো লাগে, দিবি তোর হাত দুটো? একটু চেকে দেখবো?"

"আমার উঁচ্ছে খেতে দারুণ লাগে, কেনো বলতো? নইলে তোর মতো একটা ঝালে পাতে তেতো ছেলের খপ্পোরে নিজেকে জড়াই?"

"ভেবে দেখ? এখনো তোর সিঁথি এবং শরীর - দুটোর কোনোটাই রাঙাই নি, তবে চ্যালেঞ্জ করছি, খেয়ে দেখিস, খুব মিষ্টি, একেবারে মহুয়ার মৌ এর মতো।"

অন্তরা লজ্জায় লাল হয়ে, চোখ নামিয়ে, কফির কাপে চুমুক দিলো।

পঞ্চম অধ্যায়

"সোনাগাছি থেকে যে স্যাম্পেল গুলো এসেছে ওগুলোর স্পার্ম কাউন্ট হয়ে গেছে, কৃষ্ণা?"

"হ্যাঁ স্যার! সবকটাই টোয়েন্টি মিলিয়ানের তলায়, আর ফ্লাজেলিক মুভমেন্ট গুলোও তেমন ভালো নয়।"

"তুমি নোট করো, আমার সেকেন্ড ইয়ারের জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ক্লাসটা নিয়ে আসি। আজ এক নতুন রিসার্চ স্কলার আসবে আই আই সি বি থেকে। ওকে লাগিয়ে দিয়ো হিমোসাইটোমিটারের ব্লাড কাউন্টিং এ। মন টা বড়ো কু গাইছে। তোমার সাথে কিছু কথা আছে।"

"আপনি ক্লাস সেরে আসুন স্যার, আমি একটা কেন দশটা কথা শুনবো।"

"সেই ভালো, তুমি ছাড়া কাকেই বা বলি? সবাই ব্যাস্ত, আমাকে শোনার অবকাশ নেই কারোর।"

নিজের মনে বক বক করতে করতে এগিয়ে গেলো ক্লাস রুমের দিকে।

দুই ঘন্টা পর ল্যাবে ফিরে দেখে কৃষ্ণা নেই। ব্যাগ ছাতা সব রাখা টেবিলে। ঐ স্কলার মনে হচ্ছে আজ ডুব দিয়েছে। মনে মনে বললো, "এদের মতো ফাঁকি বাজ সায়েন্টিস্ট দু চারটে থাকলে আর কোনো আবিষ্কার হবেনা এ দেশে।"

ইন্টারনেটে বেগম আখতারের গান চালিয়ে কানে হেড ফোন দিয়ে, চশমা খুলে, চোখ বন্ধ করলো-কৌশিক ।

"জোছনা করেছে আড়ি,
আসেনা আমার বাড়ি,
গলি দিয়ে চলে যায়,

লুটিয়ে রুপোলি সারি...."
একথা কৌশিকের কাছে স্পষ্ট যে অপর্ণা ওকে এভোয়েড করছে। কিন্তু কেন? সেদিন যে ভূত দেখেছিলো, সেটা কি সত্যিই অপর্ণা ছিল?

দরজা খুলে কৃষ্ণা ঢুকলো। "স্যার ! সেকেন্ড ইয়ারের কিছু স্টুডেন্ট ক্লোনিং বুঝতে পারছে না, আমি বুঝিয়ে দেবো?"

"না না ! আমার তোমাকে বড়ো দরকার তুমি বরং ওদের, আমার ঐ নতুন রিসার্চ স্কলার সুস্মিতার কাছে পাঠাও। চার তলার জি-সি ল্যাবে আছে, মাইক্রো ডিপার্টমেন্টে।"

"আচ্ছা।"

কৃষ্ণা ওদিকটা সামলে বেশ কাছে এসে বসলো কৌশিকের।
"কৃষ্ণা! হিসেবে সব গরমিল লাগছে, অপর্ণা সব জেনেগেছে, সেদিনের ভূতটা অপর্ণাই ছিল, বড়ো চাপা মেয়ে, সংসার আমার ভেঙে দেবে ও, আটকাতে পারবোনা, তোমার সাথে ঘর বসানোর সাহস বা মানসিক -শারীরিক সামর্থ, কোনোটাই অবশিষ্ট নেই। আমি খুব সাদাসিদে ভীতু প্রকৃতির মানুষ, সেদিন দুপুরে আনন্দে ডি জে সি পিটারক্যাট এ নিয়ে গিয়ে দুটো টেকিলা শট খাওয়ায়। রাতে কতকগুলো ওষুধ খাই সেগুলো খাওয়া হয়নি, তুমি যখন আমার কাছে এলে, এসে বললে। আমি সামলাতে পারিনি। আমায় ক্ষমা করো কৃষ্ণা।"

"এ কি বলছেন স্যার? আপনি আমার দেবতা, আমি আপনাকে পুজো করি, শ্রদ্ধা করি, সেই রাতে আমি হাজার জীবনের সুখ পেয়েছি, স্যার আমার কোনো জোর নেই আপনার ওপর। আপনার যেটা ঠিক মনে হয় সেটাই করুন।"

"আজ অপর্ণা তোমাকে আমাদের বাড়ি ডিনারে ডেকেছে, ফ্রি আছো? আমি সাথে করে নিয়ে যাবো, আবার, ঐ রামু তোমায় পৌঁছে দেবে।"

"আমাকে একটু আগে ছুটি দেবেন স্যার? প্রথম দিন আপনাদের বাড়ি যাবো একটু উপহার আর মিষ্টি কিনতাম।"

"এসবের দরকার নেই, তাও যদি তুমি মনে করো এই ফর্মালিটি প্রয়োজন আছে তাহলে যাও এখনই। আমি আজ একটু ক্লান্ত বোধ করছি। সুস্মিতা ফিরে এলে চলো আজ বাড়ি যাই।"

কৃষ্ণা চলে গেলো। মনটা কোথায় জুড়াই? কি যে এক পাপ করলাম? অপর্ণা তার কতো গুরু শাস্তি দেবে কে জানে? কৃষ্ণা চলে যাবার পরেও নিজের মনেই বকর বকর করতে লাগলো কৌশিক।

প্রথম অধ্যায়

অপর্ণা সোনার বাংলার লবিতে বসে। আজ সাথে ওর ল্যাংপট অলোককে নেয়নি। অলোক কাল রাতে তন্দ্রে নেচে,আজাদ হিন্দ ধাবায় খুব করে কষা মাংস আর রুটি খেয়ে, আজ ডুব। হ্যাং ওভার কাটিয়ে উঠতে পারেনি।
হোটেলের আলোআঁধারিতে ফটোশুটের মধ্যে একটা আলাদা মাদকতা আছে, সেটা ওর ক্লায়েন্টের সাথে আগেই কথা হয়ে গেছিলো। শুধু নীল একটা ফোল্ডিং ছাতা নিয়েছে, সিলিং লাইটের প্রতিফলন যদি খুব তীব্র থাকে আর প্রতিরোধকের ব্যবস্থা না থাকে, তাহলে ওটা দিয়ে ফিল্টার করে নীল রংকে ছেঁকে নেবে।

৬ ফুট ৫ ইঞ্চি। উন্নত নাসিকা, ফিনফিনে ফর্সা রং, মুখে চাপ দাড়ি। স্মিত হাসি দিয়ে হার্দিক করমর্দন জানিয়ে বললো, '"হাই ! আমি আদিত্য ব্যানার্জি, আপনি নিশ্চই অপর্ণা দেবী? প্লেজার টু মিট ইউ। আমি, কানসাস কনসালট্যান্সি ফার্মের কলকাতার এম ডি, আপনার সাথে আমার পি এ কথা বলেছে, আমি সাত দিন থাকবো এখানে, তারপর কানসাস ফিরে যাবো। আবার আসতে হতে পারে ব্যবসার সূত্রে। এখানে নতুন একটা ব্রাঞ্চ খোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমাদের কোম্পানি, যার গুরু দায়িত্ব আমার ঘাড়ে আপনি কিছু ড্রিঙ্ক নেবেন? না হলে আমরা ওপরে চলে যাই, কি বলেন?"

নিজের ঘরে নিয়ে এলো অপর্ণাকে। এখানে অপর্ণা আগেও এসেছে, কিন্তু এই ভি আই পি সুট এর এতো অভিজাত্য আগে দেখেনি।

অপর্ণা ক্যামেরার লেন্স গুলো লাগিয়ে, স্ট্যান্ড এ ক্যামেরা বসিয়ে, আলোর দীপন মাত্রা পর্যালোচনা করতে লাগলো। আদিত্য ছোটো একটা কোম্পানির মডেল নিয়ে কর্নার টেবিলে এসে বসলো।
কি মিষ্টি এক মায়াবী গন্ধ সারা ঘরে ম ম করছে। মাতাল করা মোজার্ট টিউন। তার মধ্যে শুরু হলো ক্যামেরার খেলা।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ক্যামেরার তালে, তাল মিলিয়ে ঠিক কখন মনের খেলা শুরু হয়েছে,তা অপর্ণার অজানা। হয়তো বা তার রিপু প্রতিরোধ ক্ষমতা আজ আদিত্য নামের ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত।
আজ যেন এ এক ভিন্ন অনুভূতি। বাঙালির বেশে এই রাজপুত্র কোথা থেকে এলো? এতো সুন্দর পুরুষ তো স্বপ্নেও ও দেখেনি সে কোনদিন। কিছু বোঝার আগেই বিশ্ববিদ্যালয়ের গন্ডি পেরিয়ে পাল্টি ঘর দেখে বাবা বিয়ে দিয়ে দিলেন। বনেদি পরিবার, আভিজাত্যের মোড়কে ঢাকা সবকিছু। রাতে শোবার সময়টুকুও চাকার দাঁড়িতে বাঁধা। নিয়মের জাতা কলে বাচ্চা হওয়া, দাম্পত্য প্রেমে ভাঁটা আসা সবই সয়েছে এই শরীর। এখন তো কৌশিকের পাশে শুতেও তার অনীহা। বিরক্তিকর নিয়মানুবর্তিতার আলিঙ্গন আর আস্ফালন, এতে সে বীতশ্রদ্ধ।
আজ এ তার শরীরে কিসের বান ডাকলো? দেহের নিম্নাংশের অপ্রতিকূল তরঙ্গের উচ্ছলতায় শরীর কাঁপছে।

"আর ইউ ম্যারেড?"

"হুম! ইউ?"

"এখনো মনের মতো সঙ্গিনী পাইনি, কিম্বা, বলতে পারেন ব্যাস্ততায় কারোর দিকে তেমন ভাবে তাকানোর সুযোগ হয়নি।"

অপর্ণা স্বাভাবিক কথা বলার ক্ষমতা হারিয়েছে। সারা শরীরে কাঁটা, অজানা আনন্দে হাইপোথ্যালামাস থেকে নেমে আসা, কোনোদিন না বেরোনো সেই আদিম রিপুর দুর্বার স্রোতের লাভায়, মন আজ আগ্নেয়গিরি। সাদা ফিনফিনে ঢাকাই মসলিন, ভেতরে সুস্পষ্ট পুরুষালি বক্ষ পেশির ওপর দিয়ে উঁকি দেয়া বাদামি লোমশ শরীর।

"ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড, ক্যান আই আস্ক আ লিটল ফেভার ফ্রম ইউ? অপর্ণা?"

"সার্টেনলি।"

"আমার না সারা দিনের ব্যাস্ততায় স্নান হয়ে ওঠেনি, একের পর এক মিটিং, এখন খুব ইচ্ছে করছে, আপনার মতো এতো সুন্দরী বাঙালি বধূর সাথে একটু গল্প করি, আপনার যদি বাড়ি যাওয়ার তাড়া না থাকে, মে আই অফার ইউ আ গ্লাস অফ ওয়াইন?"

"উম ! তাড়া যে ছিল না তা বললে ভুল হবে, তবে গল্পের প্রলোভন টাও বেশ মন্দ নয়, ঠিক আছে আমি বাড়িতে ফোন করে দিচ্ছি।"

"রেড অর হোয়াইট?

"চিলড হোয়াইট, প্লিজ।"

"থ্যাংকস আ লট, ফর টেকিং মাই রিকোয়েস্ট, গ্রান্টেড এটা বারো বছরের পুরোনো ওয়াইন। ইউ মে লাইক দা থিকনেস, নেক্সট টাইম, ইফ উই মিট এগেন, আই উইল অর্ডার আ রেয়ার ওয়ান, অন ইয়োর ওনার।"

"মাই প্লেজার।" অপর্ণা মনে মনে ভাবলো, ভদ্রলোকের ও তার মানে ওকে বেশ পছন্দ হয়েছে। সামনের আয়নায় নিজেকে দেখলো সে, কেনো নয়? এখনো সে যে কোনো যুবতী অবিবাহিত মেয়ের ঈর্ষার কারণ হতে পারে, বাজি রেখে।

অপর্ণার সামনে সাদা আঙুরের রসের বোতলটা গলা পর্যন্ত ডুবে আছে বরফের ছোট্ট কাঁচের বালতিতে। ঠান্ডা বরফের মধ্যে ওর সরু সরু আঙ্গুল গুলো ঢুকিয়ে কানে

ঠান্ডা স্পর্শ দিলো। কান দিয়ে গরম ভাব বেরোচ্ছে। বোতলের সিলটা ওর সামনেই খুলেছে বলে সন্দেহর অবকাশ নেই, নইলে মনে হতো তার শারীরিক অসুস্থতার জন্য এই মাদকদ্রব্যই দায়ী।

"প্লিজ,হেল্প ইওরসেল্ফ" বলে আদিত্য কাঁচের দরজার পেছনে মিলিয়ে গেলো।

গুনগুন করে ফ্রেঞ্চ ভাষায় গান গাইছে,সে। দুর্নিবার প্রচেষ্টাতেও বসে থাকতে পারলোনা, অন্তরা। গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে গেলো, আদিত্যর সম্পূর্ণ শরীর দেখবে বলে। ভারী কালো পরশ্মিনার পর্দার পেছনে তৃষ্ণার্ত দুটি চোখ, নিথর দেহ, শরীরে বয়ে চলেছে অমৃতের ধারা, শাড়ির আঁচলটা পেছনে ঘুরিয়ে টেনে নিলো,যাতে কেউ ভিতরের বন্যার খবর ঠাহর করতে না পারে। অবলোকন করতে লাগলো একএক অঙ্গের একএক রোমাঞ্চ। বাথটাবে দাঁড়িয়ে হাত ওপরে তুলতেই পেশির ভাঁজে উঁকি দিচ্ছে গ্রীক স্থাপত্যের নিপুন নিদর্শন।
অন্তরা এইসব প্রাণভরে দেখে, লক্ষী মেয়ের মতো নিজের ক্যামেরার পাশে ফিরে এলো। কখন অর্ধেক বোতল গলায় ঢেলেছে, জানে না সে।

তৃতীয় অধ্যায়

হলদিরাম থেকে বেরিয়ে অন্তরা আর অর্ণব গাড়ি ছোটালো বারাসাতের দিকে। শেঠপুকুর, কে এম সি, কে এম সি রেজিমেন্ট,নতুনপুকুর,বারোহাত কালি দেখে ফেরার মুখে অন্তরার বায়না, "চলনা, দেগঙ্গায় যাই ?"

"কি আছে সেখানে?"

"আমার মামার বাড়ি"।

"এই রে ! তোর মামা রা যদি আমায় ধরে পেটায়, যদি বলে ভাগ্নিকে ইলোপ করে নিয়ে এসেছি, তখন?"

"মারবো এক গাঁট্টা, নিয়ে যাবি কিনা বল?"

"আড্রেস বল,জি পি এসে দেই, জি পি এস মেমসাহেব রাস্তা চিনলে যাবি, আর নইলে গাড়িতেই কাটবে রাত, গাইবো আমি, এই রাত তোমার আমার, এই গাড়ি তোমার আমার।"

"আবার ফাজলামো, আমি রাস্তা চিনি, চ।"

"হরি দিনতো গেলো সন্ধে হলো প্রাণ নিয়ে বাড়ি ফেরো ও ও ও, আটটা বাজে, তোর মামী রা যদি খুব দয়ালু হন তাহলে, খেতে পাবো, নইলে হরিমটর, বাড়ি ফিরতে বারোটা।"

"কেনো? তোর মাম্মী যে দুহাজার টাকা দিলো, সেটা পকেটে পুড়ে ক্যাথের ভোগে লাগানোর ধান্দা, নারে? আমি সব বুঝি। আমি তো ঘরের লোক, তোর ন্যাপি ফ্রেন্ড, তাই ফ্যালনা, হট গ্লু গান এর ছ্যাঁকাও দিতে জানিনা।"

"আরে তুই হোলি আকবরের যোধা বাই, বাকি সব এলে-বেলে বাই, এক দিকে হাই আরেক দিকে বাই -বাই।"

আধ ঘন্টার মধ্যে ওরা পৌঁছে গেলো দেগঙ্গায়। চারিদিকে পুজোর আমেজ। বাজি ফুটছে,মেলা বসেছে,ভ্যান রিকশায় প্যাঁপো প্যাঁপো কোলাহল ঠেলে ওরা পৌঁছে গেলো অন্তরার মামার বাড়ি। বাড়ির সদর দরজার পাশেই গোয়াল ঘর, সেখানে ঢুকে অন্তরা পিঙ্গি বোলে এক জার্সি গরুকে আদর করলো, গরুটা চেটে দিলো অপর্ণাকে, অর্ণব যেতেই অনধিকার প্রবেশ বলে, বিদ্রোহ জানালো। পর পুরুষের হাতের ছোঁয়া পিঙ্গির অপছন্দ।

মামা মামী সব ভ্যান ভাড়া কোরে ঠাকুর দেখতে বেরিয়েছে। অন্তরার দিদা বেরিয়ে এলো। খুব পুরোনো দালান বাড়ি। দুজনকে দুটো ডাব কেটে দিলো নূরনাহারের মা। দিদার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলো ওরা। দিদা কথা ইশারায় বলেন। অর্ণবের মনে হলো উনি বোবা, পরে জানলো ওনার থাইরয়েড গ্ল্যান্ডের অপারেশনের পরে গলার স্বর এতো ক্ষীণ, যে উনি কথাই বলা ছেড়ে দিয়েছেন। সারাদিন ঈশ্বর চেতনায় মগ্ন। একধরণের বানপ্রস্থ কাটাচ্ছেন, সংসারের এক কোণে বসেই। দালানের একপাশে দীপান্বিতা লক্ষী পুজোর আয়োজন। সিঁড়ির তলায় ঢিপিদেয়া চালের বস্তা। দূরে পুকুরের ধারে রেডিও চালিয়ে বাসন মাজছিল কেউ,

হারিকেন নিয়ে ছুটে এলো - "অ মা, অন্তু দিদি যে কত্তো বড়োটি হৈয়েগেছো গো, মা আসলেন নি ক্যানে? তুমি একা একা এইচ এদ্দুর, ঐ খোকাবাবুর সাথে?"

অন্তরা হাসলো। অর্ণব অপ্রস্তুত হয়ে খোকাবাবু শুনে গলা খাকরানি দিলো।
"আজ থাকবেনি গো? কচি পাঁঠার ঝোল আর নতুন চালের ভাত হচ্ছে। এসোনা না এদিকটায়, আমরা একটু গপ্পো করি। কদ্দিন পর তোমায় দেখলুম গো, ঠিক মায়ের মতোই সুন্দরী হয়েছ।"

কাঠের জালে রান্না হচ্ছে। বড় লোহার কড়াই। আগুনে কিছু ঘুঁটে ভেঙে দিলো। এইরকম রান্নার সুগন্ধ খুব কম শুঁকেছে অর্ণব।
অন্তরা বললো, "না গো দীপাদি, আমাদের যেতে হবে। মামারা, ভাই বোনেরা এলে বোলো আমরা এসেছিলাম।"

“দ্যাকো দেকি, আমাদের একটুকুন খবর করি যদি আসতে, তাহলে, এরকমটি হতনী।"

"এইতো বেশ হুট বলতে ছুট, চলে এলাম, আমরা আজ অসিগো দীপাদি। অনেকটা পথ যেতে হবে।"
দিদাকে আবার প্রণাম করে বেরিয়ে আসবে ওরা, এমন সময় অন্তরার দিদা ইশারায়, নূরনাহারের মা, একটা থলে অন্তরার হাতে ধরিয়ে দিলো। উঁকি মেরে অন্তরা দেখলো, আলতা, সিঁদুর, শাড়ি, খই মুড়কি, সন্দেশ, নাড়ু, আরো কত কি।
"পুজোতে তো পাঠিয়েছ, আবার ক্যানো?"
দিদা আর কোনো কথা না বলে জপের মালা জপতে জপতে চোখ বন্ধ করলো। অন্তরা হাসি মুখে আর আপত্তি না বাড়িয়ে, বেরিয়ে এলো।

অর্ণব গাড়িতে স্টার্ট দিতে দিতে জিজ্ঞেস করলো,
"এই তোর মামার পরিবার কি ঘটোৎকচ বা ভীমের আত্মীয় হয়? ওই এক কড়াই মাংস, আর ঐ অত্ত বড়ো বাঘা হাঁড়ি তে ভাত খায়?"

অন্তরা জোড়ে এক চিমটি দিয়ে বললো, "হবু মামা শশুর দের খোঁটা দিসনা, কেমন জামাই রে তুই? বিয়ের পিঁড়িটা তো ওরাই ধরবে, বর বড়ো না -কনে বড়ো তে, আমাকে তোর মাথার ওপরে তুলতে গেলে, শক্তির দরকার বুঝলি, এইসব তোদের মতন ফুটুঙ ফাটাঙ মাসেল ভাজা শরীর নয়, রীতি মতন গায়ে গতরে, ফসল ফলানো শরীর।"

হাসির বন্যায় দুজনে গা ভাসিয়ে, মুড়কি আর সন্দেশ খেতে খেতে গ্রাম ছেড়ে শহরের দিকে গাড়ি ছোটালো।

চতুর্থ অধ্যায়

ফেসবুক মেসেন্জারের রুপোলি পর্দা। অর্ণবের লেখা গুলোয় কি যেন এক মোহ আছে,সহস্র বার পাঠনেও যেন মন ভরে না ক্যাথের। মনের আশালতায় কেউ যেনো এক কোপ বসালো, ফেসবুক নামক সোশ্যাল মিডিয়ার এই ছবিটা।
অন্তরার পেজে ওদের দুজনের ছবি দেখে রেগে মেগে ওকে আনফ্রেন্ড করলো, ক্যাথ। ভেতরটা লাভার মতো ফুটছে। অর্ণবকে ফোন করলো, "হেই বেব, হাউ আর ইউ ডুইং?"

"হাউ কুড ইউ ডু দিস টু মি?"

"হোয়াট হ্যাভ আই ডান রং?"

"ইউ ওয়েন্ট টু বারাসাতের কালি পূজা - উইথ অন্তরা, উইদাউট টেলিং মি?"

"কেনো বেব, তুমিও যেতে আমাদের সাথে?"

"ইউ গাইস আর ইন লাভ ?"

"এটা তোমার প্রশ্ন? না উত্তর? আই ক্যান এক্সপ্লেইন এভরিথিং। বিলিভ মি - আমি ইনোসেন্ট।"

"জাস্ট কাম হিয়ার রাইট নাউ।"

"এখুনি? আমি তো আন্দিস এ আছি, বস ?"

"গেট ড্রেসড, এন্ড কাম, মাই ড্যাড্স ফ্ল্যাট ইস নট ফার ফ্রম ইয়োর প্লেস।"

"জো হুকুম জাহাপনা, এড্রেসটা টেক্সট করতে ভুলো না, আর মাথায় জল ঢালো।"

খট করে ফোন রেখে দিলো ক্যাথ। আয়নায় দাঁড়িয়ে খুব কাঁদলো। তারপর সোজা শাওয়ারের তলায় দাঁড়িয়ে শরীর ঠান্ডা হোলো। মনে মনে ভাবলো, ও একটু বেশিই অভিমান করছে, ওরা একে অপরকে, ছোট বেলা থেকে চেনে, একসাথে ঠাকুর দেখতে যেতেই পারে। আসতে আসতে মাথা থেকে রাগের বুদবুদ গুলোর বিস্ফোরণ বন্ধ হয়ে, মন জ্বালামুখীর লাভা শুকিয়ে রঙিন মনি মুক্তোর মতো চক চকিয়ে উঠলো।
গার্লস এলাউড এর নো গুড এডভাইস চালিয়ে, ড্রায়ার এ চুল শুকাতে লাগলো। ফোনে একটা বড়ো স্টোন বেকড পিজ্জা অর্ডার দিলো, বিকেলের অতিথিটির জন্য। সূর্যটা মেঘের পেছনে অস্ত যাবো যাবো করছে। লাল সিঁদুরে মেঘ, মায়াবী পৃথিবী, বারো তলার পেন্ট হাউস। বারান্দায় ভেসে আসা বিসর্জনের বাদ্দির আওয়াজ। বিটোফানের সুরোধনিতে ডোরবেলের কম্পন। ঘরেতে ভ্রমরের প্রবেশ হলো গুনগুনিয়ে। ঢুকেই ক্যাথ কে নাটকীয় ভাবে জড়িয়ে ধরলো।
ক্যাথ হাসি মুখে মুখ গুঁজলো অর্ণবের বুকে।
"মানে? তুমি গলে গেছো? আমি তো ভাবলাম তোমাকে গলাতে অক্সি এসিটিলিন ফ্লেম নিয়ে আসতে হবে।"

"আই আন্ডারস্ট্যান্ড, ইউ গাইস ওয়ের ফ্রেন্ডস বিফোর আই কেম ইন্টু ইওর লাইফ।"

"তোমাকে আমি দুটো চুমু দিলাম, একনম্বর আমার হয়ে, দুই নম্বর অন্তরার হয়ে।"

অন্তরার দিকের চুমুটা ঘষে তুলে দিয়ে বললো, "আই হেট হার।"

"কেন গো?"

"সি ইস টেকিং ইউ এ-ওয়ে ফ্রম মি।"

"নাহঃ গো! তুমি হোলে আমার রাধা। আমি তোর খুঁটিতে বাঁধা ছাগল, যা দেবে তাই খাবো - জুতো, মোজা, পাতা, কাগজ সব এক নিমেষে পেটের ভেতর তার পরেই ব্যা ব্যা ব্ল্যাক শিপ গান ধরবো।"

বিটোফেনের সুরে পুনর্বার দরজায় করাঘাত, পিজ্জা হাজির।
"চা খাবে, না ড্রিঙ্কস দেবো?"

"কি আছে তোমার বাবার সেলারে?"

"হ্যাভ ইউ এভার টেস্টেড ইজারা ফিফটি ফোর?"

"আরে গেলো বছর ওটা বেস্ট ককটেল স্পিরিটের প্রাইজ পেয়েছে না?"

"ডটস রাইট। ড্যাড বট ইট ফ্রম নাইস।"

"আড়িব্বাস ঘ্যামা গ্লাসগুলো তো, তুমি আছো বটে, সাহাজাদির মতো, বাবা কামাচ্ছে, বেটি ওড়াচ্ছে, আমার বাপ-মা শুধু গুঁজছে, আমার ভবিষ্যৎ, আরে যৌবন গেলো ধুলোয় লুটে, বৃদ্ধ বয়েসে সবুজ বাতি জেলে কি যে ছিড়বো, কে জানে?"

"এনজয় ম্যান-চিয়ার্স!"

"উল্লাস – আচ্ছা তুমি তোমার বাবার টাইটেল নিলে না কেন?"

"মাই মম ওয়ান্টেড টু রিমুভ অল মেমোরিস অফ মাই ফাদার্স সাইট, সো শি টুক মি টু ব্রিটেন এন্ড, গেভ মি এভরিথিং, বাট আই লাইক মাই ড্যাড, এন্ড ডিসাইডেড টু স্টে উইথ গ্রান্ড পেরেন্টস। দেন মাই মম কাম হিয়ার, বিকস শি কুডোনট লিভ উইদাউট মি। কোর্ট থেকে পারমিসন নিয়ে আমায় কাস্টডি নেয়।"

"এইতো কেমন গড়গড়িয়ে একখানা গোটা লাইন বললে কলকাতায় অত ইংলিশের ফুলঝুড়ি ছুটিও না, বরং বাংলা বলো।"

"তুমি কি শেখাবে আমায়?"

"আরে সেই জন্যই তো সাঁতারে চ্যাম্পিয়ান হলাম, তোমাকে মেডেল করে গলায় ঝোলাবো বলে।"

"চলো বেডরুমে যাই।"

"আমার সাথে অন্য কিছু করিস না যেন? পিজ্জা খাইয়ে, ফ্রেঞ্চ ইস্পিরিট খাইয়ে, বদমতলব থাকলে বলে দাও – আমি হাওয়া হই?"

"কামন, অর্ণব - তুমি আমাকে এইটা পড়ে শুনাও, ড্যাড শুরু করেছিল, শেষ হয়নি।"

"এতো রামকৃষ্ণ কথামৃত! তুমি তো আমায় মারবেগো, বেডরুমে, এইসব পরবো? 'ভগবান ! তুমি যুগে যুগে দূত পাঠিয়েছো বারে বারে' - কেনো এতো ছিটিয়াল এই সংসারে? এটা পড়ার কন্ডিশন আছে, জানো তো? আর তোমার গায়ে হাত দেয়া যাবে না। দাঁড়াও ভালো করে একটা পাপ্পি দেই তোমাকে তারপর ধর্ম কর্ম হবে, আমি তো মানুষ, এতো বড়ো রাজত্ব, রাজকন্যা, পেয়ে ছেড়ে দিলে, লোকে ক্ষ্যাপা বলবে। তারা বলে গেলো ক্ষমা করো মোরে।"

"উঁ উঁ উঁ - ছাড় এবার!"

"কিরে আজ তোমার বোমে বারুদ নেই নাকি? জ্বলছ না যে? তুমি কি এখনো রেগে?"

"আই এম ফাইন, থ্যাংকস। শুরু করো, পড়া।"

আসতে আসতে সূর্য ডুবে গেলো। উঠে ক্যাথ ওর ঠাকুমা-দাদুর র ছবির সামনে চারটে ধূপ কাঠি আর কুঁদো লাল রঙের পিলসূচে বাঘা একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে দিলো। স্বর্গীয় পরিবেশে -শুদ্ধাচারে কথামৃতর অধ্যায় দৈবিক সুরে উচ্চারিত হতে লাগলো। পশ্চিমের আকাশ বাতাস সেই ছন্দে, আজ পবিত্র। বাতাবরণে অন্য অচেনা এক দ্যুতির প্রতিফলন। ক্যাথের বাঙালি - ব্রিটিশ মিশ্রিত তনুর বিপুল সৌন্দর্যের ডালি সেই দ্যুতির রক্তিম আভরণে আচ্ছাদিত হলো।

পঞ্চম অধ্যায়

কৃষ্ণা ঘরে ঢুকে দরজার পাশে জুতো, ছাতা রেখে, ব্যাগ থেকে মিষ্টির প্যাকেট বের করে কৌশিককে ইশারায় জিজ্ঞেস করলো,
"মাসিমার ঘর কোনদিকে?"
চোখ বন্ধ করে জপের মালা জপছেন কল্যাণী। বিদেশি গন্ধ পেয়ে চোখ খুললেন। কৃষ্ণা মিষ্টির প্যাকেটটা খাটের পাশের টেবিলে নামিয়ে, একটু সংকোচের সাথে সাহস করে এগিয়ে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল। মাথায় হাত বুলিয়ে, থুঁতনিতে হাত ছুঁইয়ে চুমু খেলেন কল্যাণী। ইশারায় বসার ঘরে বসতে বললেন।

কিছুদিন যাবৎ উনি মৌন ব্রত নিয়েছেন। গেলো বছর কামাক্ষার মন্দির দর্শনের পরে এক সাধুবাবার সাথে আলাপ হয়, সেই সাধুবাবার গুহা বেশ খানিকটা দূরে উঁচু পাহাড়ের উপর। ঐখানে একদিনের দীক্ষায় তাঁরা গুরু এবং শিষ্যা। উপদেবীরা নাকি ঘুরে বেড়ায় সেই পাহাড়ে। এই ঘটনার পর থেকে কথা প্রায় বলেন না বললেই চলে। কথায় নাকি শক্তিক্ষয় হয়। কৃষ্ণাকে সোফায় বসিয়ে এই গল্পটা অন্তরা বলে শোনালো।

অল্প সময়েই কৃষ্ণার সাথে অন্তরার খুব বন্ধুত্ব হয়ে উঠলো। গোপালের মা লাও-পালার দামি সেটে চা আর মনজিনিস প্যাটিস পরিবেশন করলো।

অন্তরার বিজ্ঞানের কোচিং ক্লাস আছে বোলে, রামুদা ওকে নিয়ে চলে গেলো।

কৌশিক অনেক বার অপর্ণাকে ভয়েস মেল পাঠালো। কিন্তু প্রত্যুত্তরে কোনো সাড়া পেলোনা। অবশেষে ক্লান্ত হয়ে বললো, চলো কৃষ্ণা আমাদের ছাদের বনসাই বাগানটা তোমাকে দেখাতে নিয়ে যাই।

এমন সময় গোপালের মা রান্না ঘর থেকে বার্তা দিলো,
"বৌদিমনি এটকে গেইচেন কাজে, আমাকে রান্না শেষ করে, আপনাদের খেতি দে দেতে কৈচেন "।

"ওহ! ও বোধহয় বড়ো কোনো শ্যুটে আটকে গেছে, বড্ড খুঁতখুঁতে তো, কাজ ১০০% নিখুঁত না হলে, ওর শান্তি নেই।"

কি জেনো এক দ্বন্দ্ব, মানসিক যন্ত্রনা - গুবড়ে পোকার মতো কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে কৌশিকের হৃদিকন্দরকে। বিভ্রান্ত দেখাচ্ছে কৌশিককে। কৃষ্ণা কোনো কথা না বোলে ওপরে উঠে এলো, কৌশিকের দেখানো পথ ধরে।

"বলো তো কৃষ্ণা, সেদিন তো আমি তোমার গোপন স্থান স্পর্শ পর্যন্ত করিনি, তাহলে অপর্ণা এতো অভিমান কেনো করছে আমার ওপর? সেই বললো তোমায় আসতে, আর নিজে বাড়ির বাইরে। আমার তো বয়স হচ্ছে, তুমি আমার দেহে যে কামের বহ্নিশিখা জ্বালিয়েছিলে সেদিন, তাতে আমি সাড়া দিয়েছিলাম মাত্র। এখন সেই ক্ষনিকের আনন্দের বিদ্যুৎ, যে বজ্রাঘাত আনলো আমার সোনার সংসারে, এই দাবানল নেভাই কি ভাবে? বলতে পারো, কৃষ্ণা?"

"আমারই ভুল হয়েছে স্যার, সেদিন আমার আপনার প্রতি দুর্বল হওয়াটা উচিৎ হয়নি। আমার বিয়ের পরে বর পেটাতো। আপনি সবই জানেন। একদিন রাতে, লুকিয়ে হিরণ্ময়ী ছাত্রী ভবনে চলে আসি। আমার বাপের বাড়ি, শ্বশুর বাড়ির কেউ জানত না আমি কোথায়। কেউ কোনো খোঁজও করেনি। মাকে গোপনে চিঠি লিখে সব জানাই। আপনার কাছে যেতে আপনি আমায় আপনার ল্যাবে নেন। আপনার উদ্যোগেই নেট পাই, আপনার দয়াতেই পুষ্পিতা দিকে বলে হোস্টেলের ঘর পাই। হোস্টেল সুপার পুষ্পিতাদিকে আপনি না বললে আমি কি বালিগঞ্জ ফাঁড়ির মতো জায়গায় থাকতে পেতাম সেদিন ? আপনার দয়ায় বেঁচে আছি স্যার। আমাদের রিসার্চ আজ যে জায়গায় পৌঁছেছে, আপনার সাথে আমার ছবি খবরের কাগজে ছাপছে, এই সব কিছু শুনে, মার সেদিন চিঠিতে লেখে - "আমি যেনো খুব দামি একটা উপহার আপনাকে দিই এর প্রতিদানে।"
আমার কাছে আমার সবচেয়ে দামি যে জিনিসটা ছিলো, বহু অত্যাচারেও আমার স্বামী যা নিয়ে নষ্টামী করতে পারিনি তাই দিতে চেয়েছিলাম আপনাকে। আজ প্রায় পাঁচ বছরের ওপর হয়ে গেছে,পুরুষ দেহ পাইনি। সুপ্ত আদিম রিপু সেদিন কালনাগিনীর ফণা তুলে ছিল, বহু বারণ সত্ত্বেও দমন করতে পারিনি স্যার। আপনি আমায় ক্ষমা করুন" বলেই পায়ে হাত দিয়ে হাউ হাউ করে কেঁদে ফেললো কৃষ্ণা।

কৌশিক, কৃষ্ণার মতো এমন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মেয়ে খুব কম দেখেছে তার জীবনে। মাস্টার্স করতে আসত সেই বনগাঁর প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে। প্রথম থেকেই ওর প্রতি একটা আলাদা মায়া ছিল কৌশিকের। অনেক দিন কৃষ্ণাকে শুধু জল খেয়ে টিফিন বেলা কাটাতে দেখেছে কৌশিক। একেক বার ক্যান্টিনে পয়সা দিয়ে কৃষ্ণাকে ধরে মাছ ভাত খাইয়েছে সে জোর করে। খাতা কলম, নোটস যাবতীয় দিয়ে, জোর করে এম এস সি পাস করে অনেকটা কৌশিকেরি কৃপায়। শেষ মৌখিক পরীক্ষার দিন ফোন করেছিল কৃষ্ণা, "স্যার আজ আমার বিয়ে।"
চুপি চুপি ভাইভার মার্কস দিয়ে রেজাল্ট বের করে দেয় কৌশিক। বালিগঞ্জ সায়েন্স কলেজ স্বতঃস্ফূর্ত বিশ্ববিদ্যালয় বলে, আর কৌশিকই তখন হেড অফ দা ডিপার্টমেন্ট ছিলো বোলে কোনো বিপদে পড়েনি সে। আজ কৃষ্ণা কৌশিকের সবকিছু। এতো মেধাবী মেয়েদের বাবা মা যে কেন আরেকটু সুযোগ দেয়না আমাদের পোড়া দেশে? কবে যে কৃষ্ণার মতো হতভাগীরা মাথা তুলে আর পাঁচটা দেশের সুস্থ মেয়েদের মতো সমান সুযোগ সুবিধা পাবে তা কে জানে?

সূর্যাস্তের অস্ত রাগে আজ কৃষ্ণার প্রতি শ্রদ্ধা দশগুন বেড়ে গেলো কৌশিকের।

"ওঠ পাগলী মেয়ে, আমার বুকে আয়রে, যতদিন আমি বেঁচে আছি তোর কেউ কিচ্ছু বাঁকা করতে পারবেনা রে - সেদিন যা হয়েছে, তার সাক্ষী ঐ ওপরওয়ালা, মিথ্যে ভয় পাসনা, চোখ মোছ, তোরা হলি আগুন, আর আমরা ঘি, পাশাপাশি থাকলে জ্বলবেই, এবার থেকে আমাকে বরং ফ্লেমেবল ক্যাবিনেটে বন্দী করে রাখবো, তুই যতই জ্বলিস না কেনো আমি তো বন্দী, তাই আর রিএকশন হওয়ার চান্সই নেই - কি বলিস? এখন হাস - আয় আমি তোকে আমার কমলালেবুতে কেমন "ক্যালি ফক্স" বায়োকেমিক মেডিসিন দিয়ে লেবুর বাম্পার ফলন ফলিয়েছি দ্যাখাই তোকে।"
কৃষ্ণা মিষ্টি হেসে কৌশিকের পায়ে পা মেলালো।

পর্ব ৫

প্রথম অধ্যায়

অপর্ণা সোফায় শুয়ে আছে, আদিত্য ডাকাতের মতো এসে, দুঃসাহসিক ভাবে ওর পায়ের বুড়ো আঙ্গুল থেকে মাথার চুল পর্যন্ত আর পথে যা যা পেলো সব জায়গায় চুম্বনে ভরিয়ে দিলো। অপর্ণা চোখ বন্ধ করে তা অনুভব করতে লাগলো। কখনো চুম্বনের ফাঁকে মৃদু মন্দ কামড় বসালো তার নারীত্বের সবচেয়ে স্পর্শ প্রবন জায়গা গুলিতে। আরামে মুখের থেকে বেরোচ্ছে শুধু গোঙ্গানি। এতো সুখ যে এক দেহে পেতে পারে মানুষ তা আগে তার জানা ছিলো না।

আদিত্য ওর সাড়া দেহে একটা ব্রাশ দিয়ে উত্তপ্ত গরম চকোলেটের প্রলেপ লাগিয়ে দিলো। তার পর সারা গায়ে চেটে চেটে সবটা পরিষ্কার করে দিলো। যেই না অপর্ণা ওর সুস্পষ্ট পেশী গুলো জড়িয়ে ধরতে গেছে, অমনি আদিত্য, "অপর্ণা দেবী" বলে ডেকে উঠতেই ধড়মড়িতে উঠলো অপর্ণা।

লজ্জায় লাল হয়ে গেলো। ঘুমিয়ে পড়েছিল সে। আগের দিন রাতের নেয়া ঘুমের ওষুধের রেশ আজও আছে ওর শরীরে।

"ক্ষমা করবেন, মিস্টার ব্যানার্জি।"

"আরে ছি ছি, ক্ষমার কি আছে? আমিই তো বরং আপনাকে শুধুশুধু আটকে রেখে দিয়েছি, নইলে এতক্ষনে আপনি বাড়ি গিয়ে, নিজের বিছানায় আরাম করে শুয়ে আছেন।"

"ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড, ক্যান আই প্লিজ ইউস ইয়োর রেস্ট রুম।"

"সার্টেনলি, গিয়ে লেফট হ্যান্ড সাইড।"

অপর্ণার কল্পনার কালো পর্দাটা নেই, বাথটাবটাও শুকনো, তার মানে আদিত্য পাশের কাঁচ ঘেরা স্নান কক্ষে স্নান করেছে। পুরোটাই অপর্ণার কল্পনা। বাথরুমটা ভারী সুন্দর। ঠিক যেন একটা ডোরাকাটা জেব্রা। বাথটাবের দুইপাশে গদার মতো দুটো মোটা কালো মোমবাতি। কি সুন্দর অর্কিড দিয়ে সাজানো। সাদা তোয়ালেগুলো দিয়ে হাঁস বানিয়েছে হাউস কিপার। কমটের সিটে টিস্যু পেতে বসলো। একটু সূচি বাই গ্রস্থ সে, এতো পরিষ্কার টয়লেটেও টিস্যু ঠিক পাতা চাই তার।

তলপেটটা ব্যাথা করছিলো। দুপুরের চিলিচিকেনটা ভালো ছিল না। হাতের তরল সাবানটা নিউ ইয়র্কের। স্ট্রওবেরির মিষ্টি গন্ধ। তোয়ালের হাঁসটাকে নষ্ট না করে ফেসিয়াল টিসু দিয়েই মুছলো। টিস্যুগুলো যেন কাপড়ের তৈরি - কি নরম!

মুখে চোখে জল দিয়ে, ফ্রেশ লাগছে। লাকমির নতুন ওয়াটার প্রুভ মাস্কারাটা সত্যিই ভালো। ভেজা চোখ দুটোয় ওকে আরো সুন্দরী লাগছে। শরীরের যেখানটা আদিত্যর গায়ের সাথে লেগেছিলো ধড়মড় করে উঠতে গিয়ে - সেখানটায় খুব যতনে একবার হাত বুলিয়ে, বেরিয়ে এসে স্বাভাবিক হলো।

আদিত্য খুব সুন্দর এক হাসি দিয়ে বললো, "আমি স্যুট পড়েনিলাম, আপনি আমার জাস্ট আপার পোরশনের ছবি তুলে, কোম্পানির বিল্ডিং প্ল্যানটাকে ফোকাস করুন, অথবা, আমাকে ব্যকগ্রাউন্ডএ ইমেজ করে, সামনে বিল্ডিংটা সুপার ইম্পোসেও রাখতে পারেন, বাকিটা আপনাদের জার্নালিস্ট, তিথি বোধয় ওর নাম, ও করে নেবে। আমি একটু রেড নিলাম, হোয়াইটটা আপনি ফিনিশ করে দিন না?"

"না না! আর খাবো না, আমি সোশ্যাল ড্রিংকার, এক-দু গ্লাসের বেশি নয়।"

"আপনি স্নাক্স প্লেটের এই ওয়াসাবি নাটটা ট্রাই করেছেন? দারুন লাগে আমার।"

"আপনি অত ঝাল খান? আমার ঐ চিলি ফ্লেক্স দেয়া রোস্টেড কাজুটাই ভালো লেগেছে।"

খুব স্বাভাবিক ছন্দে তালে তাল মিলিয়ে ফোটো শুটিং হয়ে গেলে ভদ্রতার সাথে, সসম্মানে অপর্ণাকে লবিতে ছেড়ে দিয়ে আদিত্য বললো, "একটা রিকোয়েস্ট করবো? আপনি যদি হ্যা বলেন তবেই।"

"সিওর।"

"আপনি না বলবেন না কিন্তু...?"

"ওকে! বলবো না।"

"আপনি এই স্যাটারডের মধ্যে কোনোদিন যদি ফ্রি থাকেন আমায় একটু কলকাতা ঘুরিয়ে দেখাবেন? সাথে আপনার ঐ যন্ত্রে আটকে নিয়ে যেতে চাই আমার শিকড়টাকে, এটার জন্য আপনি যা চাইবেন পাবেন।"
"প্লিজ মিস্টার ব্যানার্জি! জীবনের সবকিছু টাকার হিসেবে হয় না। আমি আপনাকে ফোন করে জেনে নেবো আপনার স্কেডিউল। আর বন্ধু হিসেবে আসবো এবার। প্রেফেশনালি নয়।"

"উভয় দিক থেকেই"- উষ্ণ হৃদয় দিয়ে করমর্দন করে, শুভরাত্রি জানিয়ে বিদায় নিলো অপর্ণা, আর আদিত্য ফোনে কারোর সাথে আমেরিকান এক্সেন্টে ইংরাজি বলতে বলতে রিসেপশনের দিকে এগিয়ে গেলো।

দ্বিতীয় অধ্যায়

পুজোর ছুটি শেষ। প্রচন্ড পড়ার চাপ। কাল রাতে ভাইফোঁটার খাওয়া দাওয়া ছিল - বেহালা শিলপাড়ায়, অন্তরার পিসির বাড়িতে। পিসতুতো দুই যমজ দাদা, অন্তরার কাছ থেকে প্রত্যেক বার ভাই ফোঁটা নেয়। দুজনেই খড়্গপুর আই আই টি তে ভর্তি হয়েছে, এই বছর। এক জন ইলেক্ট্রিক্যাল, আর আরেকজন ইলেক্ট্রনিক্স। এবছরের উপহারটাও তাই বেশ দামি প্রাপ্তি হয়েছে অন্তরার। অঞ্জলি জুয়েলার্স থেকে নারকোলের মালার উপর সোনা বসিয়ে হার, দুল আর ব্রেসলেট। খুব সুন্দর লাগছিলো ফিরোজা রঙের শাড়ির সাথে ঐ গহনা। এই বাহা শাড়িটা পিসির তরফের উপহার। পিতৃকুলের ওই সবেধন নীলমনি বলে খুব আদর।
অর্ণবকে ওয়াটসএপে ছবি পাঠানোতে, দুর্ধর্ষ সব কমেন্ট দিয়েছিলো। ওর সব থেকে ভালো লেগেছে, অর্ণবের ছুড়ে দেয়া "স্বপ্নে দেখা রাজকন্যা" প্রশংসাটা।
সারাদিন গুনগুনিয়ে গেলো অন্তরা ঐ গানের চার কলি নিয়ে। পিসি খুব ভালো রেধেছিলো গলদাচিংড়ির মালাই টা, অন্তরা ভালবেসে বলে চাড্ডি মাছ। মাংস, মিষ্টি বেঁধেও দিয়েছে।
এতো সব ভালো কাজের মধ্যেও, গুছিয়ে দেবার সময় অপর্ণাকে এক কামড় দিয়ে কথা বললো, যেটা অন্তরার খারাপ লেগেছিলো -

"নিয়ে যা... বাড়ি গিয়ে তো সেই এক রান্না জুটবে কপালে... গোপালের মার ঘ্যাঁট চচ্চরি ছাড়া আর কি বা খাবি...."

সত্যিই ননদরা কোনোদিনই বৌদিদের নিজের মনে করেনা। পিসি যে ওর মাকে হিংসা করে তাও সুস্পষ্ট চোখে পরে এখন, আগে যখন ছোট ছিল বুঝতোনা এতটা, দাদারা ভালো রেজাল্ট করেছে বলে অন্তরাকে বারবার ভালো করে পড়ার জন্য পিসেমশাই তাগাদা দিতেন।

রাতে ফিরে বেমালুম ভুলেই গেছিলো দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের এই প্রজেক্টটা কাল প্রথম পিরিয়ডেই আছে। সকালে ব্যাগ গোছাতে গিয়ে মাথায় হাত। সারা ছুটি অর্ণবের সাথে প্রেম করে, আর ছবি এঁকে কাটিয়েছে। এই হোমওয়ার্কটা বেমালুম ভুলেই মেরে দিয়েছিল। এবার থেকে স্কুলে ডেলি এসেসমেন্ট শুরু।
একটু একটু শীত পড়ছে, কিন্তু অন্তরার ঘাম দিচ্ছে, তাড়াতাড়ি দুটো টোস্ট মুখে গুঁজতে গুঁজতে, ম্যাকবুকে চোখ বুলিয়ে জরুরি তথ্যগুলি মগজস্থ করে নিল চটপট। ক্লাসের সবাই ওর বক্তব্যের ভুরি ভুরি প্রশংসা জানালো। শুধু ক্যাথ চুপ করে মাথা নিচু করে রইলো।

আর চোখে তা অবলোকন করে গর্বের হাসি দিলো সে। ক্যাথ ফেসবুকে অন্তরাকে আড়ি করেছে বলে, অন্তরা মুখোমুখি হলেও ক্যাথের সাথে কোনো কথা নেই। ক্লাসে ক্যাথ কোনো প্রশ্নের উত্তর জিজ্ঞেস করলে অন্তরা ছলে-বলে-কৌশলে ওকে হ্যাটা করে।

অন্তরা ওদের ক্লাসে থার্ড হয়। সব টিচাররা ওকে বেশ ভালোবাসে। আজ জীবন বিজ্ঞানের ক্লাসে, অন্তরা এমন দুর্ব্যবহার করলো ক্যাথ সব্বার সামনে কেঁদে ফেললো।

অন্তরার বান্ধবী সোহিনী থাকতে না পেরে, জিজ্ঞেস করেই বসলো - "অন্তু, কামন - দিস ইস টু মাচ, হোয়াই আর ইউ বিহ্যাভিং হার্শলি টু হার? দিস ইস আনফেয়ার।"

"চুপ কর তুই, তুই একতরফা আমার দুর্ব্যবহারটাই দেখলি? আর ও যে কিছু না জানিয়ে আমার ফিয়াঁন্সের সাথে ডেটিংএ যাচ্ছে, আমাকে ফেসবুকে কাঁচকলা দেখাচ্ছে, তার বেলায়?"

"বলিস কি রে? বল বল কি কি করলো? কোথায়? কবে? এতো চটপটা টক-ঝাল-মিষ্টি খবর, চেপে গেছিলিস?"

"মাথা খারাপ! তোর মতো পেট পাতলা কে বলি, আর তুই সব ক্লাসে হড়কে দিয়ে আসিস। তাই তো?"

"আমি না তোর বেস্ট ফ্রেন্ড, আমাকেও বলবিনা?"

"আরে এখনো বলার মতো কিছু হয়নি, হলে তোকে বলার আগে, আমি বর্তমান অফিসে গিয়ে জানিয়ে আসব, সকালে চা বিস্কুটের সাথে, ওটাও গিলে নিস, বুঝলি! চ, ক্যান্টিনে দুটো কোল্ড ড্রিঙ্কস নেই।"

তৃতীয় অধ্যায়

"হ্যালো ! মিস্টার ব্যানার্জি বলছেন?"

"গুড মর্নিং, অপর্ণা দেবী, কেমন আছেন ? আগের দিন ঠিকমতো বাড়ি পৌঁছে গেছিলেন তো?"

"হুম, ভালো আছি, থ্যাংকস। হ্যা ট্যাক্সি পেয়েগেছিলাম সাথে সাথেই। আমার কাজ আপনার পছন্দ হয়েছে?"

"সুপার্ব! আপনার পারফেকশানের তারিফ না করে পারছি না। অলরেডি ক্লায়েন্টও পেয়ে গেছি। আমার টিম চলে আসছে এই স্যাটারডেতে। আমাকে ফেরত যেতে হবে কানসাস, কিন্তু খুব শিগগিরিই হয়তো ফেরত আসব... আমাকে কলকাতা ঘুরে দেখানোর কি আপডেট?"

"আজ আমার ডে অফ। আপনি ফ্রি থাকলে, আজি হতে পারে।"

"তাহলে, আপনি আসবেন? না আমি অন দ্যা ওয়ে আপনাকে তুলে নেবো? "

"আমি এখন টালিগঞ্জ ফাঁড়িতে, কিছু ডকুমেন্টারি তুলেছিলাম, ওগুলো দিতে এসেছিলাম, কোয়াটার টু ইলেভেন সব চুকেবুকে যাবে।"

"সাউন্ডস গুড টু মি, সি ইউ দেয়ার।"

"আপনি কাছাকাছি এলে ফোন করে দেবেন প্লিজ।"

"সার্টেনলি।"

মনে যেন দক্ষিণের বাতাস বইছে, এই হেমন্তেই যেন কোকিলের ডাক কানে এলো। অলোককে, সব জিনিস বুঝিয়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি রেস্টরুমে ঢুকে একটু লিপস্টিক ঘষে ছোট্ট করে হাসলো আয়নায়। বুকের ভেতর চলকে উঠলো বিপুল লোহিত কণিকার লাবণ্য ধারা। আর কয়েক বছর পরেই তার চোখে চালসে পড়বে, এখনো চশমা হয়নি যদিও। তিরিশের কোটার শেষ বছরটাকে সোনার খাঁচার পিঞ্জরে বেঁধে রাখতে চায় আজগের এই দিনটি দিয়ে। চোখে গুচির সানগ্লাস টেনে চুলটায় সরু সরু আঙ্গুল চালিয়ে পরিপাটি করে নিলো। কপালে কালো বড়ো টিপ। গায়ে কালো আর লালের ডুরে দেয়া ঢাকাই জামদানি। ফর্সা পিঠ, লাল নেইলপলিশে রাঙানো হাতের ও পায়ের আঙ্গুল। হাতে লাল চামড়ার বড়ো ব্যাগ যাতে ক্যামেরাটা সযত্নে রাখা।

অলোক এই ফাঁকে দুটো ডাব নিয়ে এলো। "দিদি, আপনাকে এখনো হেব্বি দেখতে কিন্তু। আমার বৌ সবে এক ছেলের মা, দেখে আমার ঠাকুমা মনে হয়। আপনি একটু টিপস দিয়ে দেবেন তো, বৌকে বলবো, ফলো করতে।"

"আচ্ছা, একদিন নিয়ে এসো না, তোমার বৌ ছেলেকে, আমার মেয়ে ছোটো বাচ্চা খুব ভালোবাসে।"

"আপনার মেয়ের বয়স কত হলো দিদি?"

"এই বছর ষোলো হবে।"

"আরিব্বাস! পায়ের ধূলো দিন। আমি তো বিশ্বাস করতেই পারছিনা। আপনার কতো বয়স হবে?"

"এই মেয়েদের বয়স আর ছেলেদের মাইনে জিজ্ঞেস করতে নেই, বুঝলে?"

"ষোলো বছরের মেয়ে আছে বললেন তাই! নইলে তো আমি ভাবতুম এই খুব বেশি হলে ছাব্বিশ-সাতাশ।"

"তাই ভাবো, আমি গেলাম, আজ তুমি বাকিটা সামলাও,

আমার একটা প্রাইভেট ফোটোশুটিং আছে।"

"আমি ছাড়া অসুবিধে হবেনা আপনার?"

"সেদিন তো তন্ত্রে নেচে কাত হয়ে পড়লে, ঐ দিন দরকার ছিল, আজ আমি পারবো।"

"আপনি রেগে আছেন, না দিদি? এরকমটি আর কখনো হবে না।"

"না হলেই ভালো "

ব্যাগ হাতে গটগটিয়ে শীতল ঘর থেকে বেরিয়ে ঢুকে পড়লো আরেক শীতল চলমান কক্ষে। বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে, আদিত্য লিমোজিন নিয়ে এসেছে। ফ্যালফ্যাল করে অলক কাঁচের ভিতর থেকে হাঁ করে তাকিয়ে হাত নাড়তে লাগলো।

অপর্ণার এই প্রথম সফর এই গাড়িতে। ভেতরে বসা আদিত্যকে কোনো দেশের রাজা মনে হচ্ছিলো। পাশে বসতেই গাড়ি ছুটলো গড়ের মাঠের দিকে। গাড়ির ভেতরে সারি সারি বিভিন্ন আকারের ওয়াইন গ্লাস। আদিত্যর অনুমতি নিয়ে ঐ গ্লাসগুলোর ছবি তুলতে লাগলো অপর্ণা ।

আদিত্য ড্রিঙ্ক অফার করলে অপর্ণা না বললো। এরপর, দুজনে সেই উড়ন্ত ভেলায় গা এলিয়ে পাড়ি দিলো রূপকথার দেশে।

চতুর্থ অধ্যায়

তুই যে আমার মনের মানুষ,

বসিয়েছি তোরে নয়ন দ্বারে;

থাকি তোরই বুকের ভিতরে,

নয়ন ভাসে নয়নের জলে.....

অন্তরা কবিতাটা পড়লো ওর চিলেকোঠা ঘরের দরজার পেছনের সাদা বোর্ডের উপর, পড়া মাত্রই তড়তর করে অর্ধেক সিঁড়িতে নেমে, হেঁকে গোপালের মাকে জিজ্ঞেস করলো -

"অর্ণব এসেছে বলোনি কেন?"

"অ মা ! আমায় দোষী ঠাউরিয়ো নি গো, দাদাবাবু কৈলেন যে, কিচ্ছুটি জেনো বলিনেকো তোমায়।"

আবার দুটো দুটো সিঁড়ি এক এক ধাপে বেয়ে ওপরে উঠে পাগলের মতো খুঁজতে লাগলো অর্ণবকে। পেছন থেকে অর্ণব এসে জাপটিয়ে ধরে ছাদের ঢাকা যে গোপন জায়গাটা আছে, সেখানে নিয়ে গিয়ে ঘাড়ে এলোপাতাড়ি চুমুখেতে লাগলো, অন্তরার কিছু বোঝার আগেই।

চোখ বন্ধ করে, পোষা মেনি বেড়ালের মতো গরর গরর মৃদু শব্দে আদর খেতে লাগলো। অর্ণব, ওকে সামনে ফিরিয়ে অন্তরার গলার দুপাশে সুন্দর বেরিয়ে আসা কলার বোনে চুম্বন করে, গলাতে তর্জনী বোলাতে বোলাতে ওষ্ঠ কোল স্পর্শ করলো ।

"আউউউ... তুই সত্যিই একটা মেনি বেড়াল, আদর শেষ হতেই থাবা মারিস।"

"আজ হঠাৎ একেবারে বিনা মেঘে বজ্রপাত?"

"তুই ক্যাথ কে স্কুলে অমন কেনো করছিস? তুই জানিস তুই আমার বাগদত্তা, তার পরেও ওর সাথে কেন এই দুর্ব্যবহার? মেয়েটা সারা জীবনে তেমন ভাবে কিচ্ছু পায়নি রে, আমরা সবাই ভালোবাসার কাঙাল,একটু ছায়া খুঁজছে... তুই আমার চোখের দিকে তাকিয়ে দেখ, শুধু তোরই নাম লেখা, লক্ষীটি। ওর সাথে স্বাভাবিক বিহেভ কর, বাবু।"

"ও আমাকে আনফ্রেন্ড করলো কেন?"

"ওতো তোকে আবার ফ্রেণ্ড রিকোয়েস্ট পাঠিয়েছে।"

"একসেপ্ট করব, মাই ফুট।"

"আচ্ছা করিসনা, কিন্তু আমি তো তোরই মধ্যে থাকি, দেখ আমরা দুজনে মিলে ওর জন্য যোগ্য একটা বাঙালি খুঁজে ওর বিয়ে দেব।"

"ঢং ! পেটে কিল দিলেও যার বাংলা বেরোয় না, তার কিনা বাঙালি বৌ হওয়ার শখ।"

"তুই একটু এমপ্যাথি দেখা না, বাবু... তুই তোর পুরো পরিবার থেকে যতটা ভালোবাসা পাস, তার এক সিকি ভাগও ক্যাথের কপালে জোটেনি কোনোদিন। ও হিন্দু হতে চেয়েছিলো, ও বাংলা বলতে চেয়েছিলো, ও -ওর শিকড়টার স্বমূলে উৎপাটন চায়নি, বাবা এতো ব্যস্ত যে পিতৃ স্নেহ তুঁষের আগুনের মতো ধিকি ধিকি জ্বললেও, ক্যাথের ছোটবেলাটা সেই ভালোবাসার চাই ঘেঁটে কাটিয়েছে...."

"আচ্ছা, বেশ তুই কি করতে বলিস আমায়?"

"কিচ্ছু না, শুধু নরমাল হ, ক্লাসে তুই পড়াশুনোয় ভালো, ও অত ভালো নয় বলে তুই বুলি-ইং করিসনা, বাবু আমার।"

"ওকে, আই গট ইট, তবে শুধু তোর মুখ চেয়েই করছি সব, নইলে হু কেয়ারস?"

কাঁধ ঝাঁকিয়ে অন্তরা পলক ফেলার আগেই উগ্র পন্থীদের মতো ওর দুই হাত আটক করে গভীর এক চুম্বনে ভরিয়ে দিলো অন্তরার দেহ- মন-অন্তরাত্মা।

"গ্রেট! হোয়াও... কোথেকে শিখলি? গুরুদেব শেখাচ্ছে বুঝি? হাফ ব্রিটিশ বলে কথা।"

"কেন এ প্রশ্ন করে লজ্জা দাও মোরে, হে প্রিয়তমা?
সন্দেহের গন্ধ যে তোমার দিকে ও কটাক্ষ তুলেছে?"
"কিসের গন্ধ?"

"পূর্বে তোমার ব্রিটিশ কোনো প্রেমিকের সহিত গান্ধর্ব্য মতে বিবাহ পূর্বক, অভিজ্ঞান শকুন্তলম হইয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে। ...."

ক্যারাটের পোজে ঘুসি বাগিয়ে অন্তরা বললো, "এই প্লিজ শকুন্তলার ঐ লেখাটা কি লিখছিস রে?"

"তুই কি লিখলি, আগে দেখা, জে আর সি কে সন্তুষ্ট করা স্বয়ং ব্রহ্মারো অসাধ্য।"

"চল নিচে চল, আমার স্টাডি টেবিল নিচে।"

দুজনে হাতে হাত ধরে সিঁড়ি দিয়ে পায়ে পা মিলিয়ে দেহের ভার একে ওপরের ওপর দিয়ে দাড়ি পাল্লার সাম্যতা বজায় রেখে দোতালার দক্ষিণ পশ্চিমের ঘরটায় ঢুকে পড়লো।

পর্ব ৬

প্রথম অধ্যায়

আদিত্যর পরনে একটা সাদা স্যুট। ওর ব্যক্তিত্বর সাথে সাদা রংটা দারুন মানিয়েছে। পায়ে দামী কুমিরের চামড়ার তামাটে জুতো। হাতে ভারী সুইস রুপোলি ঘড়ি। চোখে রে-ব্যানের সরু ধাতব ফ্রেমের রোদ চশমা। গায়ে মাতাল করা এক আকর্ষণীয় পুরুষালি সুবাস। অপর্ণা চুপ করে গাড়ির ওপাশের কলকাতা দেখছিলো, আর মনে মনে হাসি পাচ্ছিল ভেবে, যে আদিত্য ব্যানার্জীর সাথে দেখা হওয়ার আগে, ও মনে মনে যে অবয়ব কল্পনা করেছিল তার সাথে বাস্তবের আকাশ পাতাল তফাৎ। অপর্ণা ভেবেছিল মিস্টার ব্যানার্জি হবে বেঁটে, কালো, মোটা, কতকটা হোঁদল কুতকুতের আধুনিক আদল।

আড়িচোখে আদিত্যও অপর্ণাকে দেখছে দেখে মনটা ছ্যাঁক করে উঠলো তার - সত্যিই কি মিস্টার ব্যানারজিরও ওকে অতোটাই ভালো লেগেছে - যতটা ওর আদিত্যকে লাগছে?
খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তবে উত্তরের সন্ধান তাকে যেন তেন প্রকারেণ পেতেই হবে। এ যে কি মোহে টানছে তাকে, যার নেই শুরু নেই শেষ? অশনি সংকেতের মতো আলেয়াকে ধরতে চাওয়া। আদিত্য বয়েসে ওর চেয়ে বছর দশেকের ছোটই হবে। কিন্তু কি তীব্র উন্মাদনা তাকে ভোগের লিপ্সার। সে জানে তার আভিজাত্যের গরিমা এবং সংস্কারের বেড়াজালের প্রতিবন্ধকতার সামনে সে অতি ক্ষুদ্র এক নারীসত্ত্বা, তবুও কোনো জাদুকরের জাদুতে সে পতঙ্গের মতো ঝাঁপ দিচ্ছে আদিত্য নামের এই বহ্নিশিখায়।

"পিপীলিকার পাখা ওঠে মরিবার তরে, হোয়াট দা হেল?... আরেকটু হলে গাড়িচাপা পড়তো, দেখুন কেমন নির্বিকার, মোবাইল ফোন ধরে কেউ রাস্তা পার হয়?"

মনে মনে ভাবলো তাও ভালো ঐ লোকটার বেপরোয়া স্টেপ দেখে কমেন্ট করেছে, নইলে তো আদিত্যকে মেন্টালিস্ট মনে হচ্ছিলো অপর্ণার।

দেখতে দেখতে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল এসে গেলো। অপর্ণার মেম্বারশিপ কার্ড দেখিয়ে ভেতরে নিয়ে গেলো আদিত্যকে। প্রাচীন ব্রিটিশ ইতিহাসের নিদর্শনের খুঁটিনাটি

দেখতে দেখতে এগিয়ে চললো জোরকদমে। বাইরে বেরিয়ে বিভিন্ন কোন থেকে অপর্ণা ছবি তুললো আদিত্যর। খুব অল্প সময়েই ভীষণ ভালো বন্ধু হয়ে উঠলো ওরা দুজন। অপর্ণা কোনোদিন যেটা কৌশিকের কাছে পায়নি আজ যৌবনের অন্তিম লগ্নে পৌঁছে, প্রকৃত প্রেমের সন্ধান সে আজ পেলো এই প্রবাসী বাঙালিটির কাছে। আদিত্য তার ছবিতোলার আগ্রহের কথা জানাতে, অপর্ণা ওকে ক্যামেরা নাড়াচাড়া করা শেখাতে লাগলো। আদিত্য ওর শিক্ষার বিপুল প্রশংসায় ফেটে পড়লো। অপর্ণাও পাল্টা জবাবে জানালো, শিক্ষকের সম্পূর্ণতা প্রকৃত ছাত্রের উপর শিক্ষাদানের মাধ্যমে।

অপর্ণাকে মডেল বানিয়ে আদিত্য দক্ষ জহুরীর মতো ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন কোন থেকে ফটো তোলার অছিলায়, অপর্ণার মনের মনিকোঠায় সন্ধান করতে লাগলো সবচেয়ে মূল্যবান অমূল্য রতনটির ।

আদিত্যর কেন যেন মন বলছিলো সেই হীরের ঝলক সে দেখেছে অপর্ণার চোখে, আর তার দৃঢ় বিশ্বাস সেই হীরেটা যে ধাতুতে বাঁধানো তাতে আদিত্যর নামটা খোদিত হতেও সে দেখেছে সেদিন রাতে। আদিত্য কানসাস এ বহু নারী সঙ্গ পেয়েছে, কিন্তু এমন উজাড় হতে ইচ্ছে করেনি কারোর কাছে। আগে কোনোদিন তার আয়নার প্রতিবিম্বটির আরেকজনের রুচির সামঞ্জস্যের মাধুরীতে আবৃত হওয়ার প্রবৃত্তি জাগেনি। সাদা পরে নিজের বয়সটা টেনে দশ বছর বাড়ানোর কথাও মনে আসেনি তার কোনোদিন এর আগে কোনো নারীর সাথে সহবাসের অদম্য কামসূত্রের অভিপ্রায়ও আজ নতুন। অপর্ণাকে উড়িয়ে কানসাস নিয়ে যেতে ইচ্ছে কেন হচ্ছে তার?

এমন এক দ্বীপে যেতে চায় সে, যেখানে জীবনের সব দৈনন্দিন চাহিদা পেছনে ফেলে শুধু আদিম রিপুর বাসনা চরিতার্থতাই হবে তার একমাত্র জৈবিক প্রয়োজন। অপর্ণাকে ছুঁতে পাওয়ার মুহূর্তে আবেশে দিশেহারা মাধবী রাতের মাতাল বাতাস উলঙ্গ করবে তার নারী শরীর। প্রতিটি অঙ্গের খুঁটিনাটি অবলোকন করবে সে অলস চোখে। পুরুষালি স্পর্শের চূড়ান্ত মাদকদ্রব্য ঢালবে যখন অপর্ণার শরীরে, সে ভুলে যাবে তার অতীত, তার স্বামী, তার পরিবার। অপর্ণার আকাশে শুধু ছেয়ে থাকবে আদিত্যর দ্বিপ্রাহরিক গনগনে যৌনতার তপ্ত বিকিরণ। ঝলসে দেবে সে এক নিমেষে তার এতদিনের চেয়ে না পাওয়ার যৌন চাহিদার নীরব আস্ফালন। ফিরিয়ে আনতে চায় তার খরস্রোতা তরশ্রীর হারিয়ে যাওয়া বিপুল জলরাশি। আদিত্যর তাপে ফুলে ফেঁপে বান ডাকুক তার শরীরের প্রতিটি স্নায়ু কোষের অমৃত ধারায়।

দেখতে দেখতে ঘড়িতে দুটো বেজে গেলো।

"চলুন এবার আপনার ফেভারিট রেস্টুরেন্ট এ লাঞ্চ করা যাক।"

"আমার ফেভারিট! সেখানে আপনার ভালো লাগবে?"

"আপত্তি না থাকলে নিয়ে চলুনই না।"

"বেশ চলুন তবে।"

দুজনেই বেশ বুঝতে পারছিলো তারা এতদিনে তাদের মনের মানুষের সন্ধান পেয়েছে, কিন্তু বিধাতা কি রেখেছেন বিধিকন্দরে তা একমাত্র ভবসাগরে ভেলা না ভাসালে ঠাহর করা দুরূহ। চিন্তার অবকাশে মাথা না ঘামিয়ে সদ্য যৌবন প্রাপ্ত যুবক যুবতীর মতো গল্প করতে করতে এগিয়ে গেলো দ্বিপ্রাহরিক আহারের সন্ধানে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

অর্ণব ইদানিং ক্যাথ কে পড়াশুনায় খুব সাহায্য করে। প্রতি শুক্রবার ক্যাথ স্কুলের শেষে ওর বাবার ফ্ল্যাটে চলে আসে অর্ণবকে ওর স্কুল ক্যাম্পাস থেকে তুলে নিয়ে। সপ্তাহের বাকি চার দিন ক্যাথকে ওর মা জোর করে মায়ের সাথে থাকার জন্য ।

ক্যাথের দম বন্ধ লাগে ঐ বাড়িতে। মায়ের দ্বিতীয় স্বামী লোকটাকে সে মোটে সহ্য করতে পারেনা। শুক্রবার দিনটার আশায় কাটে তার বাকি চারদিন। অর্ণব ওর হোমওয়ার্কের খাতা খুলে দিলো, আর ক্যাথ ফোনে সব ছবি তুলে নিলো গাড়ির মধ্যে বসেই। ড্রাইভারকে বলে দিলো, আজ রাতে আটটা নাগাদ একবার আসতে।

অর্ণবের বুক দুরদুর করছিলো। মাকে বলেনি যে, ও প্রথম আজ নাইট ক্লাবে যাবে, বলেছে যশের সাথে ডোভারলেনে

রশিদ খাঁর গান শুনতে যাবে। আর যশ ওদের ল্যান্ড লাইনের তার খুলে রেখেছে, যাতে অর্ণবের মা ফোনে কোনো ভাবেই ওর মা-বাবার সাথে সত্যি মিথ্যে যাচাই করতে না পারে। সব পরিকল্পনা ক্যাথের, শুধু ক্যাথের আনন্দের জন্যই অর্ণব যাচ্ছে, নইলে নাইট ক্লাবের চাইতে ডোভার লেনের উচ্চাঙ্গ সংগীত অনেক বেশি আকর্ষণীয় ওর কাছে।

বিকেলটা ক্যাথের ফ্ল্যাটের ব্যালকনিতে কাটাতে স্বর্গের মতো লাগে অর্ণবের। সূর্য ডোবা, ঝুপঝুপ করে অন্ধকার নামা, শিরশিরে ঠান্ডা বাতাস বওয়া, সব প্রাণ ঢেলে ভোগ করে রাজার মতো। আজকাল ক্যাথ আর পিজ্জা আনায় না, নিজে চা বানায়, খুব সুন্দর সবজি ভেজে নুডুলও পরিবেশন করে টা হিসেবে। অর্ণবের তা অমৃতের মতো লাগে।
অর্ণব স্কুলের ব্যাগ থেকে রবিঠাকুরের বৈষ্ণব পদাবলীর নোটসটা বের করলো। ক্যাথ পাশের চেয়ারে পা তুলে অঙ্ক করছে। পড়ার চাপ খুব বেড়েছে বলে প্রেমের চাহিদা আর যোগানের প্রেক্ষাপট নিয়মের কড়া অনুশাসনে বাঁধা আছে। ক্যাথ কোনোদিনই পড়াশুনা নিয়ে মাথা ঘামায় নি, সেও অন্তরার সাথে প্রতিযোগিতায় নেমেছে।
হঠাৎ অর্ণবের মনে হলো, ক্যাথকে রবীন্দ্রনাথ চন্ডিদাসের রাধা আর অন্তরাকে বিদ্যাপতির রাধা বলেছেন।
"বিদ্যাপতির রাধা বিরহে কাতর হন আর চন্ডিদাসের রাধার মিলনেও সুখ নাই। বিদ্যাপতির রাধা জগতের মধ্যে প্রেম কে সার বলিয়া জানিয়াছেন... চন্ডিদাসের রাধা প্রেমকেই জগৎ বলিয়া জানিয়েছেন।"

হঠাৎ অর্ণব উঠে ক্যাথের কোলে মুখ গুঁজলো, ক্যাথ চুলে হাত বুলিয়ে বুকে টেনে নিলো ওকে। "আমি তোমার খুব বিশ্বস্ত বন্ধু হতে চাই, সে সুযোগ দেবে আমায়?"

"আই নো, আই এম ইন গুড হ্যান্ড।"

"না তুমি কিচ্ছু জানোনা। আমি তোমায় সেই সব দিতে চাই, যা ছোট বেলায় তোমার পাওয়া উচিত ছিল। আমি খুব যত্ন করে তোমাকে সেই ভালোবাসা দেবো যার পরশে তুমি জীবনের বাকি দিনগুলো সোনার মোড়কে মুড়ে রাখবে। আমি তোমাকে রানীর বেশে দেখতে চাই ক্যাথ।"

অর্ণবকে খুব শক্ত করে জড়িয়ে ধরে ক্যাথ বললো, "প্লিজ শো মি হাউ টু মেক লাভ?"

"তুমি টিশার্ট পরে নাও ক্যাথ, আমি কিছু প্রিন্সিপাল ফলো করি, কোনো মেয়েকে যে ছেলে বিয়ে না করে, সামাজিক সম্মান না দিয়ে চুপিচুপি ভোগ করে সে কাপুরুষ। আমি বীর। আজ তোমাকে ভোগ করতে নাইট ক্লাব যাবো না, আজ তোমার বডি গার্ড হয়ে তোমাকে সব রকম আনন্দ দেবার জন্য যাবো।"

ক্যাথ উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে অর্ণবকে জড়িয়ে ধরলো। অর্ণব অতি কষ্টে তার পুরুষালি শক্ত অংশটাকে নিজের কাবুতে নিয়ে ক্যাথের সারা দেহে স্নেহের হাত বুলিয়ে দিলো।
এমন সময়ে সদর দরজায় খুট করে চাবি খোলার আওয়াজ শুনে হতভম্বের মতো দুজন তাকিয়ে রইলো।

তৃতীয় অধ্যায়

শিরশিরে হিমেল হাওয়ায় টান ধরে চামড়ায়। বাতাসে কান পাতলে ভোরের দিকে শিশির পড়ার শব্দ শোনা যায়। রাতে শোবার সময় গুনগুনিয়ে পাখাটা চালালে আমেজ আসে। আবার ভোররাতে ওটার ঘোরা বন্ধ করে পাতলা চাদর নিতে হয়।

অপর্ণা নানান অছিলায় কৌশিকের সাথে এক বিছানায় নিশি যাপন সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিয়েছে। প্রতি রাতেই নৈশ আহার সেরে স্টাডি রুমে চলে যায় ফটো এডিটিং এর অজুহাতে।
বেশ রাত পর্যন্ত ফোনের নেশায় বুঁদ হয়ে থাকে, শেষ রাতের দিকে পাশের সিঙ্গেল বেডটাতেই শুয়ে পরে। কৌশিকের ভালো না লাগলেও অনেকটা ধাতে সয়ে গেছে অপর্ণার এই রোজগেরে রাতের নাটক ।
এখন অপর্ণার উড়ন্ত পর্দা, হোয়াটস এপে আদিত্যর সাথে রাত জেগে গল্প করার দুরন্ত উন্মাদনা। আদিত্য চলে যাবার পর, টানটা যেন বেশিই বেড়েছে। দুর্নিবার এক বেয়ারা ইচ্ছা ওকে পাওয়ার। ছুঁয়ে দেখার। একই প্রেমের রঙের গাঢ়তার মায়াজাল আদিত্যর মনেও রামধনু আঁকছে। শনিবার অপর্ণা ওকে বিদায় জানাতে এয়ার

পোর্টে গেছিলো। আদিত্য ভাবতেও পারিনি অত রাতে অপর্ণা আসবে। মনে প্রাণে যদিও চেয়েছিলো সে - কিন্তু মুখ ফুটে বলতে পারিনি অপর্ণাকে। অপর্ণাকে দেখে আনন্দে আত্মহারা হয়ে জড়িয়ে ধরে সবার সামনেই ঠোঁটে ঠোঁট ডুবিয়ে দিয়েছিলো।

সম্বিৎ ফিরলে দুজনেই লজ্জা পেয়ে, আড়ালে মুখ গোঁজে। কিন্তু বেপরোয়া সেই চুমু অনেক সাবলীল করেদিয়েছিল ওদের প্রেমের দৈবদ্ধতাকে।

আর ঐ ক্ষণ থেকেই অলিখিত প্রেমের অদৃশ্য এক কাগজে ওরা দুজন দুজনের নামের পাশে সই করে দিয়েছে যে ওরা "একে অপরের"।

অপর্ণা প্রতিদিন সকালে কাজে বেরোতে যাবার আগে পরিপাটি করে সেজে সেলফি তুলে আদিত্যকে দেয়। আবার যখনি ছোটখাটো ঘটনা মনে ধরে তা তৎক্ষণাৎ আদিত্যকে না জানানো পর্যন্ত শান্তি নেই তার - এরপর অধীর আগ্রহে বসে থাকা কখন আদিত্য তা দেখে পাল্টা রসিকতা করবে সেইক্ষনের। নেশার মতো আটকে থাকে আদিত্যর পঠানো অক্ষর গুলোর সাথে। অপর্ণার যখন ঘড়িতে সকাল সাড়ে আট আদিত্যর তখন আগের দিন প্রায় রাত দশটা বাজে। আদিত্যও তার খুঁটিনাটি দৈনন্দিন জীবন যাত্রার ধারাবাহিক বিবরণী উড়িয়ে দেয়। আর সাত সমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে সেই বার্তা যখন অপর্ণার বার্তাবহ শিহরণে জানান দেয় তখন মনের ভেতর এই হেমন্তেই বসন্তের কোকিল কুহু গায়।

আদিত্য কানসাসে একটা বড়ো প্রজেক্টের ফটো তোলার জন্য অপর্ণাকে অনুরোধ করছে বেশ কিছুদিন বাবদ। আদিত্য জোর করে তিন মাসের ভিসাও করিয়ে নিয়েছে অপর্ণাকে ওখানে নিয়ে যাবে বলে। অপর্ণার খুব ইচ্ছেও আদিত্যর সাথে থাকার , কিন্তু ওখানে যাওয়া মানে সম্পর্ক যে বিছানায় উঠবে তা বলাই বাহুল্য। অনেক যুদ্ধ চলছে মনের ভিতর। কিন্তু যে টানে টানছে আদিত্য তাকে ঠেকানোর সামর্থ্যই বা কোথায়?

সকালে এক ঝুড়ি শিউলি তুলেছিলো গোপালের মা, কল্যাণী বসে বসে তার মালা বানিয়ে গোপাল ঠাকুরকে পড়িয়ে দিলো। পাশের জানালায় অন্তরার পোষা টিঁয়া পাখিটা এক মনে রোদে বসে লাল লঙ্কা খাচ্ছে।

আদিত্যর সেই চুমুর পরে অপর্ণার নিজেকে কেমন অশুচি মনে হয়। শাশুড়ির চোখে চোখ রাখতেও ভয়ে বুক দূরদূর করে। ঠাকুরের আসন ছুঁতে পারেনা। কানসাস যাবার কথাটাও মুখ ফুটে বলতে পারতো না বোধ হয় সে কোনোদিনই। কিন্তু আজ অনেকটা সাহস নিয়ে পাশে বসেছে শাশুড়ির কাছে, কথাটা পারবে বলে।

সামনে মেয়ের মাধ্যমিক, যদিও ওদের ডেলি এসেসমেন্ট হয় এবং অন্তরা যথেষ্ট ভালো পড়াশুনায়,তাও এই সময় সংসার ছেড়ে অতো দূর যাবার প্রশ্নই বা ওঠে কি করে? এদিকে আদিত্য ও কলকাতায় আসার জন্য,মুখিয়ে আছে, কিন্তু জানুয়ারির আগে কাজ ছেড়ে আসার কোনো লক্ষণ ও নজরে পরে না।

দুই পক্ষেরই তাই একে অপরকে পাবার আকাঙ্খার পারদ চড়চড়িয়ে ওপরে উঠছে দিনে দিনে। প্রতি রাতে স্কাইপে আসে ওরা। চুপ করে দুজন দুজনের হৃদয়ের ওঠা নামা কান পেতে শোনে। কামাতুর চোখে চেয়ে থাকে একে অপরের ভেজা ঠোঁটের দিকে ।

রোজই কোনো না কোনো কাজে ওরা ভুল করছে, আর তা নিয়ে বাইরের লোকের কাছে লজ্জা পেলেও মনে মনে গর্বিত বোধ করছে এই ভেবে যে, ওরা চুটিয়ে প্রেমকে উপভোগ করতে শিখেছে। ।

অপর্ণা কানসাস আসলে আদিত্য কি কি করবে সব পরিকল্পনা ছকা হয়ে গেছে দুজনে মিলে বহুবার। অপর্ণার এতো প্রমোদে মন ঢেলেও প্রাণ কাঁদে ওর বয়সের কথা ভেবে, আদিত্য ওর চেয়ে অনেক কম দেখেছে দুনিয়া। আদিত্যর চাইতে সে দশ বছরের বড়ো - এক প্রায়শ যুবতীর মা।

আর বছর আটেক বাদে অন্তরার বিয়ে হবে আর সে কিনা নিজের নতুন সংসারের স্বপ্নে মগ্ন? সংসারকে অবজ্ঞা করার যথেষ্ঠ সাহসও তার নেই - কিন্তু আদিত্য তাকে সব ভুলিয়ে দেয়। সে চায় নতুন করে অপর্ণাকে সেই সব দিতে যা তার কল্পনার অতীত। সারারাত ধরে ফোনটাকে বুকে জড়িয়ে স্বপ্ন দেখায় সে রুপোলি দাম্পত্য জীবনের। নতুন সংসার পাতার স্বপ্ন-ক্যামেরা হাতে কেনিয়ার জঙ্গলের নাইট সাফারির স্বপ্ন-আমাজনের জঙ্গলে ক্যাম্পিংয়ের স্বপ্ন-ভিক্টোরিয়া ফলস এ বানজি জাম্পের স্বপ্ন-কিলিমাঞ্জারোতে রক ক্লাইম্বিংয়ের স্বপ্ন।

এইসব আদিত্য আর অপর্ণার গল্পে এলেই তৎক্ষণাৎ টুর প্লানার নিয়ে বসে ঠিক করে ফেলে পরবর্তী পাঁচ বছরের সুখ-সমুদ্রস্রোতের চিত্রাবলী। স্বপ্নের নীল কাজলে আজ চারপাশটা নতুন লাগে, আদিত্যর চোখ দিয়ে অপর্ণা দেখে আর অপর্ণার চোখে আদিত্য।

চাপা উত্তেজনা বুকে রেখে ঠিক করেই ফেলে সে সাত দিনের জন্য কানসাস যাবে আর চুটিয়ে ভোগ করবে তার কচি প্রেমিকটিকে। হাঁটু গেড়ে বসে কল্যাণীকে টুক করে একটা প্রণাম ঠুকে বললো, "মা! আমি একটা খুব বড়ো অফার পেয়েছি আমেরিকায়, সাত দিনের জন্য যেতে হবে এমাসের শেষে। তুমি কি করতে বলো আমাকে? এ সুযোগ তো সবসময় আসেনা। তাই পেলে কি ছাড়া উচিত? আমি কিছুই ডিসিশান নিই নি অন্তরার সামনে পরীক্ষা বলে।"

"যাও না, ওর বাবাই তো পড়াশুনা দেখে, গোপালের মা আছে, আমি আছি, এতো কিসের চিন্তা তোমার?"

রাতে কৌশিক খেতে বসলে কথাটা পারবে, মনে মনে ঠিক করে, শাশুড়িকে আনন্দে জড়িয়ে ধরে ধন্যবাদ জানালো। সুসংবাদটা আদিত্যকে লিখতেই সে ওদিকে চ্যাটার্ট প্লেন বুক করে নিলো অপর্ণাকে কানসাস ঘুরে দেখাবার জন্য।
এখন শুধু অপেক্ষা কৌশিকের মতামতের।

চতুর্থ অধ্যায়

ক্যাথের বাবা সোহম দরজা খুলে ঢুকলেন। অনেকটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেন ঢুকেই। চমকে দেয়ার কথা ছিল ক্যাথকে তার বাবার, কিন্তু এতো উল্টো পুরান! মেয়ে সহবাস করা শুরু করেছে তার বয়ফ্রেন্ডের সাথে? হঠাৎ গালে সপাটে কেউ যেন এক চড় মেরে সম্বিৎ ফেরালো সোহমের।
কলকাতার মাটিতে পা দেয়ার সাথে সাথে সে কি বস্তাপচা বাঙালি মানুষিকতা জাহির করতে চায়? সেও তো এই বয়স থেকেই ক্যাথের মায়ের প্রেমে পড়েছিল। তাহলে কি "নিজের বেলায় আঁটিসুঁটি, আর পরের বেলায় দাঁত কপাটি?"
নাঃ! তা সে করবে না। একমাত্র মেয়ে ওর। সব রকমের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে ভরিয়ে দেবে ক্যাথের জীবন।
"সারপ্রাইস!"
অর্ণব এই পরিস্থিতিতে ঠিক কোথায় লুকাবে ভেবে পাচ্ছিলনা, মনে মনে বললো, "হে মেদিনী, দুভাগ হও। আমি তোমার গর্তে সেদোই।"
মুখে স্মিত হাসি দিয়ে সোহমের পা ছুঁয়ে প্রণাম করলো- অর্ণব। আর যাবে কোথায়, বাঙালি সোহমবাবুর আটপৌঢ়ে স্নায়ুকোষে সেন্টিমেন্টাল সুড়সুড়ি লাগতেই মেয়ে আর তার পছন্দের সুপাত্রটিকে বুকে জড়িয়ে ধরলো।
"ডার্লিং, তুমি শুনলাম চা বানাচ্ছ, তাই সাত সমুদ্র পেরিয়ে তোমার চা খেতে হাজির। তোমার বিগড়ে যাওয়া পিতৃদেব একটু চাও চেখে দেখার নিবেদন রাখে।"
অর্ণব দরজার ওপাশে রাখা ব্যাগটা গেস্ট রুমের কাবার্ডে ঢুকিয়ে দিলো।
"সিলি নটি ড্যাড, ক্যান্ট ইউ টেক্সট দিস অর্লিয়ার?"

"কেনো রে পাগলী, টেক্সট দিলে কি এই সৌভাগ্য হতো, তোদের একসাথে দেখার? আর কদ্দিনই বা তুই আমার সুগার বানি হয়ে থাকবি? ড্যাং ড্যাং করে, টুকটুকে লাল শাড়িতে, এই হ্যান্ডসাম ইয়ং ম্যানের হাত ধরে গটমোটিয়ে শ্বশুর বাড়ি চলে যাবি, তাই তুই রান্না করছিস শুনে আর লোভ সামলাতে না পেরে চলে এলুম।"

"ফর হাউ মেনি ডেস, ড্যাড?"

কথা ঘুরিয়ে, অর্ণবের দিকে তাকালো, "আরে ইয়ং ম্যান, ডাক্তারের ছাও, টিটোবাবু, তোমার সুইমিং কেমন চলছে?"
লজ্জা লজ্জা মুখ করে, নতুন শ্বশুরবাড়িতে কনে বউরা যেমন ঘোমটাতে থাকে, কতকটা সেইরম মাথা নিচু করে বললো, "এখন এতো ডেলি এসেসমেন্ট চলছে যে ওই সপ্তাহে দু দিন নমো নমো করে প্র্যাক্টিসে এ যাই এইপর্যন্ত।"

"না না। এ-তো ভালো কথা নয়, তোমার অতো প্রতিভা, একমনে ফ্লারিশ করো, সবটা ঢেলে দাও, তা ডাক্তার কি বলছে? ছেলেকে পূর্বপুরুষের মৌরসীপাট্টার ভার নিতেই হবে? ডাক্তারের ছেলে সুইমার হলে জাত যাবে?"

"নাহঃ! বাবা তো খুব লিবারাল, আমিই একটু ব্যালান্স করছি।"

"বাহবা বাহবা বাহঃ - তা এটলাসগুলো বেড়ে বাগিয়েছো তো বাবা, বাইসেপ্স কত?"

মুখ খুলতে না খুলতেই ক্যাথ চা আর নুডুল নিয়ে এলো। "আরে তোদের কই? আমি কি একা খাবো?"

"আমরা খেয়েছি ড্যাড। তুমি খাও, আসলে উই ওয়ের থিঙ্কিং টু গো আউট ফর ডিনার এন্ড আফটার দ্যাট, উই হ্যাড এ প্লান ফর নাইট ক্লাব।"

"ওরে সর্বনাশ! সে তো বড়ো গোলমেলে জায়গারে মা! তা টিটোবাবুর ওপর আমার পূর্ণ আস্থা আছে - যা ভাজে ভাজে ট্রাইসেপ বানিয়েছে আমার রাজকন্যের ধারে কাছে কেউ আসতে পারবেনা। তা এই বুড়ো বাপকে সঙ্গে নিবি নাকি? যদিও জেটল্যাগ চলছে, কানে তালা লেগেছে এই চোদ্দ ঘন্টার একটা উড়োন - খাটালায় বসে, তবুও তালে ঠিক আছি, জাতে মাতাল হয়েও, তালে তাল মিলিয়ে নাচতে পারব, ওই ডি জের উৎকট ছন্দে।"

"বাট, ড্যাড ইউ ক্যান্ট গো আলোন, নিড টু হ্যাভ এ ফিমেল একোম্পানিওন।"

"বলছিস? তা তোর পিতৃদেবের বান্ধবীর অভাব? দাঁড়া! ফোনটা চার্জে বসা, এডাপ্টারটা গেলো বার কিচেনটপের ভার্সের মধ্যে রেখেছিলুম বোধহয়, দেখ দেখি।"

অর্ণব উঠে প্লাস্টিক ল্যাভেন্ডার গোঁজা কাঁচের ফুলদানিটা দেখতে গেলো, "ড্যাড! দ্যাট নট আ ওয়াইস প্লেস টু কিপ ইওর চার্জার?"

"ওই জন্যই তো বলি তুই চল আমার সাথে, বুড়ো ছেলেকে শাসনে রাখতে তোর মতন একটা কড়া মা লাগে, বুঝলি?"

ফোনটা চার্জে বসিয়ে, অর্ণবকে বললো, "দেখতো বাবা, ঐখান থেকে ইভগেনিয়ার নাম্বারটা এই কাগজে একটু টুকে দাও দেখি। বয়েস হয়েছে তো, একবার সোফায় বসলে উঠতে ইচ্ছে করেনা।"

"তা তুমি এতো আশুওর কি করে হোচ্ছ যে এই রাশিয়ান বান্ধবী তোমার সাথে যাবেনই?"

"আরে আমাদের রোজ কথা হয়,ও বসে আছে আমার সাথে দেখা করবে বলে। ও আমার কলকাতার বড়ো ক্লায়েন্ট। আমি জানি ও আজ রাতে ফ্রি আছে।"

"ডেন দ্যাটস খুল - আই মিন ওয়ান্ডারফুল।"

"কেন রে মা? আমাকে নিয়ে যেতে আপত্তি থাকলে বল? আমি কুইট করছি, এমনিতেও শরীর ছেড়ে দিয়েছে এই সোফায়।"

অর্ণব অনধিকার প্রবেশ করে বললো, "সেকি! কাকু, আপনি চলুন, আপনি থাকলে আমার দেহরক্ষী হিসেবে কাজের চাপ একটু কমবে।"

"আরে দেখো কি সৌভাগ্য, মেঘ না চাইতেই জল... হোয়াটসঅ্যাপে ইভগেনিয়া বলছে এখানে আসবে লিখে দিলাম আমাদের প্ল্যান ... কিরে মা, তোর কোনো আপত্তি নেই তো?"
ক্যাথ নিমরাজি হয়ে মৌনতা সম্মতি লক্ষণ দেখালো।

পঞ্চম অধ্যায়

শিরশিরে হেমন্তের একটা সন্ধ্যে। সাদা ধুলো মাখানো কুয়াশার একটা চাদর জেনো পাতা ব্যস্ত মহানগরীর উপর। সদ্য বিবাহিতা কন্যার মতো ঢলঢলে রূপের লাবণ্যের ঢল নেমেছে তিলোত্তমার শরীরের আনাচে কানাচে । সারিসারি টুনি লাইটে সাজানো তার সর্বাঙ্গ। এ কোনো পার্বনের সাজ নয়, এ ধনী গিন্নিমার রোজকার স্বর্ণাভরণ। চওড়া মোটা সিঁথির সিঁদুরের ন্যায় থমকে পড়া যানজট। লাল আলোর উজ্জ্বল বিন্দু ওই ট্রাফিক লাইটে আটকে পরা দৈনন্দিন পথচারীদের বিরক্তির নিঃশাস। ফোনে মুখে গুঁজে রামুদার গাড়ির পিছনে বসে অপেক্ষা রত সেন দম্পতি।
এক চুল নড়ছেনা গাড়ির চাকা। কৌশিক, কৃষ্ণাকে বুঝিয়ে দিচ্ছে কাল প্রফেসর প্রিমরসের সাথে কি কি তুলে কথা বলবে তার পুঙ্খাণুপুঙ্খ তাৎপর্যের চিত্রাবলী। গলার সুরে কড়া আদেশ, কাগজে কলমে সব কথার মোটা সবুত জেনো গুছিয়ে রাখে সে।

অন্য দিকে প্রানভরে অপর্ণা আকণ্ঠ পান করছে আদিত্যর পাঠানো উড়োচিঠি গুলির মাতাল করা কারণ সুধা।

ফোনের নীল পর্দায় আদিত্যর পাঠানো, লাল হরতনের দুটি সাংকেতিক চিহ্ন, অপর্ণার উপোষী দেহে যে ওই দুটিকে দেখেই যে গলিত লাভার উষ্ণ স্রোত-ফল্গু ধারা হয়ে নামাতে পারে তা,এই উনচল্লিশ বছরের জীবনের আজ প্রথম অভিজ্ঞতা ।

প্রেম যে এতটা বেপরোয়া হয়, জীবন তার কাছে তুচ্ছ, স্বামী, কন্যা, সমাজ কে এক কথায় পিছনে ফেলে - কানসাস পাড়ি দিতে চলেছে, তাও অপর্ণার অবিশ্বাস্য লাগছে। এ যেন অপর্ণার গোপন অভিসারের এক নতুন অভিজ্ঞান। আদিত্য তাকে বিবাহের প্রস্তাব দিলেও, সে জানে তা এক অলীক কল্পনামাত্র। কিন্তু যে ভাবে পিপীলিকা হয়ে, পাখা মেলে আদিত্যর প্রেমের বহ্নিশিখায় ঝাঁপ দিচ্ছে তার সুদূর প্রসারী ফল যে মিঠে নয় তা ঠাহর করতে পেরেও, কোনো লাগাম দেয়ার ক্ষমতা সে হারিয়েছে।

গাড়ির এই যান সংকটের চক্রব্যুহের থেকে বেরোনোর উপায় নেই দেখে বিরক্তি প্রকাশ করলো কৌশিক। বেগতিক বুঝে ল্যাপটপ খুলে কালকের প্রস্তুতি গাড়িতেই শুরু করে দিলো।

অপর্ণা নির্বিকার। আদিত্য মিটিং এ আছে। তবুও ক্ষতি নেই কিছু পুরোনো কথোপকথন পড়তে পড়তেই চোখ বুজে অনুভব করে তাদের মিলনক্ষণ। অপর্ণা এখনো দোনোমনায় আছে, হয়তো কানসাসে গিয়ে সে আদিত্যর সাথে এক বিছানায় শুয়েও, তাকে প্রবেশের অধিকার দিতে পারবেনা তার ভালোবাসার কানাগলিতে। হাজার হোক, সে কৌশিকের বিবাহিতা স্ত্রী। অন্তরার মা। সেন বাড়ির কুলবধূ।

কুলের লক্ষীর কি পরপুরুষের সাথে নষ্টামী করা সাজে? স্বর্গীয় পিতা কে সে মনে করে তারই শরীরের আরেকজন বাসিন্দা। নিজের জিন যেটা সে বহন করেছে, সেটা তার পিতামাতার সত্ত্বা, তাদের অপমান করার ধৃষ্টতা তার নেই। যাঁর প্রচেষ্টায় আজ সে কলকাতার প্রথম সারির ফটোগ্রাফারের নাম করেছে সে-কি জবাব দেবে তাঁর পরলোকগত শ্বশুর মশাইকে?

নানান দ্বন্দ্বের জালে আটকে পড়া গুবরে পোকার মতো অসহায় গুটিয়ে থাকা শুভ চেতনা, আর বারংবার তাকে জেরবার হতে হয়। দুস্টু কাম নামক মন মাকড়সার বিষ দন্তের দংশন যন্ত্রনায়। শরীর চায় সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে আদিত্যর সুঠাম বাহু বন্ধে ধরা দিতে, মন চায় আদিত্যর নামের পাল তুলে ডুবতে রাজি হতে প্রেমের উজান ভাটায়।

সংস্কারের বেড়া জাল চাবুকাঘাত করে দিবা রাত্র। দগদগে ঘা দিয়ে অনুশোচনার রক্তপাত নীরবে অবলোকন করেও, মলম দেবার জন্য আদিত্যকেই প্রয়োজন হয় তার। আদিত্য বলে, পৃথিবীর মহাকাব্য পড়তে, তাহলে সব পাপের পাপশখলন হবে। ইতিহাস তাকে সঠিক পথের সন্ধান দেবে। যুগে যুগে এই রকম প্রেমের ভুঁড়ি ভুঁড়ি অজুহাতের নজির দেখায় সে। কিন্তু অপর্ণা তার ডান হাত কে বাম হাতের ওপর রাখতেই সেই অজুহাত ফনা তুলে সর্প দংশন করে। অপর্ণার উপোসী কামাতুরা শরীর পুরুষ স্পর্শের জন্য অরণ্যে রোদন করে।

ধীরে ধীরে রামুদার গাড়িতে ফুরফুরে ঠান্ডা বাতাস ঢোকা শুরু হয়। কৌশিক ল্যাপটপ বন্ধ করে চশমা নাকেই ঘুমোচ্ছে। অপর্ণা পাশের বস্তিতে তাকায়, কি প্রবল প্রাণ ঐ ঝুপড়ি গুলোয়। তার কেরিয়ারের প্রথম সোপান ঐ মানুষগুলোর জীবনযাত্রাকে কেন্দ্র করেই শুরু। তখন রামুদা ছিলোনা, শ্বশুর মশাই ই তাকে গাড়ি চালিয়ে নিয়ে আসতেন এখানে, কতো কি শিখিয়েছেন হাতে ধরে। তাঁর অবদান ভুলতে পারবে না সে, ওই ঋণের শোধ দিতে হবে তার ব্যর্থ দাম্পত্য জীবনের নাটক চালিয়ে যাবার মধ্য দিয়ে। কি অসহ্য এই দায়বদ্ধতা,-উনি বেঁচে থাকলে আজকের পরিস্থিতির সমাধান জিজ্ঞেস হয়তো করা যেত। পরলোকের মতো নিষ্ঠুর জায়গায় একটা যদি চিঠি পাঠানোর পোস্ট বক্স থাকতো!

এই সব আলফাল চিন্তার পর ক্লান্তি নামে শরীরে। ক্লান্ত শরীরটা এলিয়ে দিলো নরম গাড়ির সোফায়। জানালার কাঁচটা তুলে দিলো, ধুলো আসছিলো বলে। রামুদা, এফ এম এর আওয়াজটা মিষ্টি মধুর করে দিলো, তার বাবু ঘুমিয়ে পড়েছে দেখে।

বড়ো রাস্তা ছেড়ে গলির মুখে ঢোকার সময় একটা মোচড় খায় গাড়িটা, ল্যাপটপটা কৌশিকের কোল থেকে পড়েযেতে পারে ভেবে, আলতো করে নিয়ে, ওর ব্যাগে পুড়ে দিলো অপর্ণা।

কৌশিকের দিকে তাকিয়ে কেমন যেন মায়া হলো, সব কিছু মিলিয়ে মানুষটা বড্ডো সাদামাটা। চাহিদা একদম নেই জীবনের কাছ থেকে। দশ টা পাঁচটার প্রফেসারী,

আর এসে মেয়ে পড়ানো বাদে, রাতে খাবার সময় সাড়ে ৯টার খবর শোনা, এর বাইরের যে কোনো জগৎ আছে তা, তার অজানা। শেষ কবে দুজনে সিনেমায় গেছে তাও মনে পড়েনা অপর্ণার। অপর্ণা আবেগপ্রবণ হয়ে বসার ঘরে কৌশিকের পাশে নিবিড় ভাবে বসতে এলে ভয় পেয়ে বলবে "মেয়ে বড়ো হচ্ছে,এখন এইভাবে বসে না।" যখন নতুন বৌ ছিলো অপর্ণা, পাশে হাঁটার সময় হাত ধরলে বলতো, "এ বাবা পাড়ার কাকুরা দেখলে নির্লজ্জ, বেহায়া বলবে"। সব উদ্দমতা ওই বিছানার খটকটানির তালে তালমিলিয়ে না করলে, আভিজাত্যের কাঁথায় যেন আগুন লাগবে।

অপর্ণার দৃঢ় বিশ্বাস সেদিন ও কানে যেটুকু শুনে ছিল তার পুরোটা চরিতার্থ করার সামর্থ্য কৌশিকের নেই। অপর্ণা যে ভাবে সক্রিয়তা দেখিয়েও কৌশিকের সুপ্ত আগ্নেয় গিরির নিস্তেজ জ্বালামুখীর লাভা স্কলন ঘটাতে পারেনা, বা সময়ের বহুপূর্বেই তার বিসুভিয়াসের পদশখলন ঘটে। তার পক্ষে কৃষ্ণার মতো ওই শুকানো শরীরে কৌশিক কী দিতে পারবে তার যথার্থ পুরুষ্যত্বতার নিদর্শন?
কৃষ্ণা কোনো অংশেই অপর্ণার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবে না। রূপে, গুনে সে অনেক বেশি ধনী কৃষ্ণার চেয়ে। তাই কৃষ্ণার অজুহাতটা আদিত্যর ইতিহাসের মহাকাব্যের অজুহাতের চেয়েও মূল্যবান অপর্ণার কাছে। এই মুহূর্তে অপর্ণার তুরুপের তাসও বলা যায়।
কিন্তু তবুও এই আঠারো বছরের দাম্পত্য তালমাটালের মধ্যেও কোথায় যেন কৌশিকের প্রতি ক্ষোভের চাইতেও মায়ার জন্ম নিয়েছে অপর্ণার মনের মাটিতে। সম্পর্কের মহীরুহটা সমূলে উৎপাটনের জন্য যে ধারালো করাত লাগবে, সেটা অপর্ণাকে বারংবার খুঁজতে বলছে আদিত্য। কিন্তু না খোঁজার ভান করে মায়ার আস্তাকুঁড়ে ছুড়ে ফেলেছে সে নিজের অজান্তেই। কৌশিকের প্রতি দায়িত্বটা সে এড়িয়ে আদিত্যর কাছে সে যেতে পারছে না। অথবা, সেন বাড়ির লক্ষণ রেখার গন্ডি পেরোনোর মতো দুঃসাহস নেই তার।

পর্ব ৭

প্রথম অধ্যায়

ইভগেনিয়া ঘড়িতে আটটা বাজার আগেই দরজায় কড়া নাড়লো। সোহম এতক্ষন অনেক কোমরের ব্যাথার গল্প দিচ্ছিলো। ইভগেনিয়ার করোতান শুনেই ধড়মড় করে সোফা ছেড়ে উঠে, বাচ্চা ছেলের মতো ছুট্টে গিয়ে দরজা খুলে গলা জড়িয়ে ধরলো। ক্যাথ এইসব দেখে একটু সঙ্কুচিত চিত্তে পেছনের বারান্দায় চলে গেলো। অর্ণব বুড়ো বুড়ির প্রেমের কাবাবে হাড্ডি হবেনা বলে ক্যাথের পিছু নিলো।
"তুমি এখানে কি করছো ক্যাথ?"
ক্যাথ হকচকিয়ে দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে বললো, "আই ক্যান্ট বিয়ার ডিস্ এনিমোর। ডা সেম রিপিটেশন এভরিহোয়ার।"
অর্ণব ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললো, "আমি আছি, তোমার পাশে। নাউ ওয়াইপ ইওর টিয়ার্স।"

"সবাই যার যার পার্টনার খুঁজছে, মধ্যিখানে আমি এঁটোকাঁটার মতো পরে আছি পাতের একপাশে।"

"আই এম প্রাউড ওফ ইউ।"

"হোয়াই?"

"১ নম্বর কারণ: তুমি পুরোদস্তুর বাঙালিদের মতন এতো সুন্দর একটা বিশেষণ প্রয়োগ করলে বলে।
২ নম্বর: তোমার মধ্যে অর্ধেক বিদেশী রক্ত বইলেও তুমি খাঁটি বাঙালি।"

"হোয়াই আর ইউ সেয়িং সো?"

"দেখো বিদেশী রক্ত থাকলে তুমি তোমার বাবা মার এই পার্টনারের সাথে থাকাটায় গায়ে ফোস্কা পড়তো না। আরে টেক ইট ইসি.... ওরাও মানুষ। তোমার যেমন আমাকে ভালো লাগে, আমার সাথে থাকো, ওদেরও তো একজন সঙ্গী চাই, নাকি? তোমাকে তো তোমার মা-বাবা, দুজনেই খুব ভালো বাসেন। শুধু তাই নয় তোমার স্টেপ ফাদার, হাফ ব্রাদার সবাই তোমাকে তোমার যোগ্য সন্মান দেয়।

বিশেষ করে পিতৃকুলের তুমিই একমাত্র উত্তরসূরি বলে, তারা তোমায় মাথায় করে রেখেছে, আমি নিজেই শুনেছি তোমার ভয়েস মেল গুলো। কেন কাঁদছো, তুমি?"

ক্যাথ অর্ণবকে আষ্টেপিষ্টে জড়িয়ে ধরলো । অন্ধকারে ওই রকম আবেগ ভরা মুহূর্ত সামলানো মুশকিল তার পুরুষালি পেশির জাগরিত অভুথ্যানের দমন। তবু চোয়াল শক্ত করে বলে,বললো, "আর পরীক্ষা দিতে পারছিনা। ছাড়ো এবার, আমিও তো রক্তে মাংসে গড়া ক্ষুদ্র একটা মানুষ, এই রকম করলে আর কতদিন সামলাবো জানিনা।" মনে মনে বললো, "অন্তরা আমায় ক্ষমা কর, তোর পোষা ছুঁচোটা বড্ডো বেয়ারা হয়ে আজ বেয়াদপি করছে।"
প্রসঙ্গ পাল্টে বললো, "ক্যাথ তোমার আজ সন্ধ্যে দেওয়া হয়নি, তুলসী গাছটাতে একটু জল দাও, শুকিয়ে যাচ্ছে ওটা।"
ক্যাথ তড়িঘড়ি, একঘটি জল নিয়ে ব্রিটিশ একসেন্ট এ মন্ত্র উচ্চারণ করে জল ঢালতে লাগলো –

"থুলসি থুলসি নারায়ণ,

ঠুমি থুলসি বৃন্দ্যাভ্যান,

থমার ঠলে ঢালি জল।

অন ঠিম খালে...."

মন্ত্র শেষ হতে না হতেই, সোহম এসে বললো, "আই এম সার্চিং ইউ গাইস এভরিহোয়ার, খাম -ইভ, মিট উইৎ মাই ডটার ক্যাথেরিন এন্ড হার বয়ফ্রেন্ড অর্ণব।"

ক্যাথ শুকনো মুখে বললো, "প্লেজার টু মিট ইউ।"

অর্ণব হাসি মুখে বললো "হাউ ডু ইউ ডু?"

ইভগেনিয়া উচ্ছসিত অষ্টাদশী যুবতীর মতো বললো "আই এম ভেরি ওয়েল, থ্যাংক ইউ ইয়ং ম্যান! সো নাইস টু মিট ইউ বোথ।"

ক্যাথের দিকে তাকিয়ে বললো, "আই হ্যাভ হার্ড সো মেনি গুড থিংস আবাউট ইউ ফ্রম সোহম, উই আর ডা বেস্ট ডটার ইন হোল ওয়ার্ল্ড এন্ড আই ক্যান সি ডট্ রিয়ালিস্টিক্যালি। গর্জিয়াস ইয়ং লেডি, নো ডাউট, সোহম ইস এ লাকি ফাদার ।"

সোহম ওকে থামিয়ে বললো, "শ্যাল উই মুভ অন টু ওয়ার্ডস আ ওয়ার নাইট সাফারি?"

ক্যাথ স্বাভাবিক গলায় জিজ্ঞেস করলো, "ডু ইউ নিড এনিথিং টু ড্রিংক ওর এস এ রিফ্রেশমেন্ট ?আফটার অল ইউ আর ফার্স্ট টাইম হিয়ার।"

"নো ডিয়ার, আই এম অবসোলুটলি ওকে,থাঙ্কস এ লট ফর আস্কিং দো।"

অর্ণবের ওর রাশিয়ান একসেন্টটা দারুন মজার লাগছিলো।

সবাই রাতের পৃথিবীতে পাড়ি দেবার পূর্ব প্রস্তুতি নিতে লাগলো। গাড়ির ড্রাইভার ফোন করে তার উপস্থিতির অগ্রিম বার্তা জানিয়ে দিলো। গাড়ি চললো রক ব্যান্ডের তালে হুশ হুশিয়ে... কখনো সবুজ আবার কখনো লাল আলোর আলোকতরঙ্গের ছন্দের সুরে ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

রামুদা, গাড়ি গ্যারাজে ঢোকাতে ধড়মড়িয়ে উঠলো কৌশিক। অপর্ণা ইতিমধ্যে কৌশিকের ব্যাগ, ল্যাপটপ নিয়ে নেমে পড়েছে। কৌশিক একটু লাজুক মুখে ভুঁড়িটাকে গাড়ির দরজা দিয়ে সযত্নে বেরকরে প্যান্টের বেল্টটা দেহ ঝাঁকিয়ে উঁচিয়ে নিলো কোমরের উপর। গায়ে ছাই রঙা অপর্ণার হাতে বোনা হাফ হাতা সোয়েটার। হাত ছড়িয়ে লম্বা করে আড়ামোড়া ভেঙে শরীর টান করে, বেশ খোশ মেজাজে ঘরে ঢুকলো।
মিক্সির তীব্র ঘরর ঘরর আওয়াজে সরগরম বাড়ির আবহাওয়া।
"গোপালের মা, এতো আওয়াজ কিসের?" কৌশিক জিজ্ঞেস করলো।
ঘরে টুক করে গাড়ির চাবি রেখে, রামুদা আজ রাতের মতো গ্যারাজের পেছনের খুপরিতে ঢুকে পড়লো।
রামুদা মোড়ের হোটেলে খেতে যাবে একটু পরেই, তাই গোপালের মা কান খাঁড়া করে রাখে গেট খোলার, দরকারি কিছু বানানোর থাকলে হাঁক দেবে তাকে। কর্তা বাবুর এরমধ্যের এহেনো প্রশ্নে একটু বিরক্তির সুরে জবাব দিলো, "কালকেরে অঘ্রানের বড়ি দিবার পার্বণ আচে গো দাদাবাবু, বড়মা তাই ডাল বেটে রাখতি

কোয়েচেন। রেতের খাবার টেবিল কি লাগাইবো, বৌদিমনি?"

"তুমি সব টেবিলে রাখো, আমি বেড়ে দিচ্ছি। মা কি খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন?"

"হ্যা হ্যা, তেনার একোন মাঝরাত। আটটায় নিয়ম করি আন্নিকের পর দুটো রুটি আর তক্কারি খেয়ে আলো নিবে গেচে, উনার ঘরে।"

"আজকাল মা নিজেকে একদম গুটিয়ে নিচ্ছেন আমাদের থেকে। এ একরকমের ঘরেই তাঁর বানপ্রস্থ যাপন।"

কৌশিক এক কানে শুনে, আরেক কানে কথা গুলো বার করে শোবার ঘরে ঢুকে অন্ধকারেই জামা কাপড় ছাড়তে লাগলো। অপর্ণা উঁচু গলায় অন্তরাকে ডাকলো নিচে খেতে আসার জন্য।

এই হেমন্তেও গুনগুনিয়ে ফ্যান চলছে অন্তরার ঘরে। হাতের দুই বুড়ো আঙ্গুল পটাপট চিপে ফোনের পর্দায় অর্ণবকে উৎকণ্ঠার সাথে জিজ্ঞেস করছে, "কি কি করবি ভাবছিস, আজ রাতে? ক্যাথ কে চুমু খাবার মতলব নেই তো তোর? ও ঠোঁট কিন্তু আমার দখলে, আর ক্যাথের গায়ে হাত লাগানোর ধান্দায় আছিস? ও হাতের ১০টা আঙ্গুল ও আমার, শুধু আমার শরীর কে আনন্দ দেবার জন্য"।
ও দিক থেকে বাধ্য ছেলের মতো জবাব আসছে - "সব কিছু তোর কাছেই জমা রাখা বাবু, এ তো আমার প্রানলেসহীন জম্বি যাচ্ছে ক্যাথের সাথে। তোর পোষা ছুঁচোটাও চেনের তলায় শক্ত করে বন্ধ আছে।"

"ওই ছুঁচো পর্যন্ত্য গেলে তোর মুণ্ডপাত করবো, বলে রাখলাম।"

"যো আজ্ঞা বিবিজান।"

"নিচে মা খেতে ডাকছে, হ্যাভ টু গো - তুই খুব সাবধান - ক্যাথ কিন্তু বিদেশী টেকনিক চালাবে তোকে বুস্ট আপের জন্য। ভুলে যাসনা তুই আমার, ভুললেই - খাবি এক গাঁট্টা।"

ওদিক থেকে উত্তর এলো শুধু "বাই ই ই ই " সঙ্গে ছুঁড়ে দেয়া লাল হরতনি সংকেত।

কৌশিক গলা চড়িয়ে বললো, "নিচে নামার সময় কে সি নাগের প্রপোরশনের প্রবলেম গুলো নিয়ে নামিস রে - মা"।
অন্তরা ধমধম আওয়াজ করে সিঁড়ি দিয়ে সশব্দে নেমে, খাতা পেন্সিল নিয়ে লক্ষী মেয়ের মতো বাবার পাশে বসলো। বাপ্-বেটিতে মুখ গুঁজে চললো অংকের বোঝা পড়া আরেক দিকে ভাবলেশহীন ভাবে খেতে হয় তাই খাওয়ার পালা।
অপর্ণার আজ অফিসে এক বাস্ক লাড্ডু প্রাপ্তি হয়েছে বসের মেয়ের ছেলে হয়েছে বলে, সবার পাতে লাড্ডু দিয়ে, বাকি প্যাকেটটা গোপালের মার ঝোলায় পুড়ে দিলো।

"সবটা দেতেছো? রাখবেনি কিছু ঘরের জন্নি ?

"কার জন্য রাখবো? মেয়ের ডায়েটিং, তোমার বড়মা খাবেন না, আমি খাইনা, বাকি ফ্রিজে থাকলেই সব তোমার দাদাবাবুর পেটে যাবে, ভুঁড়িটা দেখেছো?"

কৌশিক অঙ্ক ছেড়ে ফোঁস করলো "পিওর মাসেল - এই ভুঁড়ি না থাকলে বাঙালিকে খাঁটি বাঙালি মনে হয়না বুঝলে, এ আমাদের বংশ অধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ধনও বলতে পারো।"

অন্তরা ফিক করে হেসে বললো, "বাবা এবার একটু জিম করো।"
কৌশিক প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে কড়া গলায় বললো, "নিউমেরেটার বড়ো, ডিনোমিনেটর ছোট হলে ওই ভাবে রাখা যায়?"
গোপালের মা খেয়ে মুখ আঁচিয়ে এক গাল হেসে লাড্ডুর প্যাকেট নিয়ে গদোগদো মনে বিদেয় নিলো।

অপর্ণা দ্রুত খবরের কাগজে চোখ বুলিয়ে, খাওয়া শেষ করে ফোনটার চার্জার নিয়ে বাবা মেয়ের থেকে দূরে সোফায় গিয়ে বসলো।
আদিত্য আজ ওকে ওর স্নান করার কিছু ফটো পাঠিয়েছে। দেখার সাথে সাথে, অপর্ণা হাওয়ায় কথা ছুড়ে

বললো, "খেয়ে যার যার প্লেট সিংকে নামিয়ে দিতে ভুলো না " বলেই ফোন হাতে সোজা দোতালার বাথরুম।
ফোনটাকে তাড়াতাড়ি প্লাগে বসিয়ে, খুব কামার্ত চোখে আদিত্যর এককপেশীর ভাঁজ নিপুন ভাবে অবলোকন করতে লাগলো। কান গরম,বুকের হাঁপড়ে কেউ দামামা পিটছে। ধীরে ধীরে নিরাবরন হয়ে আয়নায় দাঁড়ালো।
খুব ইচ্ছে করছিলো আদিত্যর এতো বার করে চাওয়ার প্রতিদানে একটা নগ্ন ছবি সে পাঠাক, কিন্তু হাত কাঁপছিলো, একটু অকুতোভয় হয়ে তুলেও, মন কুঁকড়ে গেলো কেঁচোর মতো, সেন্ড বোতামটা আর টেপা হলো না তার।

চক্ষু মুদে এলো আমেজে। নিজের বাম হাতটা এলোপাথাড়ি বোলাতে লাগলো সারা শরীরে, সামনে আদিত্যর আদিম মানব শরীর। ফোনটাকে দুই বক্ষ পেশির মধ্যে ধরে, কাকুতি মিনতি করতে লাগলো নিজের কামরিপুকে বের করানোর জন্য। প্রায় কয়েকমাসের উপোষী দেহ, দুধের স্বাদ ঘোলে মিটিয়েই ক্ষান্ত হলো।
ঠ ক ঠ ক ঠ ক ...
"আর কতক্ষন? এবার শোবে এসো।"
দরজার ভিতর থেকেই বললো, "তুমি শুয়ে পরো, আমার দেরি হবে।"
স্নান সেড়ে অপর্ণা বেরিয়ে দেখলো কৌশিক কামাতুর চোখে অপর্ণার দিকে বিছানা রেডি করে অপেক্ষা করছে।
অপর্ণা বেশ কর্কশ গলায় বললো, "আমার এডিটিং আছে। কাল জমা দিতেই হবে।"

"শরীর ভেঙে যাচ্ছে তোমার, চোখের তলায় রাত জাগার ছোপ পড়ছে।"

"ও তোমার চোখের পাওয়ার বেড়েছে বোধয় কালকে চোখ দেখিয়ো সময় পেলে।"

অপর্ণা দরজা খুলে বেরোতে যাচ্ছে এমন সময় কৌশিক উত্তেজিত হয়ে ওকে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরে জোর করে চুমু খেলো। অপর্ণা ঝটকা মেরে সরিয়ে বললো, "কৃষ্ণা আর বলছে না বুঝি, ইউ ক্যান হ্যাভ মি?"

"তুমি কেন পুরোটা না শুনে, না দেখে ওটাকে ইস্যু করে আমাদের সোনার সংসার ভাঙছ?"

"আমি ক্ষমা করবো না তোমায় কোনোদিন, কান খুলে শুনে রাখো, আমি আমার মেয়ে নিয়ে দিল্লি চলে যাবো ওর পরীক্ষার পর।"

"সেদিন কিচ্ছু হয়নি, আমি নিরাপরাধ। তুমি লঘু পাপে গুরু দণ্ড দিচ্ছ। কি করলে তুমি আবার আগের মতো হবে, বলো? আমি তাই করবো?"

"আমি কোনোদিনই আর তোমার সাথে শোবোনা, মন থেকে সে ইচ্ছা আর জাগবে না।"

"কেনো জাগবে না, আমি জাগাচ্ছি এসো তুমি।"

"শিখছো যেখান থেকে সেখানে এপ্লাই করলেই আমি খুশি হবো" বলে খট করে দরজা বন্ধ করে চলে গেলো কৌশিককে পেছনে ফেলে।

ভ্যাবলার মতো ফ্যালফেলিয়ে অপর্ণার সুন্দর দেহের দিকে তাকিয়ে থাকা, কামের মোহে কাঁপতে থাকা শরীরটাকে বিছানায় টেনে নিয়ে গিয়ে ল্যাপটপ খুলে রিপু রহস্যের অমনিবাস দেখতে দেখতে বুকে হাতবোলাতে লাগলো সে।
অপর্ণা রোজকার মতো উদ্দাম উড়ন্ত ভেলায় চেপে আদিত্যর প্রেমসাগরে পাল তুলে দিলো উজান স্রোতে।

তৃতীয় অধ্যায়

"ভিগে হোঠ তেরে - প্যাসা দিল মেরা... লাগে অমৃত সা -ই য়ে তন্ তেরা।"

রাতের মায়াবী ধুলোর মোড়কে আবৃত সুন্দরী তিলোত্তমার নিটোল দেহ। এফ এম এর মাতাল করা গানে কাঁপছে সদ্য যৌবন প্রাপ্ত দুই অধর। টয়োটা ল্যান্ড ক্রুইজার, উড়ন্ত রথের মতো যানজটের গিঁট কেটে বেরিয়ে যাচ্ছে। সামনের ড্রাইভারের পাশটা খালি, সিটের মধ্যের জায়গাটা ছেড়ে, সিটবেল্টের সাথে জানালার দুই পাশে বসেছে ইভগেনিয়া আর সোহম। পেছনের সিটে ক্যাথ আর অর্ণব, কোনো সিটবেল্ট না পরে যতো নিবিড় ভাবে বসা যায় তারা ঠিক সেই ভাবেই বসে।

সোহম আর ইভ দুজনে নানান ব্যাবসায়িক আলোচনায় মত্ত। সামনের সিটের ড্রাইভার বারংবার ফ্রন্ট মিররে এমন ভাবে দৃষ্টিপাত করছে যেন ও সন্দেহজনক চোখে গোয়েন্দাগিরি করছে পেছনের দুই কপোত কপোতীর ওপর।

আসলে চোরের মন বোঁচকার দিকেই থাকে, তাই ড্রাইভারের নিয়মিত পেছনের যানবাহন এর নজরদারিটা অর্ণব - ক্যাথের ফৌজদারি মনে হচ্ছে।

ক্যাথ হাতের মধ্যে এতক্ষন জাদু দেখাচ্ছিল বিভিন্ন ছলা কলায়, হঠাৎ বেপরোয়া হয়ে অর্ণবের মোক্ষম জায়গায় হাত দেয়া শুরুকরলো। অর্ণব মনে মনে হরিবোল হরিবোল করতে করতে ক্যাথের আদরেও সিঁটিয়ে কাঁটা হয়ে পরে রইলো জ্যান্ত মরার মতো।

অন্তরা ঠিকই বলেছিলো, ক্যাথ বিলেতি টেকনিক এর ভেলকি দেখাবে আজ।

জিন্সের তলায় টনটন করছে ওর শক্ত পেশীটা। আর বর্ধিষ্ণুতা দেখানোর মতো জায়গার সন্তোলনের অভাব দেখে, অর্ণব ক্যাথের কানে ফিসফিসিয়ে বললো, "তুমি কি বাবার সামনেই করতে চাও? না চাইলে আমাকে মুক্তি দাও। আমার শরীর অতি মাত্রায় সম্পৃক্ত হয়ে গেছে, এবার পে লিটিল মার্সি অন মাই লিটিল ওয়ান।"

ক্যাথ লজ্জায় অর্ণবের ছড়ানো সুসজ্জিত বক্ষ পেশিতে মুখ গুঁজলো। রিপু-শিহরণে কম্পিত দেহ, অর্ণব যতনে মাথায় হাত বুলিয়ে তাকে কোনোমতে বাগে আনলো।

নাইট ক্লাবের সামনে উপচিয়ে পরা কিশোর কিশোরীর ভিড়। শকুনের দৃষ্টিতে নজরদারি করছে একজন হুমদো হুলো, আর তারই পাশে একটা শুঁটকো লোক হাতে বেঁধে দিচ্ছে চারশো টাকার টিকিটের প্রমাণপত্র।

ইভ আর সোহম শান্ত ভাবে ভেতরে প্রবেশ করে, নিরিবিলিতে বসে মদিরার পেয়ালার ফোয়ারা ছোটালো। অর্ণব আর ক্যাথ তাদের দেহের সামর্থ্য মতো কারণসুধা গলায় ঢেলে, অপরাধ প্রবণতায়, ডি জের লয়ের ছন্দে আনন্দের পালকিতে সওয়ার হয়ে চক-মকি আলোর ছায়াবীথি তলের মাধবীলতাদের ভিড়ে নিজেদের লুকিয়ে নিলো।

ক্যাথ জোর করে অর্ণবের হাত দুটো তার দেহের সুউচ্চ মালভূমিতে স্থাপন করে আমোদে চক্ষু মুদলো। কানের পর্দায় কেউ যেন উচ্চনাদে দামামা পিটছে। অর্ণবের পুরুষতার একটু ছোঁয়া পেতে আশেপাশের সুন্দরী তনয়ারা তাদের বিভিন্ন অছিলায় কখনো নিজেদের নিতম্ব- কখনো তনুর স্পর্শ কাতর দুই বিন্দুর ছোঁয়া দিয়ে রসিকতা করে চলে যাচ্ছে।

অর্ণবের নিজেকে বেশ গোপিনী বেষ্টিত কলির কেষ্ট মনে হচ্ছিলো। কিন্তু অন্তরার জন্য বুকটা মাঝে মধ্যে মুচড়িয়ে উঠছিলো। ও তো প্রতিশ্রুতিবদ্ধ তার বাগদত্তার কাছে। কোনো ভাবেই অন্তরার হাতে কেটে দেওয়া লক্ষণ রেখা সে উল্লঙ্ঘন করবে না।

ক্যাথ হঠাৎ অর্ণবের গায়ে পুরো দেহের ভার ছেড়ে দিলো। প্রথমটায় অর্ণব আদিম রিপুর উচ্ছাস ভেবে অতটা আমল দেয়নি, পরে এটা স্বাভাবিক মনে না হতে ও তাড়াতাড়ি নীপবন এর ছায়াতল থেকে বের হয়ে সোহমের কাছে নিয়ে এলো।

সোহম যেখানে ছিল সেখানে সে আর নেই।

শব্দের দাপটে যন্ত্রদানবের হুহুঙ্কারে কর্ণপটহ ফেটে যাবে মনে হছিল, অর্ণবের, সোহমের খোঁজ এযাত্রায় অরণ্যে রোদন অতিরিক্ত আর কিচ্ছু নয় দেখে, কিংকর্ত্যব্য বিমূঢ় হয়ে, কিয়দক্ষন ক্যাথের ভাবলেশহীন নিথর শরীর আগলে বসে রইলো,পাছে সোহম ফেরত আসে তার প্রাক্তন স্থান পূরণ করতে, কিন্তু ক্যাথের অবস্থা ভালো না বুঝে, ড্রাইভারকে ফোন করে জানালো, গাড়ি গেটের সামনে আনার জন্য। ওদিকে ড্রাইভারের কোনো কথা শুনতে না পেয়ে, নিশ্চিত হবার জন্য লিখে জানিয়ে দিলো, পরক্ষনেই হ্যা-সূচক পাল্টা বার্তা পেয়ে, আর অপেক্ষায় না থেকে, সোজা এস এস কে এম তে পরের ফোনটা লাগালো গাড়িতে বসেই।

অর্ণবের মার ভয়েস মেলে ছেড়ে দিলো বার্তা, "মা -তুমি নার্সিংহোম থেকে যদি বেরিয়ে গিয়ে থাকো, কাউকে রেফার করো, আই নিড ইমিডিয়েট মেডিকেল এসিস্টেন্সি। "

বুক দূর দূর করছে আজ সব জানাজানি হবে মিথ্যে মিথ্যে নাইট ক্লাব পাড়ি দেবার ঘটনাবলী। সাথে ক্যাথের বাড়ির প্রতি শুক্রবারের গ্রুপ স্টাডির মিথ্যে গল্পগাঁথা। খুব অসহায় লাগছিলো।

ক্যাথের ঠোঁট সাদা, সারা শরীর ঠান্ডা। নার্ভটা শুধু ধিমি আঁচে চলছে। অর্ণব ওর সারা শরীরের ওম দিয়ে বুকে চেপে ধরলো ক্যাথকে। চোখ দিকে জল বেরোচ্ছে। ড্রাইভারকে তাড়া দিতে লাগলো। গুটিপোকার মতো আটকে আছে মসলিন লাল সুতোর যানজটের গুটিতে, কেটে বেরোনোর সাধ্যি কার?

তাড়াহুড়োয় ব্যাকগিয়ার দিয়ে গাড়ি অন্য রাস্তায় ঘোরাতেই, সোহমের ফোন - এক কানে ফোন আরেক হাতে স্টিয়ারিং।
পাশের ফুটপাতে হারল গর্তে পরে গাড়ি উল্টোলো। সব নিমেষে অন্ধকার।

চতুর্থ অধ্যায়

পাশের ঘরে বাবা মার মধ্যে একটা মনকষাকষির পর্ব চলছে সেটা শুনতে পেয়েও চুপ করে নিজের বিছানায় শুয়ে রইলো অন্তরা। পাশের বাড়ির ছাদের রেলিং এ মোটা কুঁদো কালো হুলোটা অলক্ষ্মীর মতো বিকট চ্যাঁচাচ্ছে। জানালার খড়খড়িটা ফাঁক করে দিলো, একটু হিমেল হাওয়ার লোভে। মোবাইলে অর্ণবের শেষ হোয়াটসঅ্যাপে টেক্সটটা, সে দেখেছে রাত সোয়া এগারোটায়।
ক্যাথ গাড়িতে বিদেশী টেকনিক চালিয়ে বহু চেষ্টা করেছে অপর্ণার গোলপোস্টে গোল দেবার , কিন্তু তাতেও অর্ণব পটু গোলকিপারের মতো গোলপোস্টের থেকে গোল আটকিয়ে বিজয় ঘোষণার বার্তা ছুড়ে দিয়েছে অন্তরাকে। অন্তরা গর্বিত কোচের মতো বুক ফুলিয়ে ছাত্রের বিজয় পতাকা উড়িয়েছে স-সম্মানে।
শিরশিরে ঠান্ডায় পায়ের পাতা দুটো ঠান্ডা বরফ হয়ে যাচ্ছিলো দেখে ঢেকে নিলো গোপালের মার রোদে গরম করা কম্বলের তলায়।
ধড়াস করে উঠলো বুকটা, অর্ণবের দু দুটো মিস কল এসেছে, যখন সে তিনতলার দরজা বন্ধ করতে গেছিলো, একটু দেরি হয়েছিল আসতে, গোপালের মার (সকালের জন্য বড়ি দেবার) কাচা কাপড় গুলো তুলতে। চট পট ভয়েস মেলের বোতাম টিপলো, "ক্যাথ অজ্ঞান হয়ে গেছে,ওকে হসপিটালে নিয়ে যাচ্ছি, ওর বাবা কে খুঁজে পাচ্ছিনা, আমার মাকেও ফোনে পাচ্ছিনা, তুই একবার দেখনা, বাড়িতে ফোন করে, বল আমি এস এস কে এম এ যাচ্ছি, মা যেন আসে। অন্তরা সঙ্গে সঙ্গে অর্ণবদের বাড়ির ল্যান্ড লাইনে রিং করলো।
ওপাশে ওর বাবার ভারী পুরুষালি গলা, "হ্যালো! কে - অন্তরা মা? তা এতো রাতে?"

"আপনি কি অর্ণবের কোনো খবর পেয়েছেন?"

"না! তো, ওর তো আজ রাতে উচ্চাঙ্গ সংগীত শুনতে যাবার কথা।"

"ও ক্যাথ বলে আমার এক ক্লাসমেটের সাথে নাইট ক্লাব গিয়েছিলো, সঙ্গে মেয়েটির বাবাও ছিলেন, হঠাৎ মেয়েটি অসুস্থ হয়ে পরে, ক্যাথের বাবা ভদ্রলোকটিকে না খুঁজে পেয়ে, অর্ণব ওকে এস এস কে এম এ এডমিট করানোর জন্য কাকিমাকে অনেক বার ফোন করেছে, কিন্তু না পেয়ে আমাকে আপনাদের জানাতে বললো, "আপনি জানেন ডাক্তার কাকু, কাকিমাকে আর কোনো ভাবে কন্টাক্ট করা যাবে কিনা?"

"একটু দাঁড়াও তো মা, আমি তোমায় কল ব্যাক করছি, আমার মোবাইলে একটা থানা থেকে ফোন আসছে।" কট করে ফোনটা কেটে দিলো।

থমথমে নিশুত পাড়া। বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ডের উদ্দাম তান্ডব, মাথায় কিছুতেই আসছেনা পুলিশ কোত্থেকে এলো এর মধ্যে? অর্ণব কি ক্যাথের সাথে এমন কিছু করেছে যা সে সহ্য করতে না পেরে অজ্ঞান হয়ে পড়লো? নাকি সত্য ই কোনো গুরু বিপদের সংকেত এটা? সিঁদুরে মেঘ ঘনাচ্ছে গঙ্গার পুব আকাশে।কোত্থেকে একটা এলোমেলো বাদলা হাওয়া বইছে হুসহুস করে। খড়খড়িটা বন্ধ করে দিলো।
গঙ্গার ওপারের কান্নার করুন আওয়াজ এতটা মর্মস্পর্শী হয় সে আগে কোনো দিন উপলব্ধি করেনি। প্রিয়জনের শেষ চিহ্ন পৃথিবী থেকে চিরতরে মুছে ফেলার মুহূর্তটা ঠিক কতটা নিষ্ঠুর হয় তার পরিপূর্ণ তর্জমার অবকাশ সে পায়নি তার পনেরো বছরের ছোট্ট জীবনকালে, আজ সেই কান্নার গগনবিদারী চিৎকার, অর্ণবের দুশ্চিন্তা সব মিলিয়ে আজকের রাতটা বড়ো যন্ত্রণাদায়ক মনে হচ্ছিলো তার।
শব্দটা দূর করার আপ্রাণ চেষ্টায় সব জানালা দরজা গুলো পাগলের মতো বন্ধ করতে লাগলো অন্তরা। তাও সেটা আছে দেখে, দক্ষিণ পুবের জানালাটা হাট করে খুলে পুনর্বার বন্ধের প্রচেষ্টা করতে গিয়ে, চোখ আটকালো একটা অদ্ভুত জিনিসের ওপর ঠাকুমার ঘরের পেছনের চাতালে কোত্থেকে হঠাৎ সাদা একটা লক্ষী পেঁচা এসে বসলো। গা দিয়ে যেন জ্যোতি বেরোচ্ছে তার। এই পেঁচাটার অনেক গল্প শুনেছে ঠাকুমার কাছে। ঠিক

অঘ্রানের লক্ষী পূজোর আগে ওটা আসে। যে তার দর্শন পায় তার জীবনে সৌভাগ্য নেমে আসে।
এতো বিহ্বলতার মধ্যেও ঐ পেঁচার দর্শনে মনটায় শান্তি এলো। হাত জড়ো করে অর্ণবের দীর্ঘায়ু কামনা করলো পক্ষী ভগবতীর কাছে। কি গা ছম্ছমে বুদ-ভুতুম ডাক তার। রক্ত ঠান্ডা করে দেয় জেনো।
মোবাইলে পিং করে মেসেজ এলো।
"তুমি ঘুমিয়ে পরো মা, অর্ণবের গাড়ি একটা ছোট্ট একসিডেন্ট করেছিল, মাথায় অল্প চোট পেয়েছে,এখন ওর মা সব ব্যবস্থা করেছে, ক্যাথের বাবা ও আছেন। সব আন্ডার কন্ট্রোল, আমি কাল সকালে ফোন করবো ক্ষণ, ডিটেলে বলবো। তুমি যেতে চাইলে অন দা ওয়ে তোমায় তুলে নিয়ে যাবো, ঘুমিয়ে পরো, রাত দুপুর হোলো। গুডনাইট"

কাল শনিবার। অর্ণবের মায়ের দেয়া সেই দু হাজার টাকা রেশন করা আছে ওর কাছে। কথা ছিল গঙ্গায় নৌকো চড়বে দুজনে, আর ক্যাথের সাথে ঠিক কি কি হয়েছে তার গরমাগরম ঘটনাবলী,চটপটা ঘটি গরমের সাথে গেলা হবে। মানুষ ভাবে এক আর হয় আরেক। খুব কান্না পাচ্ছিলো। ছুট্টে গিয়ে অর্ণব কে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করছে। ওর মাথায় যেখানে লেগেছে সেখানে আলতো চুমু দিতে ইচ্ছে করছে। চুমু কপালে, চুমু ঠোঁটে, চুমু সারা গায়ে, এতো চুমু দেবে সে যে কোনো জেনেরিক পাইনকিলারের বাবাও তার মতো তাড়াতাড়ি ব্যাথা কমাতে পারবে না।
কেমন আছে ছেলেটা? কি করছে? কতো রক্ত বেরিয়েছে? অন্তরার ব্লাড গ্রুপ "ও নেগেটিভ", কাল গিয়ে রক্ত লাগলে সে দেবে, দুজনের রক্ত বিয়ের পর এমনিতেও মিশবে, তার আগেই অগ্রিম এই মেশানোর সুযোগ সে হাত ছাড়া করবে না কিছুতেই। এই সব ভাবতে ভাবতে চোখ বন্ধ হয়ে এলো অন্তরার।

পঞ্চম অধ্যায়

সোহম ফোনে ক্যাথের মা ক্যারি র সাথে কথা বলছে, ইভগেনিয়া ক্যাথের সব মেডিকেল রিপোর্ট নিয়ে সিটি স্ক্যান রুমের বাইরে অপেক্ষায়।
অর্ণবের মাথার ব্যান্ডেজ হয়ে গেছে, ওকে এক্স রে রুমে নিয়ে যাচ্ছে কলার বোন এ চিড় কতটা জোরালো হয়েছে তা দেখার জন্য। অর্ণবের মা ছেলেকে বকছে সিটবেল্ট না বাঁধার কারণে সঙ্গে নমুনা স্বরূপ জলজ্যান্ত উদাহরণ, "ড্রাইভারের কিচ্ছু হয়নি সিটবেল্ট পড়েছিল বলে"।
অর্ণব তাতে মুখ গুঁজে অপরাধীর মতো শুনছে। সোহম অর্ণবকে দেখে ফোন নামিয়ে, "থ্যাংক ইউ মাই সন" বলে কৃতজ্ঞতা জানালো।
অর্ণব তাতে লজ্জা পেয়ে মায়ের চোখের দিকে তাকিয়ে ভিজে বেড়ালের মতো তাকালো - মা কি বলে তার পূর্বাভাষ জরিপ করবে বলে।
মনে মনে বেশ বড়োসড়ো বকুনির জন্য প্রস্তুত ছিল সে, কিন্তু সবাই ওর সাথে বেশ সম্মানের সঙ্গে কথা বলছে দেখে, নিজেকে বেশ হিরো মনে হচ্ছিলো ওর।
অর্ণবের মা অনুপ্রিয়া পর্যন্ত ছেলের মাথায় আলতো করে হাত বুলিয়ে বললো, "আজ এই ঘটনাটা না হলে ক্যাথ এর এই ব্রেনের জটিল ব্যাধি ধরা পড়তো না।"

"কি হয়েছে ওর?"

"সারা ব্রেনের ওপর প্রায়ন নামক এক প্রোটিনের প্লাগ জমে গেছে,যেটা ম্যাড কাউ ডিসিস বানায় সেটা ওর সারা ব্রেন সেলে ব্যাঙের ছাতার মতো ছেয়ে আছে।"

"কি হবে ক্যাথের? ও কি মরে যাবে, মা?"

"ওর স্পাইন থেকে স্পেশাল নিডিল দিয়ে বোন মারো নিয়ে প্লেটিং করলে জানা যাবে ওর কোন স্টেজ? ওষুধ আছে, কিন্তু এখনো প্রায়ন নিয়ে রিসার্চ চলছে, এই প্রোটিন গুলো এসেছে গরু থেকে, ইউরোপে গরুর মাংস এর উদপাদন বেশি করার জন্য এক কালে ওদের ডায়েটে মরা গরু মিশিয়ে প্রোটিন এর পরিমান বাড়ানো হতো, এই ভাবেই ওই গরুর মাংস খেয়ে মানুষের শরীরে প্রায়ন প্রোটিন গুলো ঢোকে, আমরা এখনো অনেক অন্ধকারে, এরা খুব হাই টেম্পারেচার রেসিস্ট্যান্ট, খুব ডিফিকাল্ট এদের হ্যান্ডেল করা, চিকিৎসা ও খুব এক্সপেন্সিভ।"

"ক্যাথ নিজেকে হিন্দু ভাবে, বিফ খায়না। ওর বাবার অনেক পয়সা। আমেরিকায় নিয়ে গেলে ভালো হয়ে যেতে কি পারেনা? - বলোনা মা?"

"আমি যতটুকু জানি তোমায় বললাম, বাকিটা ভগবান যাকে যতদিনের জন্য পাঠিয়েছে, আমরা সব নিমিত্ত মাত্র, নাট্য মঞ্চের নীরব কুশীলব। হ্যাঁরে, তা তুই হঠাৎ অন্তরা ছেড়ে ক্যাথকে ধরলি যে বড়ো? অন্তরার সাথে তোমার ব্রোক আপ হোলো কবে?"

"সে সব অনেক কথা, বাড়ি গিয়ে হবে,আমার এক্সরে রিপোর্ট কি বলছে মা?"

"দাঁড়াও! অর্থোপেডিক্স এখুনি আসবেন। তুমি কিছু খাবে? খুব ভালো করাইশুটির প্যাটিস পাওয়া যায় ক্যান্টিনে, নিয়ে আসবো কিনা বলো? আমার টেবিলে একটা জিনজার বিয়ারও আছে, খাবে তুমি?"

"ড্রিংক খেতে পারি।আর বরফ ঠান্ডা জল?"

"একদম নয়, মাথায় স্টিচ পড়েছে, কলার বোন যদি ভেঙে থাকে, তালে আর দেখতে হচ্ছে না, আর এই হেমন্ত কালে ঠান্ডা জল একদম নয়, তুমি জিনজার বিয়ার পাবে, আমি ফোন করে আনাচ্ছি।"

অর্থপেডিক্স এসে হাসি মুখে বললেন, "তোমার হিরোর হাড্ডি তো বেশ ভালোই চোট খেয়েছে, একসপ্তা বেড রেস্ট, আর আমি প্লাস্টার করে দিচ্ছি, দু সপ্তা পর আরেকটা এক্স রে, অন টপ অফ ড্যাট্, নো মোর হিরোগিরি।"

অনুপ্রিয়া হেসে বললো, "পরের রবিবার ওর জন্মদিন আছে বলে দু মাস আগে থেকে বোলিং ক্লাব বুক করা, সব মাটি, এখন বাড়িতেই পার্টি হবে, অগত্যা।"

"তা এই বুড়ো ডাক্তারের কি নেমন্তন্ন হবে?"

"আরে সে আর কি এমন বড়ো ব্যাপার, চলে এস, এমনিতে তো হয় না, তা অর্ণব বাবুর বার্থডে উপলক্ষেই সই!"

"ঠিক আছে, দেখি গিন্নি কে বলে,তেনার কিটি পার্টি না থাকলে, পাক্কা আসছি,সাথে সিঙ্গেল মল্ট নিয়ে ঢুকবো, তা ডাক্তার কর্তার বারণ নেই তো হে সুরা পানে?"

"ফোন করে নিলেই হয়,আমি কেন ভায়া মিডিয়ার কাজ করি?"

"হা হা হা -----তা বেশ, তা বেশ...."

ফেরত যাবার পথে আবার সোহমের সাথে দেখা। ক্যাথের মা দেখার মতো সুন্দরী। ক্যাথের সৎ বাবা ভদ্রলোকটিও বেশ নম্র। খুব সম্ভবত পর্তুগিজ। চোখের মণিটা নীল।
অর্ণবকে দেখে ক্যাথের হাফ ব্রাদারও এগিয়ে এলো, ওর হাত ধরে ধন্যবাদ জানাতে । ক্যাথের ভাই কেনির সাথে অর্ণবের বাসকেট বল ক্লাবে আলাপ। ভালো খেলে কেনি। একটা ম্যাচে অর্ণবদের টিমকে হারিয়েছিল। চ্যাম্পিয়ান প্লেয়ার।
কলিডোরের ঘড়িতে রাত পৌনে তিন। ক্যারি খুব সাবলীলতার সাথে ইভগেনিয়ার সাথে কথা বলছে মেডিক্যাল রিপোর্ট গুলো নিয়ে। অর্ণবকে ওর মা ডিসচার্জ করে, সবাইকে বিদায় জানিয়ে বাড়ি চলে গেলো।
ক্যাথকে অনূর্ধ্ব আঠারোর কেবিনে ভর্তি করে নিলো। সারা মাথার চারধারে বড়ো বড়ো মেশিন আটকানো হোলো সেই রাতেই। নিউরো সার্জেন এর সাথে ওয়ার্ড ইনচার্জ, সাইকোলজির হেড সবাই কথা বলে মিটিং ডাকলেন পরের দিনের অবধারিত সময়ে। ক্যাথ ওদের কাছে এক বিরাট বড়ো রিসার্চ টপিক - এটা ক্যাথের পরিবারের বুঝতে বেশি সময় নিলো না।
ক্যাথের চোখ বন্ধ। হাতে স্যালাইন, মুখে অক্সিজেন। সোহমকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে।
ইভগেনিয়া সোহমকে বললো, "আই থিঙ্ক উই শুড গো হোম, নাথিং উই ক্যান ডু হিয়ার।"
কেনি বললো, "ইয়া, ডক টোল্ড আস টু মুভ অন।"
সবাই চাপা দুশ্চিন্তায় কপালে ভাঁজ ফেলে লিফটে উঠলো। ক্যারি ওর বর আর ছেলেকে পার্কিং থেকে গাড়ি নিয়ে আসতে বললো।
যাবার পথে ইভকে বিধ্বংস্ট্রিট আগে আর সোহমকে তার পর ড্রপ করে দিলো। সোহমের যে গাড়িটা ক্যাথ ব্যবহার করে ওটা সেই রাতেই ড্রাইভার নিয়ে গ্যারাজে দিয়ে ও বাসে ঘর ফেরত গেছে।
সোহম সেই রাতে না ঘুমিয়ে প্রায়ণের ওপর রিসার্চ করতে বসলো।নিউইয়র্কে ওর ডাক্তার বন্ধুকে ফোন করে জানলো, এখন কি কি করা উচিত।

তবে ডাক্তারদের একটাই বক্তব্য, এই রোগটা শুধু প্রায়ন নয় তার সাথে আরো কোনো হিডেন ক্যান্সার সেল এর কেমিস্ট্রি র জাদুকরী - যার জন্য অজ্ঞান হয়ে যাবার উপলক্ষ্য দেখা দিচ্ছে, এবং পড়াশুনো মনে রাখার ব্যাপারেও ক্যাথের কোনো অসুবিধে হয়নি এযাবৎ।
এতটা পথের ধকলে শরীর ক্লান্ত বলে সোহমের স্নায়ু কোষ কিছুক্ষন পর নিস্তেজ হয়ে সব চিন্তার ঊর্ধ্বে উঠে গেলো।

পর্ব ৮

প্রথম অধ্যায়

অন্তরা উঠে খবরের কাগজ হাতে ইজি চেয়ারে এসে বসেছে,ঠিক বড়ির চাদরের পাশে। হাতে ফোন। অধীর আগ্রহ কখন অর্ণবের বাবার ফোন আসে তার অপেক্ষা। কল্যাণী বললো,-
"দিদুভাই তুমি এখানে একটু বড়ি পাহারা দাও আমি নিচের কাজ সেরে একটা বই নিয়ে আসি, তুমি পড়েছো কিনা জানিনা, 'দ লাইট বিটুইন ওশান' না পড়লে পড়ো সময় পেলে, ভালো লাগবে।"
প্রপিতামহীর মুখ থেকে সম্পূর্ণ একটা এতো বড়ো বাক্য শুনে মনটা ভরে গেলো অন্তরার। একগাল্ হাসি দিয়ে সম্মতি জানিয়ে খবরের কাগজে চোখ বোলাতে লাগলো। ফোনটা ছাদের মেঝেতে বোঁ বোঁ আওয়াজ করতে করতে ঘুরতে লাগলো। চমকে উঠলো, সেকি অর্ণব ফোন করছে?
"কিরে? বাবা বললো তুই নাকি ফোনের অপেক্ষায় বসে?"

"বয়ে গেছে, তুই যার তার সাথে প্রেম করে সবাইকে টেনশন দিবি - আর আমি তোর জন্য পথ চেয়ে বসে থাকবো? মামদোবাজি পেয়েছিস ?"

"প্রিয়তমা তুমি রেগোনা, প্রিয়তমা তুমি রেগোনা।"

"ক্যাথের পাশের বেড পেলি না বলে, গোঁসা করে ঘরে পালিয়ে আসিসনি তো হাসপাতাল থেকে?"

"আমার বাবা তোর মার সাথে কথা বলেছে,তোকে ১০টা নাগাদ নিতে আসবে, ব্রেকফাস্ট সেরে নে, আর তোর ডান্স ক্লাস ডুব দে,আমার ভাঙ্গা কলার বোন নিয়ে আয় দুজনে বল ডান্স করব এখানে।"

"কদিন স্কুল কামাই হবে তোর ?"

"ওয়ান উইক ওনলি।"

"আরো বেশি হলে খুশি হতিস?"

"তুই পাশে থাকলে, হ্যাঁ।"

"প্রজেক্ট এর কাজে হেল্প চাই? আমি আইসোপ্রোপানল কে মোস্ট ক্রুয়েল ওয়েপেন ইন দা ওয়ার্ল্ড বলছি, একটা ডকুমেন্টারীও বানিয়েছি, কেমন করে মানুষকে গ্যাস চেম্বারের মধ্যে পুড়ে, দেহের সব জল টেনে বেরকরে,ব্লাডার ফেটে মানুষের নিষ্ঠুর মৃত্যু, ওটাই আমার টপিক।"

"টিচারদের মেল্ করা হয়ে গেছে, এই উইক অন লাইনে হয়ে যাবে সব। ঐ প্রজেক্ট এ আমি ভগবানের মার দুনিয়ার বার' এই নিষ্ঠুর বিধাতার লেখন এর ওপর আমার ডকুমেন্টারি করবো। ক্যাথ বোধয় আর বেশিদিন নেই রে এই পৃথিবীতে।"

"আর ইউ কিডিং মি?"

"ওর ব্রেনে এই ছোট্টো বয়েসে এমন কিছু হয়েছে,যা নিয়ে ডাক্তাররা আজ কনফারেন্স টেবিল বসিয়েছে।"

"আচ্ছা, আমি গিয়ে শুনছি - রেডি হতে হবে, সাড়ে আটটা বাজে প্রায়। ছাড়ছি। "

গোপালের মা, কড়াই শুঁটির কচুরি আর আলুরদম বানিয়ে গরম গরম ওপরে দিয়ে গেলো। সেই দাঁড়কাকটা এখনো বড়ি ঠুকরানোর আশায় বসে কর্কশ কা'কা' ছেড়ে, সুরেলা গলায় কু'কু' ডাকে অন্তরাকে ভোলাচ্ছে, অন্তরা কচুরির প্লেট হাতে, হুশ হুশ করতে উড়ে ওটা পাশের বাড়ির ডিস্ক এন্টেনায় বসলো।

অন্তরা ওর ইজেলটা এনে,বড়ির ওপর দাঁড় করিয়ে, তার ওপর মশারি টাঙ্গিয়ে, ইজেলের মাথায় একটা রাক্ষসের মুখোশ আটকিয়ে দিতে কাকটা ভয়ে সেখান থেকেও পালালো দূরের বট গাছের মাথায়।

চিলেকোঠার ঘরে গিয়ে,ওর ক্লাস নাইনের গ্রুপ ফটোতে ক্যাথকে দেখলো, 'সত্যিই কি সুন্দরী সে'। ভগবান যেন অনেকটা সময় নিয়ে নিপুন হাতে বানিয়েছে ওকে - হঠাৎ যেন মনে হলো গলা থেকে কাঁটা নামলো, কিন্তু তার পরেই চোখ দিয়ে নিজের অজান্তেই একফোঁটা জল বেরিয়ে এলো, ক্যাথের এই স্বল্পায়ুর কথা ভেবে। এটাই হিউম্যান সাইকোলজি, যাকে সে মনে প্রাণে চাইছিলো সরাতে, সেও যখন শেষ বিদায়ের খবর দেয় তখন মন ভিজে যায় অতি বড়ো শত্রুরও।

প্লেট পরিষ্কার করে খেয়ে টিসুতে হাত মুছে, চটপট ক্যাথকে একটা 'গেট ওয়েল সুন' কার্ড পাঠিয়ে দিলো।

কল্যাণী বইটা দেখাতে দরজার কাছে এলো, অন্তরার মাথায় হাত বুলিয়ে বললো, "বেঁচে থাকো গোপাল আমার- কি সুন্দর কাকতাড়ুয়া বানিয়েছে, আমার দিদুভাই দেখছি বাপের মতো সায়েন্টিস্ট হবে, আমার বড়ি এখন আর নজরদারির দরকার নেই।"

আজ ঠাকুমা তার এতো কথা বলছে দেখে,জড়িয়ে ধরলো কল্যাণীর নরম শরীরটাকে, তার পর ঠাকমাকে টুক করে প্রণাম করে, এঁটো প্লেট হাতে ঝড়ের মতো নিচে নামতে নামতে চেঁচিয়ে বললো, বইটা লাইব্রেরির হলে, ফেরত দিয়োনা, আমি পড়বো ওটা।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ক্যাথের ব্যাপারে সব ডাক্তারদের অন্তিম অভিমত তার আয়ু আর মেরেকেটে ছয় মাস।

মৃত্যু খুব করুণ ভাবে আসতে পারে, যেমন কথা বন্ধ হয়ে যাওয়া, দৃষ্টিহীনতা, হাত পা নাড়াতে না পারা ইত্যাদি, কিংবা হঠাৎ করে রানীর মতো পট করে আকস্মিক মৃত্যুও হতে পারে।

তার বাবাকে ডেকে ধীরে সুস্থে সব ব্যাপারটা ঠান্ডা মাথায় বুঝিয়ে দিলেন নিউরোর হেড। সোহম বাড়ি ফিরেই মেয়ের ও তার টিকেট বুক করে ফেললো সুদূর আমেরিকার।

ফোন করে ইউ সি এস এফ মেডিকেল সেন্টার, সানফ্রান্সিসকো র সবচেয়ে বড়ো নিউরো সায়েন্টিস্ট এর সাথে অপোইনমেন্ট করে অর্ণবকে কে টেক্সট করলো - "আর দু সপ্তাহের মধ্যে আমি ক্যাথকে নিয়ে চলে যাচ্ছি সানফ্রান্সিসকো। ক্যাথ ভালো আছে, কথা বলেছে সকালে। ওরা পরের শুক্রবার রিলিস করবে বলেছে, এখন কিছু স্পেসিমেন ভেলোরে পাঠাবে, আর বেশ কিছু জটিল পরীক্ষা নিরীক্ষণের জন্য আরো পাঁচ দিন ভর্তি রাখবে ওকে। তোমার মায়ের সাথে কথা হয়েছে। তুমি ভালো থেকো - নিজের খেয়াল নিও।"

অন্তরা ঠিক সেই সময়ই ঘরে ঢুকলো। উৎকণ্ঠা নিয়ে ঘরে ঢুকে, পাশের চেয়ারে বসে প্রথম কথা, "ভাঙা হাড়ে সাঁতার কাটবি কি করে?"

"ডাক্তারের মতে ছ মাস এমনিতেই বন্ধ থাকবে সাঁতার। ওটা আস্তে আস্তে ফিজিও করে আগের জায়গায় আসতে পারে। আমার কথা ছাড়, দেখ ক্যাথের বাবা এখুনি কি লিখেছে।"

অন্তরা পরে কিছুক্ষন চুপ করে মাথা নিচু করে অনেক কিছু ভাবলো,তার পর অর্ণবের দিকে তাকিয়ে বললো - "আমি এই পাঁচ দিন স্কুল থেকে রামুদাকে নিয়ে রোজ ভিসিটিং আওয়ার্স এ ওকে দেখে এসে তোকে বলবো, ও কেমন আছে।"

"তোর ক্যাথ এর প্রতি আর রাগ নেই?"

"ভগবানের যে এতো প্রিয় তার প্রতি রাগ করে কি লাভ, বল ?"

"আয় আমার পাশে এসে বোস।"

অন্তরা অর্ণবের পাশে এসে ব্যান্ডেজ বাঁধা বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে আলতো করে জড়িয়ে ধরলো। অর্ণব ওর কপালে নরম করে চুমু খেলো।

"আজ আমাদের গঙ্গায় নৌকো চড়ার কথা ছিল।"

"এই তো চোখ বন্ধ করে ভাব নৌকা চড়ছিস।"

"তোকে আমি খুব ভালোবাসি রে অন্তরা, ক্যাথের মতো তুই আমায় ছেড়ে কোনো দিন চলে যাবি নাতো?"

"চেষ্টা করবো রে, যদি বেঁচে থাকি আমায় কেউ আলাদা করতে পারবে না।"

এমন সময় অর্ণবের বাবা বাইরের দরজায় টোকা দিলো। অর্ণব গলা খাঁকড়িয়ে বললো - "প্লিজ কাম ইন "। অন্তরা উঠে চেয়ারে গিয়ে বসলো।
"চলো মা, তোমায় নাচের স্কুল দিয়ে আসি, সাড়ে ১১টায় পৌঁছে যাবে আশাকরি। শনিবার ট্রাফিক কম থাকে।"

"আমি তো বাড়িতে বললাম আমি যাবো না।"

"না না, সে ভালো নয়, বন্ধুর সাথে দেখা তো হোলো, আবার দেখার ইচ্ছে হলে ফোন কোরো আমায়, আমি নিয়ে আসবো। রামু এসে তোমায় নাচের স্কুল থেকে বাড়ি নিয়ে যাবে। এই নাও তোমার নাচের ব্যাগ, তোমার মা দিয়ে দিয়েছিলেন গাড়িতে।"

অন্তরা চলে গেলে, সারা ঘরে এক শূন্যতা গিলে খাচ্ছে যেন অর্ণবকে। ক্যাথের ব্যাপারটা মন থেকে কিছুতেই মোছা যাচ্ছেনা। ক্যাথ এই কদিনের মধ্যে অনেকটা দখল করে ফেলেছে ওকে। ক্যাথের আর বাঙালি উত্তরসুরীর জন্ম দেয়া হলোনা। বাংলা বলে চমকে দেয়াও হলোনা ওর খুড়তুতে দাদা, দিদিদের। সব সাধ অপূর্ণ থেকে গেলো ক্যাথের। শেষ ইচ্ছেটুকুও পূরণের মতো সময় দিলোনা ওপর ওলা।
বালিশ চোখের ওপর চাপিয়ে, অলসভাবে শুয়ে আকাশ কুসুম ভাবতে ভাবতে দুর্বল শরীর আর জেগে থাকতে না পেরে দুচোখ এমনিতেই বুজে এলো অর্ণবের।

তৃতীয় অধ্যায়

বালিগঞ্জ ফাঁড়ির ব্রিজ এর ওঠার মুখেই পরে প্যান্টালুনস। অপর্ণা হোয়াটস আপ এ কয়েকটা বাক্য উড়িয়ে দিলো আদিত্যর জন্য - "খুব ভালো একটা সাদা টি শার্ট পেয়েছি, একটা প্রশ্ন - ইস হোয়াইট ইওর ফেভারিট কালার? ওর ইউ ওয়ান্ট টু লুক ম্যাচিওর্ড? আই রেকন ব্ল্যাক উইল সুটস মোর অন ইউ। সো টু টি শার্টস দেন। প্লিজ লেট্ মি নো এনিথিং এলস ইউ নিড টু গেট ফ্রম হিয়ার, রাইট নাউ আই এম ইন প্যান্টালুনস?"

ওদিক থেকে বার্তা এলো, "তুমি - শুধু তুমি, চাই পেতে তোমার পুরোটা - প্লিজ"।

হঠাৎ কান দুটো লাল হয়ে গেলো লজ্জায়। আদিত্য কি সত্যিই ওর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করবে? কাঁচের জানালার ওপাশ থেকে টানাপোড়েনে থতোমতো খেয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থমকে থাকা গাড়ি গুলোকে দেখছিলো সে। তার জীবনও ঠিক এই রকমই থমকে গেছিলো, শারীরিক চাহিদার শূন্য কলসিতে কৌশিকের অনেক নাড়া খেয়েও ফোঁপরা আওয়াজ ছাড়া কিছুই শোনেনি তার কান এতো দিনের সুখী দাম্পত্য জীবনে।
এই প্রথম যমুনার জলে পূর্ণ কলসের চটক দাড়ি দাদরা তাল সে শুনেছে তার সারা অঙ্গ থেকে, নিজের দেহের প্রতিটি কোষ এই অমৃত ধারায় ভিজে জানাচ্ছে তাদের সম্পৃক্ততার স্বাদ কিছুটা হলেও দিতে চায় সে আদিত্যকে। আদিত্যর দেয়া সুধায় যদি বিষ থাকে তাহলে তাও সে পান করতে চায় কণ্ঠ ভরে। আদিত্যর হেমলক এর সম্পুর্ন্য শিশি না শেষ করলেও সিকি ভাগ সে গ্রহণ করতে পিছুপা হবে না কোনো মতেই।

চোখ গেলো "উনিশ কুড়ি" শেলফ গুলোর দিকে, অন্তরার জন্য খুব সুন্দর একটা সরষে রঙের কার্ডিগান নিলো, আর অর্ণবের জন্মদিনের উপহার স্বরূপ ওরই সাথে মিলিয়ে একই রঙের ছেলেদের আদলটা ।
মনে মনে কল্পনা করলো পাশাপাশি হাঁটলে ভারী সুন্দর মানাবে ওদের, সঙ্গে হেঁটে যাওয়া পথচারীরা তাকিয়ে একবার হলেও, দেখবে ওদের দুজনকে।
হাত চুলকাচ্ছিল জন্মদিনের কার্ড কিনবার জন্য, কিন্তু পাছে মেয়ে ভাবে ওদের সম্পর্কের মধ্যে বড্ড বেশি নাক গলাচ্ছে তাই ভয়ে ওদিকে হাত বাড়ালো না।
অপর্ণা ওর পুরোনো এসিস্টেন্টটাকে ওর জুনিয়ার ক্যামেরাম্যান সায়ককে দিয়েছে, বড্ড গেঁয়ো ছিলো, বড়ো কোনো জায়গায় ওকে নিয়ে গেলে বড্ড বেচাল করতো, আর দুদিন অন্তর বার্তা পাঠাবে, আজ পেটখারাপ, কাল মাথা খারাপ, এরম লোক নিয়ে চলে নাকি?
সম্প্রতি একটা নতুন মেয়েকে ওর সাগরেদ বহাল করেছে, নাম পাওলি। যেমন রুচি সম্মত কথা বলে, তেমন জহুরির নজর। কোন কোনে কোথায় আলোর খেলায় কেমন সাড়া পাবে সব আগে থেকে কম্পিউটার এর মাধ্যমে ছকে দিতে জানে। যে কদিন কানসাস যাবে ও, পাওলি দারুন সামলাবে এদিকটা, তাতে সন্দেহ নেই।

পাওলি ওপরের ফুট কোর্টে বসে টেক্সট দিলো, "হলে ওপরে এসো দিদি, ক্লায়েন্ট এসে গেছে"।
আজ ওরা নলবন এ একটা বড়ো কর্পোরেট পার্টির শাখা প্রশাখার লতানো পাতানো আরো কিছু কনসালটেন্ট কোম্পানির গেট টুগেদার লাঞ্চ কভার করবে।আজ আনন্দবাজারের এক নাম করা সাংবাদিকও আসবে।
অপর্ণা, ব্যাস্ততার সাথে তাড়াতাড়ি সব হিসাব নিকাশ চুকিয়ে, প্যাকেট গুলো হাতে নিয়ে নিচে গাড়িতে চলে এলো। পাওলিকে ফোনে পাল্টা বার্তা দিলো নিচে চলে আসার জন্য।
রিং রিং - "হ্যা বল ?"
"তোমার জন্য বার্গার আর কোল্ড্রিংকস নিলাম, তার কি হবে?"

"গাড়িতে বসে খাবো, চলে আয়, ক্লায়েন্টকে নিয়ে।"

"হাই আমি সুদীপ্ত বসাক।"

"নাইস টু মিট ইউ, মিস্টার বসাক - আপনি যে তথ্য গুলো ইমেলে পাঠাতে সংকোচ করছিলেন, আসুন সেগুলো একবার দেখে নেই।"

তিনজন কেজো গল্প করতে করতে নলবনের দিকে গাড়ি ছোটালো। অপর্ণা সবে কথা শেষ করে বার্গারের প্যাকেটটা খুলেছে, কামড় বসবে এমন সময় কৌশিকের ফোন এলো - "অন্তরাকে রামু নিয়ে এসেছে নাচের ক্লাস থেকে, ও খাচ্ছে, আমি কি অপেক্ষা করবো? তোমার ফিরতে ক'টা হবে কিছু বলে গেলেনা আমায়?"

"আমার সন্ধ্যে হবে,তোমরা সবাই খেয়ে নাও।"

"অন্তু কথা বলতে চায়, ধরো।"

"মা ! ট্যাংরা মাছের বড়ি দিয়ে ঝোলটা দারুন হয়েছে - তুমি এই অসময়ে কাঁচা আমের চাটনি কি করে করলে?"

"এখন গাড়িয়াহাটে সব সময় সব কিছু পাওয়া যায় - তুমি খাও, খেয়ে একটু পড়া এগিয়ে রেখো, দারুন ভালো মুভির সিডি কিনেছি, রাতে বসে দেখবো, কেমন ?"

"কি মুভি-পেংগুইন অফ মাদাগাস্কার ?"

"সারপ্রাইস! -তুমি সন্ধ্যেটা ফ্রি রাখো, আমি আসছি - পৌনে আটটার মধ্যে ঢুকে যাবো পজিটিভলি, বাই সোনা।"

"বাই।"

চতুর্থ অধ্যায়

সোমবারের প্রত্যুষক্ষণ। তখনও সকালের আলো ফোটেনি। এই সময়টা অন্তরার খুব প্রিয়। সকালে যখন কেউ ওঠেনা তখন টুপটুপ্ করে হিম পড়ার শব্দ শোনে কানে। একটু একটু করে কালো আকাশ ফর্সা হয়, নতুন দিন, নতুন জীবন।

ঠাকুমা বলেছেন এই সময় দেবদূতেরা এসে ভাগ্য লেখন করে যায়। যে প্রত্যুষক্ষণে উন্মুক্ত প্রকৃতির সাথে কথা বলে তার কপালে সৌভাগ্য নেমে আসে। মনে মনে ভাবলো, আজ ছুটির পরে ক্যাথকে হাসপাতালে দেখতে গিয়ে এই গোপন কথাটা ওকে বলবে। এই শনি-রবি ঝড়ের মতো কেটে গেছে। রোববার জল দিতেও ভুলে গেছে গাছ গুলোয়। তেমন রোদ ছিল না বলে কল্যাণীর নজরে পড়েনি, পড়লেই মাইনের থেকে ১০ টাকা কাটা পড়বে তার।

অন্তরার ঠাকুমার বাগানের মালি সে, ঠাকুমার গাছের গোড়ার মাটি খুসে দেয়া,গাছের মাথার ওপর ছিটিয়ে বৃষ্টির ধারার মতো জল দেয়া, গোবর সারের বস্তা থেকে মাপমতো প্রতি রবিবার সার দেয়া এইসব কাজ বাবদ কল্যাণী মাস গেলে ওকে হাতে ৩০০ টাকা দেয়। এ ছাড়া বেস্পতিবারের লক্ষী পাঁচালি আর শনি বারের সন্ধ্যা পাঁচালি পড়া বাবদ আরো ১০০টাকা আসে কল্যাণীর পেনসনের টাকা পাওয়া মাত্রই অন্তরার বরাদ্দ ৪০০ টাকা হাতে তুলে দেয়।

কোনো সপ্তাহে নাতনি ফাঁকি দিলে মাইনে কাটা যায়। হিসেবের ডায়েরিতে সব লেখা থাকে।যেমন গেলো মাসের কোনো এক শনিবার, বাবা - মায়ের সাথে মেট্রো তে মুভি নাইট হওয়াতে বারের পাঁচালি পড়া হয়নি, হিসেবের খাতায় সাড়ে বারো টাকা কাটা পড়েছিল। কল্যাণী খুব কড়া তালুকদারের মতো অন্তরার পারিশ্রমিক নিয়ন্ত্রণ করে। অন্তরার এই শক্ত শাসন ভালোই লাগে।

তার মাসোয়ারা থেকে জি সি লাহায় গিয়ে অর্ণবের সামনে বুক ফুলিয়ে রঙের তুলি, ক্যানভাস ইত্যাদি কেনে, শুধু তাই নয়, ন মাসে ছ মাসে রোজগেরে প্রেমিকার মতো অর্ণবকে ভালো রেস্টুরেন্টে নিয়ে গিয়ে খাইয়েও আসে, আবার প্রতি বছর বই মেলায় গিয়ে উল্টো পাল্টা গেজুরে ভূতের গল্পের বইও কেনে। অর্ণব সব ব্যাপারে ওর মায়ের কাছে হাত পাতে, এতে অন্তরা মাঝে সাঝে খোঁটাও দেয়।

আজ স্কুল যাবার তাড়ায় তাড়াতাড়ি সারের বস্তা থেকে একবাটি সার নিয়ে গাছেদের গোড়ায় দিয়ে সব্বাইকে চেঁচিয়ে বললো, "হ্যাভ ফান গাইস" পেছনে ফিরতেই দেখলো কৌশিক মাদুর পেতে চিলেকোঠার ঘরে ঢুকে প্রাণায়াম করছে।

"বাবা, তুমি কতক্ষন এসছো?"

"বেশিক্ষন নয়, রক্তের রিপোর্টে সব বেড়ে গেছে, আর ফাঁকি দিলে ওপরের টিকিট কাটতে হবে, তাই যে কদিন আছি, সুস্থ হয়ে থাকি।"

"এতো খুব ভালো, আমি আমার জিনিসগুলো ওপাশটায় সরিয়ে দেব, এইপাশটায় অর্ণবের মতো একটা ওয়াকার কিনে ঢুকিয়ে দাও - জিম এর ভালো ভালো এনার্জেটিক গান কানে গুঁজে ছুটলেই সব ব্যাক টু নরমাল হয়ে যাবে।"

"বলছিস?"

"একদম।"

"আচ্ছা বল দেখি –

কি সুখের শনি বার

মধু ভরা রোববার

মুখ পোড়া সোমবার

কেনো আসিস বার বার?"

"কেননা ওই মুখপোড়ার জন্যই সপ্তাহটা যে শুরু হয় - সেটা ভুললে কি চলবে, বাবা? তুমি আর গল্প কোরো না, মন দিয়ে ফোঁস ফোঁস করো, আমি নিচে যাই, চাবিটা তলায় গুঁজে গেলাম, ওটা গোপালের মার হাতে দিয়ো নইলে ওই নতুন মেয়েটা আমার এই ঘরটা মুছবে না।"

এক নিঃশ্বাসে বাবাকে এত্তগুলো কথা বলে, ইজেলের সেই নটরাজের ছবিটাকে বিছানার ধারে কাত করে নামিয়ে রেখে, কাপড় ঢেকে নিচে নেমে গেলো।

গোপালের মা বাসনের শব্দ করছে রান্না ঘরে। কল্যাণীর ধুনো দিয়ে পুজো সেরে চা খাচ্ছে পুবের জানালায় বসে। টিয়া পাখিটা উচ্চ স্বরে চেঁচিয়ে বলছে, "কিরে চা খাবি? মিঠু খাবে -মিঠু খাবে।"

কিছুদিন বাবদ জানালায় একটা খটাশ রঙা মেনির উৎপাত হয়েছে। অন্তরা ওকে সকালে একটা বিস্কুট দেয়। লেজ তুলে মিষ্টি সুরে "মিঁয়াও" বলে ধন্যবাদও জানায়। ওকে দেখলেই গোপালের মা বলবে, "আজ বিশকুট টি দাও, কাল গেঁড়ে বসে তোমার বিছানায় উঠে বাচ্চা পেরে যাবে, তখন বুঝো ক্ষণে।"

এই ছোট্ট শিশুর মতো মেনিটা ওর কোন পাকা ধানে মই দিয়েছে কে জানে এতোটাই চক্ষুশূল যে দেখলেই গায়ে জল ঢালবে। অন্তরার খুব রাগ হয়, এই রকম দূর-ছাড়-বালাই ব্যবহার।

গেটের সামনে আরেক পুষ্যি লেজ নাড়ছে, ওর নাম "ভক্ত রাম", বেশি কিছু চায় না, সে সকালে একটা বাসি রুটি আর বিকেলে চারটে বিস্কুট পেলেই খুশি হয়ে হাত উপরে করে দাঁড়িয়ে অন্তরাকে সেলুট জানায়।

তাড়াতাড়ি খবরের কাগজে চোখ বুলোতে না পারলেই ওটা কৌশিকের দখলে চলে যায়। বেশ ভালো, আজ একটু আরাম করে কলকাতার খবর দেখতে পেয়ে মনটা বেশ শরিক হয়ে গেলো অন্তরার।

অপর্ণা এসে সবার লাঞ্চ বক্স যার যার ব্যাগে পুড়তে লাগলো। নাক উঁচু করে গন্ধ নিয়ে মনে মনে অন্তরা ভাবলো, "আজ পরোটা আর ঢ্যাঁড়স ভাজা মনে হচ্ছে।"

ওপরে গিয়ে স্কুলের ব্যাগ গুছিয়ে স্নানে ঢোকার আগে চটপট অর্ণবকে বার্তা পাঠালো, স্কুল সেরে ওই পথে সায়েন্স কোচিং আছে, ৬টায় ওখান থেকে বেরিয়ে ক্যাথকে দেখতে যাবো। ভিসিটিং আওয়ার্সটা কনফার্ম কর।"

পাল্টা জবাব, "মা থাকবে চিন্তা নেই, ঢোকার আগে মাকে কল করিস, ফিরে এসে রিপোর্ট দিস্।"

"কি নিয়ে যাবো বলতো? রজনীগন্ধা না গোলাপ?"

"ওর খুব ইচ্ছে মেয়েরা খোঁপায় যেমন জুঁই এর মালা বাঁধে তেমন বাঁধবে, পারলে একটা লাল টিপের পাতাও নিস্, আমায় ছবি পাঠাস। সাথে তোরও, দুজনকে একসাথে দেখতে কেমন লাগে, দেখবো?"

"তোর কি দুজনের সাথেই এক খাটে ফুল শয্যার সখ ছিল?"

"কি জানি? তবে সেটা যখন হবে না তখন আর আগেকার দিনের রাজার মতো মহা রানীর সাথে পাটরানী রাখার ইচ্ছেটা এখানেই কবর দিলাম।"

"বেঁচে গেলাম, নইলে সতীনের সাথে ঘর করতে আমি পারতাম না।"

"আর পারতে হবে না, তুই সারা জীবন শুধু আমার সাথে থাক, শুধু ম্যাচের মাঝ পথে রেড কার্ড খাস না, জীবনের খেলাটা একটু নিয়ম মেনে খেল।"

"তুই ও খেল, আর যেরকম নিয়মে চলতে বলেছে চল, তোর এই শনিবার রাতের জন্মদিনে কে কে আসছে লিখে জানাস, আমার আর সময় নেই গল্পের - সাড়ে সাতটা বাজে, এখুনি ভাত বেড়ে ডাকবে মা, বাই -রে, প্লিজ টেক কেয়ার অফ ইওর সেলফ।"

ক্লাসের দিদিমনিরা সবাই ক্যাথের ব্যাপারে অন্তরাকে জিজ্ঞেস করছিলো। নিজের অজান্তেই ঠিক কখন অন্তরা ক্যাথের সবচেয়ে কাছের বন্ধু হয়ে উঠেছে সে নিজেও জানেনা।

প্রথম পিরিয়ড থেকে একটার পর একটা আসাইনমেন্ট চলছে। টিফিন বেলার ঘন্টা পড়তেই অর্ণবের অনেক গুলো চিঠির উত্তর দিতে আরো সময় গেলো দশ মিনিট।

কোনো মতে নাকে মুখে গুঁজে অডিটোরিয়াম এর দিকে ছুটলো। বাস্কেট বল ম্যাচ আছে সেকশন বি' এর সাথে এ' র।

পৃথা ওদের শত্রুপক্ষের সব চেয়ে বড়ো পান্ডা। ওদের দিকের তুরুপের তাস সোহিনী। কোনো মতে বলটা তৈরী করে ওর হাতে দিতে পারলেই কেল্লা ফতে। আপ্রাণ চেষ্টা চলছে কমসে কম একবার সোহিনীকে তৈরী বল ধরানোর। বি সেকশনের মেয়েগুলো প্রত্যেকটা জল হস্তীনি - কি খেয়ে যে এতো চেহারার চটক? এক ধাক্কায় নস্যাদ করছে অন্তরার আপ্রাণ প্রচেষ্টা। ক্যাথকে খুব মনে করছে ওদের টিম। ক্যাথ এতক্ষনে এখানে থাকলে ওদের নাকে ঝামা ঘষে কমসে কম ৩বার জাল কাটিয়ে বার করতো বলটাকে।

কেউই কিছু করতে পারলোনা। কোচের মুখে গভীর হতাশার ছাপ। নিজের লকার থেকে হাত তোয়ালে বের করে গায়ের ঘাম মুছলো। পৃথা ইচ্ছে করে অন্তরার হাতে নখ দিয়ে আছড়ে দিয়েছে, জায়গাটায় আর্নিকার এন্টিসেপ্টিক ক্রিম দিয়ে,ব্যাণ্ডেড এর জন্য হাতড়াচ্ছিলো ব্যাগ, এমন সময় -

"কি রে ক'টা খেলি? আর কটা খাওয়ালি?"

"অর্ণব! আই এম নট ইন গুড মুড - এখুনি হিস্ট্রি এক্সাম আছে।"

"আকবর এলে আমাকে মনে করিস, ভালো নম্বর পাবি।"

"এক গাঁট্টা - ফাজলামো কম কর, আমি নার্সিং হোম থেকে কল করবো, ততক্ষন ঘুমো তুই।"

ফোন ব্যাগে পুরে, ক্লাস রুমের দিকে এগিয়ে গেলো, সোহিনীর সাথে। অন্য সময় ও অনেক কথা বলে, এখন মাথা নিচু করে শুধু বললো, "ক্যাথ পাশে থাকলে কলা দেখতাম ওদের"।

ছুটির ঘন্টা পড়তেই রামুদার গাড়িতে বসে বললো - "একটু জুঁই এর মালা কিনবো, তার পর সোজা Nightangle, আমাকে ড্রপ করে তুমি বাবাকে তুলতে সায়েন্স কলেজ চলে যেও, অর্ণবের মা আমায় ড্রপ করবে বলেছে।"

ক্যাথের কেবিন খুঁজতে অসুবিধে তেমন হলোনা। পাশের কেবিনে একটা মেয়ে মারা গেছে। ওদের বাড়ির লোক খুব কাঁদছে। রোগ, রুগী, ডাক্তারদের জীবনটা ভারী অদ্ভুত, অন্তরার একদম ইচ্ছে নয় ডাক্তারি পড়ার কিন্তু বাবার ইচ্ছে। দেখা যাক কি হয় ভবিষ্যতে?

নার্স এসে আসতে করে অন্তরাকে নির্দিষ্ট কেবিনটা দেখিয়ে দিয়ে গেলো। ক্যাথের জানালা দিয়ে খুব সুন্দর দেখা যায় চলন্ত মহানগরীর ছবি। ক্যাথ ঘুমোচ্ছে। অন্তরা পাশের টেবিলে মালার প্যাকেট রেখে চেয়ার টানতেই ক্যাথ চোখ খুললো।

"আজ বাস্কেট বলে আমরা হেরে গেছি"?

"তোকে কে বললো? অর্ণব?" মনে মনে বললো, "ভবন নাপিত গিরি না করলেই হচ্ছিলো না?"

"হাউ আর ইউ?"

"আমার তো কিছু হয়নি, অসুস্থ তো তুই ,আজ তুই থাকলে ওদের দেখিয়ে দিতাম, তোকে খুব মিস করছিলো সবাই।"

"আই এম মিসিং ডেম ঠু" বলেই চোখ দিয়ে জল বেরোলো দু ফোঁটা।

"ছাড় ! দেখ তোর জন্য কি এনেছি, তোর মাথায় পরিয়ে ফটো তুলতে হুকুম হয়েছে ওনার, ভিসিটিং আওয়ারে এখুনি কাকু এসে পড়বেন, তুই একটু মাথায় লাগা, আমি ফটো তুলি।

"দে হ্যাভ চপড মাই হেয়ার,"

"হোয়াট?"

অন্তরার বুকে কান্নায় ভেঙে পড়লো ক্যাথ। দরজায় নক করে নার্স এসে বলে গেলো, "মোর ভিসিটর্স।" অন্তরার বাবা, মা আর ওর সৎ ভাই কেনি এসেছে। অন্তরাকে দেখে সবাই অভিভূত। প্রশংসা করলো বিস্তর, এমন বন্ধু পেয়েছে বলে।

ক্যাথ খুব দুঃখী বলে, ফুলের মালা গুলোয় জল ছিটিয়ে পাশের টেবিলের নুড়িপাথরে ভরা একটা থালায় রেখে ঘরের এক কোনে দাঁড়িয়ে ওদের পারিবারিক আলোচনায় অংশীদার হলো সে।

কথায় কথায় জানতে পারলো এই রবিবার সব টেস্টের রেজাল্ট পেয়ে ছেড়ে দেবে ওকে। তিরিশে নভেম্বর শুক্রবার বিদেশ পাড়ি দেবে ক্যাথ। মোটমাট দু সপ্তাহ পর হয়তো বা ক্যাথকে আর সারাজীবনের মতো দেখতে পাবে না কোনোদিন।

সাক্ষাতের নির্ধারিত সময়ক্ষণের অন্তিম লগ্নে এক পরিচালিকা এসে বিদেশী চালে বলে গেলো, "এবার আসতে আজ্ঞা হউক।"

ক্যাথের পরিবার চলে গেলে, অন্তরা বসে রইলো-অর্ণবের মায়ের জন্য। ক্যাথ খুব ধীরে ধীরে বললো, "প্লিজ - মালাটা পরিয়ে দাও, আমার ছবি ওকে পাঠিয়ে দাও।"

"তুই পড়বি?"

অন্তরা খুব উচ্ছসিত হয়ে ওর ছোটো চুলগুলো জড়ো করে, মালাটার জল ঝেড়ে শুকিয়ে মাথার একপাশে ক্লিপ দিয়ে সযত্নে লাগিয়ে দিলো। কপালে একটা লাল টিপ্ ও পরিয়ে দিলো ,অর্ণবের কথা মতো। ছবিতে শুধুই ক্যাথের মুখ তুললো, মন থেকে ওর জন্য একটা জমি ছাড়ার প্রবৃত্তি আসছিলো। অর্ণবকে এই কদিনের জন্য ভাগাভাগি না করে পুরোটাই সমর্পনের মতো শক্ত একটা জমি তৈরী হলো হৃদিকন্দরে।

পঞ্চম অধ্যায়

কানসাসে যাবার সব গোছানগাছান শেষ করে, ঘড়িতে দেখলো রাত পৌনে বারো ।পরের শনিবার সকালের ফ্লাইট, কাল বিকেল বিকেল বাড়ি ফিরতে বলেছে কল্যাণী। বাড়িতে লক্ষী পুজো আছে। ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে পুজোর ফর্দটায় একবার চোখ বুলিয়ে নিলো। কাল সকালে এই সব বাজার সেরে রামুদার গাড়ির ডিকিতে তুলে অফিস যাবে সে। রামুদাকে সকালে মনে করে ডিকিতে গঙ্গার জল ছিটোতে বলতে হবে। কাল সারাদিন নির্জলা উপবাসী রইবে সে, নইলে কুলোলক্ষীর কৃপা পাবে না তার পরিবার। নিচে নেমে রান্নাঘরের ভাঁড়ার থেকে ভালো একটা রেড ওয়াইনের বোতল থেকে বের করলো, শাশুড়ির অমত ছিল বলে বসার ঘরে সেলার বানানোর পরিকল্পনাটা নিছক কল্পনাতেই রয়ে গেলো।
শেল্ফ থেকে ভালো একটা ভুট্টার ব্রাজিলিয়ান লাল লঙ্কার চিপস এর প্যাকেট বের করে পা টিপে টিপে ওপরে উঠছে এমন সময়, কৌশিক বিছানা থেকে উঁকি দিয়ে বললো, "আমি আসতে পারি?"

"মোস্ট ওয়েল কাম - কিন্তু আমার হাতে একটাই ওয়াইন গ্লাস।"

"নেভার মাইন্ড, আমি আমার টেবিলের পাশের জলের গ্লাসটা নিয়েই আসছি, তুমি স্টার্ট করো, আই উইল জয়েন।"

"না না, তুমি এসো, আমি ওয়েট করছি।"

দুজনে ওদের স্টাডি রুমে গিয়ে বসলো।

"কাল লক্ষী পুজো আর আজ ঘরের লক্ষী রাতদুপুরে ড্রিঙ্ক করছে, কাজটা ভালো হচ্ছে কি?"

"তোমাকে কে উঠতে বললো? আমাকে ব্যাগড়া দিতে উঠেছো? না কম্পানি?"

"তোমার মনে আছে, বাবা তোমাকে নিয়ে যেতেন নিয়ে আসতেন ফটো গ্র্যাফি শেখাতে, আর আমি যদি কোনো দিন বাবার আগে পৌঁছে যেতাম তখন মিথ্যে মিথ্যে তুমি ফোন করে বলতে তোমার এক্সট্রা ক্লাসের গল্প।"

"হুম! মনে আছে, লুকিয়ে লুকিয়ে আমরা মিলেনিয়াম পার্কে গিয়ে বসে থাকতাম, তারপর তুমি বাড়ি চলে যেতে আর আমি কলেজ, আর একদিন বাবা ধরে ফেললেন।"
"বিয়ে করা বৌ এর সাথে প্রেম করেছি তাতেও খোঁটা খেলাম মার কাছে বাড়ি এসে।"

"আর আমার সেকি লজ্জা, টানা এক সপ্তাহ বাবার চোখে চোখ রেখে কথা বলতে পারিনি।"

কথায় কথায় পুরো বোতল শেষ। ঘড়িতে ঢং করে দেড়টার ঘন্টা পড়লো। টিকটিকিটা দেয়ালে চিৎকার করে ডেকে ওদের গল্পের একমাত্র শ্রোতা হিসেবে হাততালি দিয়ে আসরের অন্তিমক্ষণ ঘোষিত করলো।
"আজ এসো না - এক সাথে শুই, তুমি আর কত দিন আমায় শাস্তি দেবে?"

"আমার ইচ্ছে করেনা।"

"আমি অপরাধী, কিন্তু বিশ্বাস করো সেদিন এমন কিছুই হয়নি, যাতে তুমি এতোটা রিএক্ট করছো।"

"ঠিক কতটা হলে, রিএক্ট করবো, সেটাও তুমি নির্ধারণ করবে?"

"আমি ভিক্ষা চাইছি।"

"আমার কাছে যা দেবার সব দিয়েছি তোমায় - আর দেবার কিছু নেই।"

"প্লিজ-"

"প্লিজ - কাল সারাদিন উপোস আছে - আমি এবার ঘুমোবো, তুমি যাবার সময় স্ট্যান্ড-ল্যাম্পটা বন্ধ করে দিয়ো।"

অপর্ণা সোজা কম্বলে ঢুকে পড়লো। কৌশিক ল্যাম্পের পাশে বেশ কিছুক্ষন বসে ভাবলেশহীন মুখে আকাশ কুসুম ভাবলো, হতাশ চোখে দেয়ালের তেলরঙা ছবির হারিয়ে যাওয়া রাস্তাটার দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো। একটা গানের লাইনের কথা ভেবে ছবিটা আঁকা। ছবির সাথে ছন্দ মিলিয়ে সত্যিই আজ কৌশিকের পথও অপর্ণার পথের থেকে বহুদূরে গেছে বেঁকে। আর হয়তো রাস্তা দুটো জুড়বে না। দেয়ালের ছবির রাস্তা দুটো সাদৃশ্য রেখে দুদিকে বেঁকে মিলিয়ে গেছে দিগন্ত রেখায়। ক্রন্দসী আকাশ ও পৃথিবী যেথা মেশে।
সেই পঁচিশবছর বয়সে অর্ধাঙ্গিনী হিসেবে পায় অপর্ণাকে। বয়েসে মাত্র আড়াই বছরের ছোটো বড়ো বলে বেজায় আপত্তি ওঠে পূর্বসূরি দের কাছ থেকে। সবার অমতে একপ্রকার গায়ের জোরে বাবা বিয়ে দেন ওদের। বিয়ের পরে এক স্ত্রীর কাছ থেকে এক স্বামীর যা যা প্রাপ্য তা কানায় কানায় পূর্ণ করে সে রঙে রূপে গন্ধে বর্ণের স্বাদে পরিপূর্ণ করে দিয়েছে তার জীবন। এতো বেশি সব কিছু পেয়েছে সে তাই হয়তো ভগবান এতো তাড়াতাড়ি তার ইতি টানলেন।
"জগতে রাহো - হুইসেলের আওয়াজ।"... ঢং ঢং, রাত দুটো। ভারী দেহটা কোনো মতে চেয়ার থেকে টেনে তুলে নিজের ঘরের বিছানায় গিয়ে ফেলে দিলো। ক্লান্তির রুপোর কাঠির ছোঁয়ায় গভীর ঘুমের ছায়ায় ঢেকে গেলো কৌশিকের সর্বাঙ্গ।

পর্ব ৯

প্রথম অধ্যায়

সকালের ব্যস্ত সেন বাড়ির ঠাকুর ঘর। অপর্ণা সব ফর্দ মিলিয়ে শাশুড়ির আদেশ মতো সব গুছিয়ে দিচ্ছে। আজ ভারী পবিত্র দেখতে লাগছে অপর্ণাকে। কাল রাতের আঙুরের ফলের রসের জাদুতে মুখের চামড়ায় এক আলাদা চটক লেগেছে। মোবাইলের ফোন এ একের পর এক প্রেমের বার্তা আসছে উড়ে সুদূর কানসাস থেকে। ওদিকে না তাকিয়ে এক মনে আজ্ঞাবাহি দাসীর মতো একের পর এক আজ্ঞা পালনে ব্যস্ত সে। উলুধনি দিয়ে লক্ষী বরণ করে ঘট পেতে নারায়ণ চিহ্ন দিয়ে, আমের পল্লবে সিঁদুর ফোঁটা দিয়ে, সেই সিঁদুর সিঁথিতে আর

হাতের পলায় ঠেকাতে গিয়ে মনে মনে যখন স্বামীর দীর্ঘায়ু কামনা করলো, তখন দুটো মুখ ভেসে উঠলো।

গোপালের মা রান্নার দিকটা একাই সামলাচ্ছে, কৌশিক - অন্তরা খেয়ে, টিফিন নিজেরাই ব্যাগে ভোরে নিয়ে রামুদার সাথে চলে গেলো। গাড়ি বেরোলে গোপালের মা সারা বাড়ি গঙ্গার জল ছেটাতে লাগলো। অপর্ণা ঘরের প্রতিটি দরজায় সিঁদুর আর হলুদের ফোঁটা দিয়ে, সদর দরজায় আমপাতার চাঁদ মালা ঝুলিয়ে দিলো। পুজোর ঘরে চালের পিটুলি দিয়ে লক্ষীর পায়ের, ধানের কুনকে, কুলোর ইত্যাদির অপূর্ব সাংকেতিক ছবির নকশা আলপনার মাধ্যমে এঁকে দিতে কল্যাণী একগাল হেসে বৌমার মাথায় হাত বুলিয়ে বললো, "আজ ঘরের লক্ষীকে একটু আলতা পড়তে হয়, আমার কুলুঙ্গিতে আছে, তুলি বাটি সব একটা কাঠের বাক্সে ভরা, গোপালের মাকে বলো - পরানোর শেষে ওকে এই ৫০ টাকা দিয়ো, আলতা পরানোর জন্য।"

মাথা নেড়ে, হাত জোর করে মাথা মাটিতে ঠেকিয়ে ঠাকুর প্রণাম করে, আলতা পরে, রামুদা ফেরত আসতেই তাড়াতাড়ি গাড়িতে বসে একের পর এক উড়ো চিঠিতে পাল্টা জবাব ওড়াতে লাগলো।

বিকেলে বাড়ি ফিরে আরেক বার স্নান সেরে, লাল পেরে গরদের শাড়ি পরে ঘুমটা খোঁপার ওপর টেনে বসলো শাশুড়ির পাশে এসে। ভোগের রান্নার পায়েসটা বাদে সব সেরে রেখেছে কল্যাণী। অপর্ণার হাত দিয়ে মহাপ্রসাদটা বানানো হবে।

আসে পাশের দু চার ঘরের প্রতিবেশীদের নিমন্ত্রন হয়েছে, তাদের বসার জন্য মোটা লাল রঙের পশমের গালিচা পেতে দিলো গোপালের মা।

ঠাকুরমশাই ঢুকছেন দেখে অন্তরা শাঁখ বাজানো শুরু করলো। প্রতিবেশী এও স্ত্রীলোকেরা উচ্চৈঃস্বরে উলুধ্বনি দিলো।

সাদা ধুতি পাঞ্জাবিতে কৌশিক ভুঁড়ি বাগিয়ে মায়ের পেছনে এসে বাঘ ছালের ওপর বসলো। অন্তরার সাথে অর্ণবের চুক্তি ছিল ও সাদা চুড়িদার পড়লে, অর্ণবও সাদা পাঞ্জাবি পাজামা পরবে। কিন্তু বেচারা গৃহ বন্দি।

একমনে মা লক্ষীর ধ্যানে মন্ত্র মুগ্ধের মতো সবাই শুদ্ধি হলো সেই সন্ধেতে। পূজো শেষে সবাই বসার ঘরে গিয়ে বসলো। ঠাকুর ঘরের দরজা বন্ধ করে, কল্যাণী ও বেরিয়ে এসে হাসি মুখে সবার আলোচনা শুনতে লাগলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ঠাকুর মশাই তার কড়া গন্ডা বেঁধে ছেদে নিয়ে সেখান থেকে বিদায় নিলেন, বাকি জিনিস রামুদা গাড়ি করে গিয়ে দিয়ে আসবে। অন্তরা গিয়ে সবাইকে প্রসাদ বিতরণ করলো।

কৌশিক বারবার আর চোখে অপর্ণার দিকে তাকাচ্ছে। শান্তির জলের ছিটেয় সারা মুখে ফোঁটা ফোঁটা জলকনা অবাক হয়ে দেখছে, একমনে মনে ঠাকুরকে বলেছে অপর্ণা যেন তার কাছে ফিরে আসে আবার ঠিক আগের মতো। অপর্ণার সেই দিকে ভ্রূক্ষেপের অবসর নেই। অতিথি আপ্যায়নে ব্যস্ত সে।

গোপালের মা এসে সবাই কে সুগন্ধি দার্জিলিং চা পরিবেশন করলো। পাড়ার বয়স্ক একমহিলা খুশি হয়ে চা খেয়ে বললেন, "এই সেন বাড়ির চায়ের খুব সুখ্যাতি - আমার শশুর মশাই আগে এই বাড়িতে বিকেলের বৈঠক বসতেন, শুধু ভালো চা খাবার লোভে, আর বাড়ির চা মুখে তুলেই বলতেন, ইশ কি বিশ্রী।"

সবাই অট্টহাস্যে ফেটে পড়লো, ভদ্রমহিলার মুখভঙ্গি দেখে। কল্যাণী সবার অলক্ষে নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলেন। প্রতিবেশীরা নটার মধ্যেই একে একে বিদায় নিলো। অন্তরা স্কুলের ব্যাগ থেকে ইকোলোজির একটা প্রজেক্ট করা শুরু করলো। সংসারের চাকাটাও ঠিক কতকটা এই খাদ্য খাদকের নিয়মে চলে। গুরুজনদের শাসনে লঘু জনদের প্রাণপাত। আজ ওই প্রতিবেশীদের একটা খুব উজ্জ্বল ছেলে, পাগলা গারদে বসে। বাবা মার মত ছিল না, যে মেয়েকে সে ভালো বেসে ছিল তার সাথে বিয়ের আর তার থেকে মানষিক চাপ বাড়তে বাড়তে, পাগলে পরিণত হয়েছে। অন্তরার মনটা কুঁকড়ে উঠলো, এই ভাবে জীবনের একটা ভুল সিদ্ধান্ত কতটা বিপদজনক তা ভেবে।

পড়ার বই খাতা গুছিয়ে ব্যাগে পুড়ে, নিজের ঘরে গিয়ে অর্ণবকে ফোন করলো। অর্ণব এমন একজন যার সাথে কথা বললে, সব দুঃখ এক নিমেষে মুছে যায়।

ঘুম না আসা পর্যন্ত শুক সারির পাখা মেলে দিলো রাতের অর্ণব সৈকতে।

তৃতীয় অধ্যায়

জানালার ওই পাড়ে অস্তগামী সূর্যের ছটা ছড়িয়ে পড়লো সারা ঘরের আনাচে কানাচে।

আজ অর্ণবের জন্মদিন। ২১শে নভেম্বর, ২০১৪ - আজ অর্ণব ষোলো পূর্ণ হয়ে সতেরোয় পা দিলো।
অন্তরা গ্রিটিংস কার্ড আর বিরাট বড়ো একটা ফুলের তোড়া নিয়ে ঘরের দরজায় টোকা দিতেই অর্ণব তড়িঘড়ি ওকে দরজার ভেতরে টেনে গভীর চুম্বন দিলো।
ফুলের তোড়াটা মধ্যি খানে বড্ড বেশি বিরক্ত করছিলো দেখে অর্ণব ওটাকে বাম হাতে পাশের টেবিলে নামিয়ে রাখলো।
"উঁ উঁ - ছাড় এবার, নিঃশাস নিঃশেষ হওয়ার জোগাড়।"

"কেমন লাগলো বললি নাতো?"

"ভালোই বিদেশী ট্রেনিং পেয়েছিস দেখছি।"

"তোকে আমার একটা অনুরোধ আছে।"

"আজ্ঞা হউক।"

"আমার মোবাইলে এসেছে, ক্যাথের অনুরোধ, তোর অনুমতি চাই।"

"কি দেখা?"

দুজনে আগ্রহ ভোরে পাশাপাশি বিছানায় বসে মোবাইলের চিঠির বাক্স খুললো। অর্ণব উঠে দরজাটা বন্ধ করে দিলো। অন্তরা হতভম্বের মতো চেয়ে রইলো অর্ণবের দিকে - দুজনেই চুপ, সূর্য ডুবে গেছে, ঘরের চতুর্দিকে চাপ চাপ অন্ধকার। একমাত্র আলোক উৎস ওই মোবাইল ফোনটা। ঘরে একটা আলপিন পড়লেও চমকে উঠবে ওরা, এমন সময় অন্তরা বললো - "আমার মতে তোর হ্যাঁ বলা উচিত।"

"কিন্তু আমি তো তোর কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।"

"ধরে নে, আমাদের এটাই ভবিষ্যৎ ছিল।"

"তুই কি ক্ষমা করবি আমায় এর পর?"

দরজায় ঠক ঠক - "টিটো দরজা খোল - সবাই এসে গেছে, কেক কাটা হবে।"

অর্ণব আলো জ্বালিয়ে,দরজা খুলে দিলো। অন্তরা চোখে মুখে জোর করে স্বাভাবিক প্রতিচ্ছবি টেনে, ঠোঁটে মেকি হাসি লাগিয়ে নিচে নেমে গেলো। সবাই উচ্চস্বরে অর্ণবকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানালো।

দুপুরে যে ভদ্র মহিলা জন্মদিনের সাজানোর জন্য এসেছিলেন, অন্তরাকে ঢোকার মুখে "হ্যালো" বললেন, তিনি এতো সুন্দর সাজিয়েছেন দেখে,মনে মনে তাকে শ্রদ্ধা জানালো, অন্তরা। কেক কাটার পর অন্তরার মা সবাইকে কেক দিয়ে রান্নাঘরে চলে গেলো অনুপ্রিয়াকে সাহায্য করতে।

অন্তরার বাবা বড়ো একটা কেক নিয়েছে দেখে, অর্ণবের বাবা খোঁটা দিয়ে বললো, "ওরে এবার একটু বড়ো হয়ে যা, বৈজ্ঞানিক তোর ফ্যাট মেটাবলিসম ওয়ান ডাইরেকশন এ ডিপোজিশন দিচ্ছে সব মধ্য প্রদেশে।"

"ডাক্তার! তুই কনসাল্ট করে আমায় ইনসাল্ট করছিস?"

অর্ণবের সেই অর্থোপেডিক্স বলে উঠলেন, "খেয়ে যাও, এই তো বয়স, শুধু ফ্যাটের লেয়ারটা তোমার হাড্ডিতে পৌঁছালে বোলো হে।"

ওদের নিচের বসার ঘরে প্রবীণদের জমজমাট আসর বসেছে দেখে, অর্ণব আর অন্তরা একটু পাশ কাটিয়ে টিভির পাশের সোফায় গিয়ে বসলো।

অর্ণব শেষ মুহূর্তে ওর সব বন্ধুদের বারণ করলো আসতে। ক্যাথের চিঠি ওকে এতটাই পাগল করেদিল, যে অন্তরার সাথে মুখোমুখি এই আলোচনাটা খুব দরকারি হয়ে উঠলো।

গিন্নি অর্থোপেডিক্স এমন হাসির ধাঁধা বলতে শুরু করলো যে ওরা সব ভুলে এতো চাপের মধ্যেও হাসতে লাগলো।

অর্ণব কিছুতেই নিজেকে ক্ষমা করতে পারছে না। অন্তরার অনুমতিটাও গিলতে কষ্ট হচ্ছে, ক্যাথের প্রস্তাবে না বলার দুঃসাহস ও নেই। স্টার্টার খেয়ে ওরা দুজন বড়োদের অনুমতি নিয়ে মাসোনাইনে চলে যাবার মুখেই সিঁড়িতে আটকে গেলো দুজন, সৌজন্যতা সূত্রে। হুইস্কির আর ওয়াইনের ফোয়ারার তালে গানের আসর বসেছে। অপর্ণা ডাকলো অন্তরাকে পিয়ানো বাজানোর জন্য, অন্তরা ছোট্ট একটা তানে "রেড রিভার ভ্যালি "বাজিয়ে উঠে পড়লো।

পরের অনুরোধ এলো অর্ণবের জন্য - কোনো মতে আড় আড়-ছাড় করে বাজিয়ে মুক্তি পেলো তারা। ওপরের ঘরে গিয়েই দরজা বন্ধ করে জড়িয়ে ধরলো অন্তরাকে, "তুই আমায় ক্ষমা করবিতো?"

"দেখ, মৃত্যু পথযাত্রীর শেষ ইচ্ছে পালনটা তোর কর্তব্য, ভালোবাসা তার পর, সব কিছুকে ব্যালান্স করার নামই জীবন।"

"তুই খুব ভালো - আমি হয়তো তোর যোগ্য নই। এসব ঝামেলায় না জড়ালেই হতো।"

"আর ঝামেলা বললে ক্যাথের অপমান হবে - ও মরার আগে তোকে বিয়ে করতে চায়, এতে এতো ঘাবড়াচ্ছিস কেন?"

"তুই এতো উদারতা কবে শিখলি? আমি কি আমার সেই অন্তরাকে দেখছি? নাকি তোর অন্য রূপ?"

"গাড়ির চলার আগে একটা টেস্ট ড্রাইভের ট্রায়াল হয়, তুই তারপর আগুনে পুড়ে খাঁটি ইস্পাত তলোয়ার হয়ে আমাকে বধ করবি।"

"সেকেন্ড হ্যান্ড বলে, রিফিউজ করবি নাতো? প্রমিস?"

"প্রমিস।"

"তিন সত্যি?"

"তিন সত্যি।"

নিচ থেকে বিরিয়ানীর ভুড়ভুড়িয়ে গন্ধ বেরোচ্ছে, ওরা নিচে নেমে সবার আনন্দের রঙে আরেকটু রং দিলো।

সব সেরে বাড়ি ফিরতে ফিরতে মধ্য রাত্রি গড়িয়ে গেলো।

রামুদার গাড়ির থেকে অন্তরা নামার সাথে সাথে কেউ কেউ করে সে কি অভিযোগ ভক্তরামের, লেজ নেড়ে মাথা নেড়ে বলছে, গোপালের মা ওকে খেতে দেয়নি। অন্তরা শিগ্গিরি ওর জন্য এনে ফ্রিজে যা ছিল মাইক্রোভেনে গরম করে ওর নির্দিষ্ট বাটিতে, গ্যারাজের পাশে এক কোণে খেতে দিলো।

সবার অলক্ষে চিলেকোঠার ঘরে উঠে বালিশে মুখ গুঁজে বেশ কিছুক্ষন মুখ চেপে কাঁদলো। ফোনে একের পর এক মেসেজ আসছে অর্ণবের।

"তুই বাড়ি গিয়ে কাঁদছিলি কি? আনসার মি? কিরে? কিহলো? আমি জানি ওটা তোর মনের কথা ছিল না। আমি তুই না বললে ক্যাথের বাড়ি যাবো না এই ফ্রাইডে।"

একবার কোনো উত্তর এলোনা অন্তরার দিক থেকে। ছাদের তালা দিয়ে নিচে গিয়ে ওই বাইরের জামাতেই সে রাত কেটে গেলো অন্তরার - বুক ফাটলেও, মুখ ফুটে বলতে পারলোনা, "আমি তোর প্রথম স্ত্রী কেন হলাম না?"

চতুর্থ অধ্যায়

ভবিষ্যৎ তার নিজস্ব স্রোতে নীরবে কুলু কুলু রবে বয়ে যায়। আমরা ভাবি এক আর নিয়তি খরস্রোতা নদীর মতো আমাদের জীবনকে চুপিচুপি চোরা বালির গভীরে টেনে নিয়ে যায় আমাদের অজান্তে। যতক্ষণে ঠাহর করি ততক্ষনে আকণ্ঠ বালির ভিতর।

আজ ২৭শে নভেম্বর। এগারোই অঘ্রাণ ক্যাথের সাথে অর্ণবের গান্ধর্ব মতে বিবাহ হবে আজ এই লগ্নে। সবার অলক্ষ্যে। সাক্ষী শুধু অন্তরা।

অনেক বার হাতের ফোনটা তুলেছে- এই একটা বাক্য লেখার জন্য - "এই বিয়েতে তার মত নেই" - কিন্তু মানবিকতার পরগাছা আষ্টে পিষ্টে তার হাত দুটোয় জড়িয়ে ধরেছে।

আজ স্কুলেও ভৌত বিজ্ঞানের খাতায় সোহিনী সব চেয়ে বেশি নম্বর পেয়েছে বলে মন খারাপ। সোহিনী ওর চেয়ে কম পেলে ওর মন খারাপ হয়, তখন আপ্রাণ চেষ্টা করে ওর নম্বর যাতে বাড়ানো যায়, আবার আজ যেই অন্তরা এক নম্বর কম পেয়েছে মন খারাপ তার।

দুদিকে বিনুনি করে ফিতে বাঁধা চুল,পায়ে মোজা, স্কুলের জামায় চিলে কোঠার ঘরের জানালার পাশে বসে লোহার শেকল ধরে ক্লান্ত মনে পড়ন্ত বেলার রোদে সেকে "হিউমান সাইকোলজির" কথা ভাবছিলো সে এক মনে। বন্ধু যদি টপকে যায় সেটা খুব কষ্ট হজম করা, আবার বন্ধু যদি পিছিয়ে পরে তাকে প্রাণ ঢেলে এই হিংসুটে মনই আগুয়ান হয় সাহায্যের জন্য।

যে ক্যাথ তার চক্ষুশুল ছিল সেই ক্যাথের হাতেই তার জীবনের অমূল্য ধনকে আজ সমর্পন করতে চলেছে সে। এই পাঁচ দিনে অর্ণবের অন্তত পক্ষে শ 'খানেক চিঠি উড়ে এসেছে তার মেল্ বক্সে। সে কোনো উত্তর দিতে পারেনি।

"অন্তরা" - চমকে উঠলো সে, "তুই এখানে কি করছিস? কেনো এসেছিস? আর আমার দেবার কিচ্ছু নেই। আমি ক্লান্ত, আর আমার কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিসনা। তোরা শান্তিতে বিয়ে কর, আমার পূর্ণ সম্মতি দিলাম।"
হাঁটু গেড়ে অন্তরার পাশে বসে অন্তরাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললো, "পাগলী কোথাকার! তুই কি ভাবলি, আমি ক্যাথের হয়ে যাচ্ছি? আমার পুরোটাই তোর, বুকটা চিরে দেখাতে পারলে, খুশি হতাম।"

"তুই এখানে কেনো এসেছিস? পিয়ার প্রেশার ইস ট্রিমেন্ডাস - আই ক্যান্ট বিয়ার ইট।" অর্ণবের বুকে মুখ গুঁজে কান্নায় ভেঙে পড়লো অন্তরা।

"শান্ত হ -বাবু, আমি যে কথা দিয়ে ফেলেছি ক্যাথেকে, ও তো বসে আছে বল - আমি কি করি? তুই শনিবার একবার মুখ ফুটে কেন বললিনা তোর এই অবস্থা?"

"একজন মৃত্যু পথযাত্রীর শেষ ইচ্ছে পূরণের সামর্থ্য আমার আছে।"

"আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বল।"

অন্তরা কাঁপা কাঁপা গলায় - "নয়নের দৃষ্টি হতে ঘুজবে কালো, যেখানে পড়বে সেথা দেখবে আলো।"

দুজনেই দুজনকে ধরে বসে কিছুক্ষন কাঁদলো, তারপর অন্তরা চোখ মুছে, অর্ণবকে বললো - "তোদের বিয়ের জোগাড়যন্ত্র কি করেছিস? আমি গুছিয়ে দিচ্ছি, তুই ভরতে থাক তোর ব্যাগে, একমিনিট দে, আমি নিচের থেকে নিয়ে আসছি।"

অন্তরা চোখের নিমেষে সব নিয়ে এলো, একটা নতুন সিঁদুরের কৌটো, আলতার শিশি -তুলি -বাটি, ঠাকুমার সিংহাসনের পুজোর ফুল, ঠাকুরের কুলঙ্গির ধান, কড়ি। সাথে ওর পুজোয় কেনা টুকটুকে নতুন লাল ঢাকাই জামদানি।
"শাড়িটা এতো লাল বলে ভাঙিনি - তখন বুঝিনি এটা এতো বড়ো কাজে আসবে। এর ভেতরে ম্যাচিং সায়া - ব্লাউজও আছে, ব্লাউজটা ক্যাথের বোধহয় বড়ো হবে। এটা তোদের বিয়ের ছোট্ট উপহার আমার তরফের, টেক্সট করে জানাস তোর বৌয়ের পছন্দ হলো কিনা?"

অর্ণব ওর মুখে হাত চেপে বললো, "তুই ই আমার একমাত্র বৌ - আর কেউ নয়, বলতে পারিস ক্যাথের জন্য বর খুঁজে পাইনি তাই প্রক্সি দিচ্ছি, ঠিক যেমন ক্লাসে রোল প্লে করি সায়েন্স টপিকের ওপর।"

"তোদের কোথাও ডাইরেক্ট করতে হলে বলিস, আমি এখান থেকে ডাইরেকসান দিয়ে দেব।"

"তোর জন্য এনেছিলাম।"

"কোথায় পেলি?"

"পেয়েছি, ওসব জেনে কি করবি? ৬টা আছে, আমি শিখিয়ে দেবো - তবেই খাস, আমাকে ছাড়া খাসনা, প্যাকেট টা তোর ওই ট্রেজার বক্সে রেখে দিলাম।"

"কি ভাবে টানব?"

"ধোঁয়াটা নিবি, মুখটা বন্ধ রেখে বুকের ভেতর ওটাকে সেটেল করে নাক দিয়ে আসতে আসতে ছাড়বি - তোকে কাল এসে শিখিয়ে দেব, নাচের ক্লাস থেকে ফিরবি কখন?"

"কাল সিনিয়র ডিপ্লোমার পরীক্ষা আছে, নাচ - গান দুটোই, আসতে আসতে বিকেল ৫টা বাজবে।"

"তুই ফোন করিস।"

"তোর পাঁজরের ব্যাথা কেমন?"

"সুইমিং ৬মাস বন্ধ, জিম এর ওয়েট নেয়াও বন্ধ - শুধু ফিজিও চলবে, আমি উঠিরে, ক্যাথ বসে আছে।"

পকেট থেকে ফোন বের করে দেখলো, এগারোটা মিসড কল এসেছে ক্যাথের। অর্ণবকে ইচ্ছে করছে নিজের কাছে বেঁধে রাখতে, কিন্তু চলে গেলো তড়বড় করে। নিজের অজান্তেই চোখ দিয়ে জল বেরোচ্ছে। নিচে গোপালের মা চিৎকার করে খেতে ডাকছে। অর্ণবের লুকানো প্যাকেট টা স্কুলের জামার পকেটে গুঁজে নিচে গিয়ে বললো, "আমায় একেবারে ডিনার দিয়ে দাও, মা বাবা এলে বোলো আমি পরীক্ষা দিচ্ছি কেউ যেন ঘরে না ঠক ঠক করে।"

রুটি তরকারি তাড়াতাড়ি নাকে মুখে কোনো মতে গুঁজে নিজের ঘরে গিয়ে দরজা দিলো।

দেখতে সিগারেটের মতো, কিন্তু ভিতরের মশলায় জাদু ভরা, স্বয়ং ভোলানাথের নেশা। লাইটারের আগুনটা জ্বালিয়ে ভালো করে দেখলো, সিগারেটটা আনাড়ির মতো ধরে ঠিক অর্ণবের কথা মতো বড়ো সড়ো একটান দিয়ে বুকের ভেতরে ধরে রাখলো বেশ কিছুক্ষন, তার পর নাক দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে গিয়ে ভয়ানক বিষম খেলো, কাশতে কাশতে দম শেষ। তবুও ওর শান্তি হলোনা কেশে, বুকটা জ্বলছে, ধোঁয়ায় না রাগে তা বোঝা যাচ্ছেনা। আরেক টান - একই শিল্পীর কারুকার্যে দমের ধরা -ছাড়া - এবারে সে দক্ষতার সাথে উতীর্ণ হলো।

মাথা ঘুরছে, সারা গায়ে পিঁপড়ে কামড়াচ্ছে, দেয়ালে ক্যাথ আর অর্ণবের মিলন চিত্র, ঠিক অজন্তা ইলোরার স্থাপত্যের মতো, অন্তরা হাত দিয়ে বহু চেষ্টায় ও এই মিলন আটকাতে পারছেনা।

খুব মিষ্টি খেতে ইচ্ছে করছে - এক ভাঁড় রসগোল্লার রস যদি পাওয়া যায়। ভাবতে মাথাটা উঁচু করতেই চোখে পড়লো - ওর সেল্ফ এ দুলালের তালমিশ্রি আছে, কাঁচের শিশিটা খুলতে মনে হলো একযুগ কেটে গেলো।

সূর্য ডুবছে। পাখিরা বাসায় ফিরছে। কনে দেখার আলোয় নিজেকে আয়নায় আরব্য রজনীর জাদুকরী মনে হচ্ছে, যাকে দেখে তরুণ মুসাফিরেরা পথ হারাতো বনের হরিণ প্রাণ দিত রূপ তৃষায় পাগল হয়ে। সিগারেটের ছাইটা কি সুন্দর না পরে আটকে আছে। লাল সূর্যের মতো গনগনে লাল আলো ঠিকড়োচ্ছে প্রতিটি টানে।

একেক মিনিট একেক ঘন্টা। রথে চেপে হাওয়ায় ভাসছে শরীর। খুব কাছে আগুন। ঠোঁটে আগুনের তাপ লাগতে মেঝেতে ফেলে দিলো। সব মাতাল জাত টাই বোধয় তালে ঠিক ঠাক হয়। ডেস্কের তলার থেকে ডাস্ট প্যান বের করে ওটাকে পরিষ্কার করে পড়ার টেবিলের পাশের পেপার বিনটায় ফেলার আগে দেখে নিলো আগুন পুরো নিভেছে কিনা।

শরীরটা তুলে বিছানায় যেতে গিয়ে মনে হলো অনেক ওপরে ভাসমান কোনো ঘোড়ায় চড়ার মতো তাতে সওয়ার হয়ে জোর গলায় ভগবানকে বললো, "আজ আমার সাথে তুমি যা করলে, ভালো করলে না ঠাকুর - তুমি ভালো না, তুমি ঘুষ খাও – কোরাপ্টেড।" নিজের মনে ছাই পাশ বলতে বলতে ঘুমিয়ে পড়লো ক্রুদ্ধ সিংহীর মতো গর্জ নিনাদে ।

পঞ্চম অধ্যায়

অর্ণব বিয়ের সব জোগাড়যন্ত্র করে দুরু দুরু বুকে ক্যাথের ঘন্টি বাজালো। ক্যাথ দরজা খুলে খুব বড়ো একটা নিঃশাস ছাড়লো। লাজুক মুখে বিয়ের কনের মতোই লাজে রাঙা হয়ে উঠলো। অর্ণব পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার জন্য জিজ্ঞেস করলো, "তোমার বাবা কখান ফিরবেন, ক্যাথ?"

"আজ ড্যাডের দিল্লিতে কনফারেন্স আছে, মর্নিং ফ্লাইটে বেরিয়ে গেছে। ফিরতে রাত হবে। মম ওয়ান্টেড টু কম হিয়ার টু কিপ এন আই অন মি, বাট আই টোল্ড হার - নট টু।"

"ক্যাথ তোমায় ছোটো চুলে খুব সুন্দর লাগছে।"

"ডোন্ট টেল আ লাই - নো ড্রামা - আই নো আই এম লুকিং উইয়ার্ড।"

"তোমার সাথে নাটক করবো না কোনো দিন, খুব লয়াল থাকতে চাই সবসময়।"

"আই এম ইন ডিস্ ওয়ার্ল্ড ফর ফিউ ইয়ার্স, এন্ড কুড বি ডিস্ ইস আওয়ার লাস্ট মিটিং।"

"শেষ দেখা তো কি হয়েছে, তুমি ততদিন বেঁচে থাকবে, যতদিন আমি আছি।"

"আমি যদি আর ওয়ান ইয়ার বাঁচি, তাহলে ইস ইট পসিবল টু হ্যাভ এ বেবি ফ্রম ইউ?"

"আই উইশ, উই শুড - তুমি আমায় বিয়ে করতে চেয়েছো বলে অন্তরা নিজে হাতে তোমার জন্য এগুলো পাঠিয়ে দিয়েছে। তুমি এগুলো পড়ে নাও - আমি ওই মোমবাতিটা জ্বালিয়ে অগ্নিদেবকে সাক্ষী হতে বলছি।"

"আমার খুব ইচ্ছে ছিল হাতে মেহেন্দি পড়বো, কিন্তু আমাকে কাল রিলিস করলো এতো দেরি করে,আর মর্নিং পিলগুলো সো ডিসগাস্টিং যে - জাস্ট ওয়ান আওয়ার বিফোর ইউ, আই ওক আপ।"

"নেভার মাইন্ড-জীবনে সব কিছু হিসেব মেনে চলে না, বাট আই ক্যান মেক আ নাইস ইন্ডিয়ান আর্টস ইফ উ হ্যাভ দা মেহেন্দি পাউচ।"

"ইয়েস, আই ডু হ্যাভ কাপল অফ।"

"তুমি আগে সব সেরে নাও, বিয়ে হোক আমাদের তারপর আমি তোমার হাত রাঙিয়ে দেব।"

ক্যাথ চলে গেলো বেড রুমে, দরজা বন্ধ করে সাজুগুজু করতে লাগলো এক মনে। অর্ণব মোমবাতিটা টেনে অন্য বসার ঘরে,জ্বালিয়ে চারপাশটা একটু হাঁটার মতো জায়গা করে ঠিক বৃত্তের বিন্দুতে বসালো ওটাকে। এখানে সাত পাকে ঘোরা হবে।
অন লাইনে "যদিতং হৃদয়ং তব - তদিতং হৃদয়ং মম" - খুঁজে লাগিয়ে দিলো। আগুনের দিকে তাকিয়ে একমনে ক্যাথের দীর্ঘায়ু কামনা করলো, মনে মনে ভাবলো আজ ভগবান ক্যাথকে তার মনোস্কামনা পূর্ণ করলে একবছর পর ক্যাথ আর ওর প্রথম সন্তান হবে, যার ভবিষ্যতে ভার নিতে হবে অন্তরাকে, এখনো কম করে পাঁচ থেকে সাত বছর লাগবে ওদের দুজনের নিজের পায়ে দাঁড়াতে, এই অবস্থায় বাচ্চাটির ভার বর্তাবে সোহমের ওপর। নিশ্চয়ই কোনো ন্যানির ব্যবস্থা হয়ে যাবে বিদেশে।
অর্ণব চটপট এখানে যা যা হচ্ছে তার ধারাবাহিক বিবরণী দিয়ে দিলো অন্তরাকে।
ক্যাথ বেরিয়ে এলো, হাতের মুঠোয় মেহেন্দির প্যাকেট। স্বর্গের পরী লাগছে ওকে, লাল ঢাকাই পরে তার গা দিয়ে যেন জ্যোতি ঠিকরোচ্ছে। সোনার গহনাও পড়েছে সে। অর্ণব ওর মাথায় ঘুমটা তুলে দিলো। শাড়ির আঁচলের একপাশ ওর জিন্সের পকেটে গুঁজে সাত পাকে ঘুরে, মালা বদল হলো, এর পর বসে কুনকেতে সিঁদুর লাগিয়ে অন্তরা যেমনটি শিখিয়েছিলো ঠিক তেমন কপাল থেকে মাথার সিঁথি পর্যন্ত টেনে দিয়ে, ঘুমটা নামিয়ে দিলো।
ক্যাথ হাতের মুঠোয় একটা ভারী সোনার আংটি অর্ণবকে পড়িয়ে দিলো।

"কি করছো? এতো অনেক দামি - আমি তো এর জন্য প্রস্তুত ছিলাম না, মা জিজ্ঞেস করলে কি বলবো?"

"আই ডোন্ট নো, জাস্ট হ্যান্ডেল ইট।"

"তোমার বাবা যদি -"

"ডোস অর্নামেন্টস বিলং টু মাই গ্রানি - এন্ড দ্যাট ওয়ান ওয়াস মাই গ্রানপাস রিং।"

"তুমি কি খুব রেগে যাবে এটা না নিলে?"

"ওটাই আমি হয়ে থাকবো তোমার কাছে।"

অর্ণব আর কথা না বাড়িয়ে পুজোর ফুল, ধান দুর্বা ক্যাথের মাথায় ঠেকিয়ে,বললো - "চলো তোমাকে মেহেন্দি আর আলতা পরিয়ে, ফটো তুলে আমাদের ফুলশয্যা শুরু করি।"

বেড রুমে গিয়ে অবাক অর্ণব, গোলাপ ফুল দিয়ে কি অপূর্ব বিছানার চাদর সাজিয়েছে সে।

"কখন করলে এসব?"

"ফোন করে তুমি আসার আগেই আনাই ওই ফ্লাওয়ার ডোমেন থেকে - হেভেন - ইসন ইট?"

"হুম! -তুমি বসো আগে আলতা পড়াই - বি কেয়ারফুল - লেট্ ইট ড্রাই ফাস্ট।"

আলতা পড়ানো হয়ে গেলে মেহেন্দির পালা। ক্যাথ অবাক চোখে দেখলো, দক্ষ শিল্পীর মতো এক এক টানে কত কি এঁকে দিলো অর্ণব চোখের নিমেষে,এতো পছন্দ হলো ওর যে আর থাকতে না পেরে অর্ণবের ঠোঁটে অকস্মাৎ ঠোঁট ছোয়ালো ও।
অর্ণব বললো, "এবার তুমি হাত দুটো উঁচু করে বসে থাকো,আর কোনো কথা নয় - আমি জানিনা কি ভাবে শুরু করতে হয়? আমার খুব নার্ভাস লাগছে, তোমার হাতের মেহেন্দি শুকানো পর্যন্ত, আই ক্যানট ওয়েট।"

ঘড়িতে পিং করে ঘন্টা পড়লো, সাড়ে সাতটার। ক্যাথ চোখ বন্ধ করে বললো, "আই এম ওকে বিয়িং ওয়েট।"

অর্ণব যত্ন নিয়ে অন্তরার দেয়া শাড়ি খুলে ফেললো ক্যাথের গা থেকে। ক্যাথ উত্তেজনায় কাঁপছে। ভিজে ঠোঁট শক্ত করে সহ্য করছে শরীরের সাথে শরীরের প্রথম প্রবেশের যন্ত্রনা।
"আমাকে বোলো তোমার কষ্ট হলে।"

"আই ক্যান ডাইজেস্ট ডিস্ মাচ পেন।"

পাশাপাশি দুজন ক্লান্ত শরীরে শুয়ে পড়লো। ক্যাথের চোখে জল।
"কি হলো? খুব বেশি লেগেছে তোমার?"

"না! আমার উইশ - ইট শুড কাম ট্রু।"

"তোমার পিরিয়ড সাইকেল অনুযায়ী হলে, ইট শুড গো ফারদার।"

"আদার ওয়াইস?"

"আমাকে আমেরিকায় যেতে হবে।"

"কাল ইভিনিং সিক্স ও ক্লক ফ্লাইট।"

"আমাকে মার সাথে চেকআপে যেতে হবে, আমি আপ্রাণ চেষ্টা করবো, এয়ারপোর্ট পৌঁছনোর - তোমরা সাড়ে চারটেতে ঢুকে যেও, ওখানে একঘন্টা গল্প হবে।"

"আমি তোমার কাছেই থাকতে চাই।"

"তুমি আর আমি তো এই মুহূর্ত থেকে এক আত্মা হয়ে গেছি - তোমার আর আমার রক্ত মিশবে - নতুন এক জিন পুলের সৃষ্টি হবে তোমার শরীরে।"

"ঠিক কবে বুঝবো আমি মা হয়েছি?"

"আমি অন্তরাকে জিজ্ঞেস করবো, ও বায়োর এক্সপার্ট - আমরা এই মুহূর্তের জন্য ওর কাছে সারা জীবন ঋণী থাকবো।"

"আমি আমার জীবনে ওর মতো ভালো মেয়ে দেখিনি।"

"শোনো মা অনেক বার ফোন করছে, আমায় উঠতে হবে। তোমায় হেল্প করি? তোমার বাবা এসে কিছু বুঝতে যেন না পারে।"

"বাবার ফ্লাইট মিড্ নাইটে ল্যান্ড করবে - আই গট প্লেনটি অফ টাইম।"

"এই বিছানার চাদরটায় অনেক দাগ লেগেছে,আমি ক্লিন আপ করছি, তুমি বাথরুমে গিয়ে নরমাল হয়ে এসো।"

গোলাপ ফুলগুলো একটা বেতের ঝুড়িতে তুলে, চাদরটা ওয়াশিং মেশিনে দিয়ে,ওয়ারড্রপ থেকে কাঁচা চাদর পেতে দিলো।
পিলসুচের প্রদীপটা তখনো জ্বলছে। প্রদীপটা আগের জায়গায় রেখে বসার ঘরের ধান-ফুল-সিঁদুর সব মুছে ঝকঝকে করে নিজের ব্যাগ গুছিয়ে নিলো।
ক্যাথ, নীল রাতের প্যান্টস আর সাদা টপ পরে বেরিয়ে এলো। অর্ণব চমকে গিয়ে বললো, "মাথার সিঁদুর মুছলেনা?"

"ওটা মুছতে নেই।"

"ওয়েট টিসু দাও আমি মুছে দিচ্ছি - তোমার বাবা নইলে ঢুকেই হার্ট ফেল করবেন।"

অর্ণব আদর মাখানো হাতে ধীরে ধীরে তা তুলে দিলো।

"সিঁথির সিঁদুর টা থাকবে আবছা - ওটা উঠছে না।"

"ডোন্ট ওয়ারী, আই উইল কাভার ডট্ আপ উইথ মাই নিউ হেয়ার স্টাইল।" বলে সিঁথিটা সাইডে করতেই সিঁদুর লুকিয়ে গেলো।

"আমাকে বাড়ি যেতে হবে ক্যাথ - আমার টিশার্ট এ মেহেন্দির দাগ লেগেছিলো, ওটা মেশিনে চাদরের সাথে কাচতে দেয়া, আমি শুধু স্যান্ডোর ওপর সোয়েটার এই ঠিক আছি।"

দুজন দুজন জড়িয়ে ধরে বেশ কিছুক্ষন একে অপরের দেহের উষ্ণতার আদান প্রদান করে, অর্ণব বুঝলো ক্যাথ কাঁদছে।

"আমি কাল যে ভাবেই হোক এয়ার পোর্ট যাবো - তুমি কেঁদোনা।"

ক্যাথ ভিজে চোখে দরজা পর্যন্ত গিয়ে, অর্ণবকে অতি কষ্টে হাসি মুখে বিদায় জানালো।

পর্ব ১০

প্রথম অধ্যায়

আকাশের গায়ের চাপ চাপ অন্ধকার ক্রমে কেটে যাচ্ছে। পাখির কাকলি মেশানো হিমেল হাওয়ায মোড়া তরতাজা নতুন এক দিন এসে কড়া নাড়লো জানালার খড়খড়িতে। আরশিতে ভোরের প্রথম কিরণের প্রতিফলনে চোখ খুললো অর্ণবের।

কাল বহু চেষ্টাতেও অন্তরার কাছ থেকে কোনো পাল্টা উত্তর পাইনি ও। অন্তরাকে কি কি হয়েছে সবটা বলে, আজ মনে হচ্ছে সেটা সে গোপন করলেই পারতো। কিছু কিছু জিনিস সে বাধ্য নয় ওকে বলতে। তার হয়তো আরেকটু পরিণত হওয়ার সময় এসেছে।

কালকের ক্যাথের সাথে যা কিছু হয়েছে তার পর সে যেন হঠাৎ করে একরাতে অনেকটা বড়ো হয়ে গেছে।

সকালের প্রাত্যহিক কাজ সেরে নিচে গিয়ে জলখাবার খেতে বসে ক্যাথের মনের উচাটনের ধারাবাহিক বিবরণীর প্রতিটি অনুভূতির পাল্টা উত্তর সে পাঠাতে লাগলো।

শরীর কখন যেন মনের ওপরে উঠে গিয়ে কোনো অগ্রিম সূচনা না দিয়েই সমস্ত ইন্দ্রিয়কে গ্রাস করেছে। আজ সকালটা একটু অন্য রকম - অন্য সময় দিনের প্রথম বার্তা অন্তরার কাছে পৌঁছয়, আজ তার ভেতর বাইরে সবটা জুড়ে শুধু ক্যাথ।

বুকের ভেতর টা মুচড়ে উঠছে। কি ভাবে থাকবে সে ক্যাথ কে ছেড়ে?

কালকের তোলা ওদের বিয়ের ছবি গুলো দেখতে লাগলো - কি অপূর্ব সুন্দরী ক্যাথ। এতো দিন ক্যাথের জন্য তার শুধু চর্ম চক্ষু খোলা ছিল, আজ যেন তার মর্ম চক্ষু খুললো। ক্যাথ যেন নেশার মতো টানছে তাকে - আরো একরাত যদি পেতো সে, হাতের আংটিটার দিকে তাকিয়ে চুমু খেলো ওটায় - একেই বলে গান্ধর্ব মতে বিবাহ। বিবাহ সে যেই ভাবেই হোক, ক্যাথ ওর স্ত্রী। কিছুতেই ক্যাথকে সে যেতে দেবেনা পৃথিবী ছেড়ে। যম এসে ওর প্রাণ নিয়ে তবেই কিন্তু ক্যাথকে নিতে পারবে। ও বেঁচে থাকতে কারুর সাহস নেই ওর থেকে ক্যাথকে আলাদা করে।

ঘরে গিয়ে ফোন করলো ক্যাথকে। কোনো উত্তর নেই। হঠাৎ মনে পড়লো,ওতো বলেছিলো ওষুধের কড়া দাগে ওর চোখ খোলেই দুপুরের পর। ভাবলো, ও যত ঘুমোবে ততই ভালো, শরীর সুস্থ থাকবে।

পরের ফোনটা অন্তরাকে করলো, হাজার হোক অন্তরার প্রতি তার কর্তব্য সে এড়াতে পারেনা। অন্তরা ভাগ্যবসত ফোন তুললো - "হ্যালো - বুঝলি, খেয়েছি কাল।"

"কি?"

"তোর দেয়া এক ছিলিম।"

"বলিস কি রে বেঁচে বর্তে আছিস?"

"হ্যা! কাল বিশ্ব ব্রম্ভান্ড ঘুরে গেছিলো, আজ চোখ খুললো তোর ফোনে।"

"জগিং এ যাবো, যাবি?"

"কাল কে তোর মেইলগুলো পড়া হয়নি, ভাবছিলাম পড়ে দেখবো, কি কি হোলো এডভেঞ্চার!"

"আমার খুব উইয়ার্ড লাগছে রে।"

"কেনো?"

"তোকে বেস্ট ফ্রেন্ড মনে হচ্ছে'

"আমি তো তোর বেস্ট ফ্রেন্ড ই।"

"তুই তো তার চেয়েও বেশি ছিলিস।"

"এখন নেই আর?"

"তুই আয়, বাবু প্লিজ - আই নিড ইউ, সব ঘেঁটে যাচ্ছে।"

"কি হলো?"

"আমি তোকে বলতে চাই - আজ ক্যাথ ছেড়ে যাবে বলে, আমার সীতার বনবাসের এপিসোডে রামের মতো নিজেকে মনি হারা ফনি মনে হচ্ছে।"

"কিন্তু এতো দিন তোর মাথার মণি তো আমি ছিলাম - এক রাতে এতটা পর হয়ে গেলাম?"

"তুই রামুদাকে গাড়ি বের করতে বল - আমি জগিং এ যাবো তোর সাথে।"

"দাঁড়া নিচে দেখি কি অবস্থা - তবে এরম হুট্ বলতে ছুট আমি বেরোতে পারবোনা। আমার মাথা ঘুরছে। তুই ছাড় আমায় - জিমে গিয়ে ছুটে আয়। এই রোদে ছুটলে আমি কালো হয়ে যাবো। আজ মা সাত দিনের জন্য কানসাস যাচ্ছে,আমি পরে তোর সাথে কথা বলবো, দেখ আমি জানি তুই আমার আছিস আর আমারই থাকবি, কাল রাতে তুই তো রোল প্লে করেছিস, এটা মনকে বোঝা, তুই এয়ার পোর্টে গেলে দেখা হবে, আমার মাও একই ফ্লাইটে মুম্বাই যাচ্ছে।"

অর্ণব ফোন রেখে একাই বেরিয়ে গেলো। মা বারণ করলো, ভাঙা হারে ছোটা উচিত নয় বলে। অগ্রাহ্য করেই ছুটতে গেলো। মাথা কাজ করা তখনি বন্ধ হবে, যখন দেহ ছেড়ে দেবে। বুকের কলিজা যখন টনটন করছে তখন বাড়ি ফিরে এলো।

অশান্ত মন উথালি পাথালি করে দুপুর টাও কাটলো। টেবিলে একগাদা পড়াশুনো স্তুপাকারে জমা পড়েছে। কিছুতেই কিছু করার ক্ষমতা নেই। ঘড়িতে ৩টের ঘন্টা পড়লো। বন্ধুর জন্মদিন বলে, মা কিছু জিজ্ঞাসার আগেই, ঝড়ের গতিতে বেরিয়ে গেলো। পাবলিক ট্রান্সপোর্ট ধরে সোজা এয়ারপোর্ট।

ক্যাথকে কিছু কিনে দেবে ভেবেছিলো, কিন্তু ওর বাবার চোখে যদি ধরা পরে যায় তাই কিনলো না। ক্যাথ শুকনো মুখে দাঁড়িয়ে আছে সোহমের পাশে। ইভগেনিয়াও এসেছে সোহমকে বাই করতে। ক্যাথের মা, সৎ বাবা আর কেনিও ও দাঁড়িয়ে গল্প করছে। কোথায় ভেবে ছিল নিভৃতে দুটো কথা বলবে তা আর হলো না।

অন্তরা আর অপর্ণাকে দেখে অর্ণব হাত নাড়লো দূর থেকে। অন্তরার কানে ফিসফিসিয়ে বললো অপর্ণা - "বেচারা ক্যাথেরিন - কি সুন্দর ছিলো, কেমো দিয়ে, চুল কেটে - ফুলের মতো মেয়েটার কি হাল করেছে ডাক্তারেরা।"

"ডাক্তার নয় মা, - ওর ভাগ্যই এই সব করেছে।"

কাছে গিয়ে সবাই আলাপ পরিচয় সেরে বাহ্যিক আলোচনা শুরু করলো। অন্তরা ক্যাথের কাছে গিয়ে বললো, "হোপ ইউ উইল রিকভার সুন্।"

"থাঙ্কস ফর এভরিথিং।"

অর্ণব এসে অন্তরার পাশে দাঁড়ালো। ক্যাথ ওর বাবার সাথে সবাইকে শেষ বিদায় জানিয়ে ঢুকে গেলো। অর্ণব আর অন্তরাকে রামুদার গাড়িতে তুলে প্রবেশ দ্বারের দিকে গুটি গুটি পায়ে এগোলো অপর্ণা। অন্তরা গাড়িতে বসে অর্ণবের হাতে হাত রেখে বললো, "দ্বীপ জেলে যাই মুভিটা আজ বাড়ি গিয়ে দেখিস - ভালো লাগবে, মানুষ মানুষের জন্য চাইলে অনেক কিছু করতে পারে, আমরা বন্ধুর দুঃখে কাঁদি - আনন্দে ঈর্ষাকাতর হই - ডাক্তারি না পেলে সাইকোলজি পড়তে চাই।"

"তুই খুব উদার - আমি হয়তো তোর যোগ্য নই।"

"কে বললে? আমার বাবা মা তো তোকেই একমাত্র যোগ্য বলে ঠাওরেছে।"

অর্ণব আর কিছু না বলে অন্তরার হাতের ওপর মৃদু চাপ দিলো। কাল ক্যাথের ছোয়ায় দেহে যেমন ছ্যাঁক ছ্যাঁকে গরম স্রোত খেলছিল, তা অন্তরার ছোঁয়ায় নেই কেন? গাড়ির রেডিওতে সেই চেনা গানটাই বাজ্ছে, ভিজে ঠোঁট তোমার-তৃষ্ণার্ত মন আমার, তোমার দেহ আমার কাছে অমৃতের মতো লাগে - কিন্তু লাগছেনা। বরং কে যেন বুকের ওপর পাথর চেপে রেখেছে।
অন্তরা সারারাস্তা কতো মজার খুঁটি নাটি শোনালো কিন্তু বাইরেটাই হাসছে, ভেতরটা মুচড়ে উঠছে। অর্ণবের কাছে এটা সুস্পষ্ট হলো যে ক্যাথের বিরহ ব্যাথা সে আর যার সাথেই হোক অন্তরার সাথে ভাগাভাগি করতে পারবেনা। তাই পরের গানটা অর্ণবের মনের মতো হলো, আর গানের কথা গুলো মর্ম বিদারী ওকেই যেন জিজ্ঞেস করছে - কেন তুমি এতো হাসছো?
কি দুঃখ তোমার যা লুকোচ্ছ?
দেখতে দেখতে অর্ণবের বাড়ি এসে গেলো। অন্তরা টা টা দিয়ে বাড়ি চলে গেলো। অর্ণব গম্ভীর মুখে রাতে খাবেনা বলে ঘরে ঢুকে পড়লো। ক্লান্ত মন, ভারাক্রান্ত দেহে নিজেকে ছুড়ে দিলো বিছানায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সতেরো ঘন্টা একটানা বসে পা ধরে আসে। পায়ের তলার অংশটা তুলে বিছানার মতো বানিয়ে, এক সুন্দরী যুবতী দৈবিক হাসি হেসে নরম কম্বলটা গায়ে টেনে দিয়ে গেলো। জোর করে আদিত্য ওর জন্য ব্যবসায়িক শ্রেণীর টিকিট কেটেছিল, নইলে পা ছড়িয়ে এতো আরামে বসা যেত না। বেশ আমোদে গান শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে নিলো ঘন্টা দুই। আড়াই খানা জানালা নিয়ে একখানা বসার জায়গা। সবাই মাথা নিচু করে এমন ভাব করছে যে ও যেন কোনো দেশের মহারানী।
বিমান গৃহস্তীরা হাটু গেড়ে বসে এতো খাতির যত্ন করছে - যেন এ এক অনন্য অভিজ্ঞতা - মনের ডায়েরিতে লিপিবদ্ধ করার মতন। আগেও সে বিমানে চেপেছে কিন্তু স্মরণীয় হয়ে থাকার মতো কিছু নয়। এ যেন রাজসিক ব্যবস্থা। খাবার আগে গলায় সাদা রুমালটা পর্যন্ত বেঁধে দিয়ে যাচ্ছে ।
তিন দফা আলাদা খাবার তালিকা থেকে তিন ধরণের ভিন্ন স্বাদের খাদ্য দ্রব্য-নিজের পছন্দ মতো যেটাই খুশি সেটাই দেবে। সাজানো গোছানো সুসজ্জিত খাবারের ডালি দেখেই অর্ধেক পেট ভরে গেলো ওর। প্রতি ঘন্টায় একবার করে সুমিষ্ট ফল পাকড়ের ভান্ডার সাজিয়ে আনছে।
এতো দামি মাদকদ্রব্য পরিবেশনে বেজায় খুশি অপর্ণা। তবে শূন্যে ভাসমান অবস্থায়, শারীরিক ভারসাম্য টালমাটাল করে, আর এহেনো ভিন্ন অভিজ্ঞতায় মাদক দ্রব্যাদি সেবনের ইচ্ছে টুকুর উদ্রেকটিও কোথায় যেন গুটিয়ে যায় ভয়ে। "যদি দেহ নিতে না পারে - পাশে উর্ধচাপে বেরিয়ে আসে?"

তার চেয়ে চেনা পানীয় যা জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে সবজাগায় সমান চলে সেই চা খাবে ভাবলো। খুব দামি দার্জিলিং চা সে নিজেও বানায় কিন্তু এ যেন কেউ তার কাপে সদ্য চা বাগানের দুটি পাতা একটি কুড়ি ফেলে দিয়ে গেলো। ঠোঁট বন্ধ করে পঞ্চেন্দ্রিয় এক করলেও তার পুরো গন্ধ আস্বাদন সম্ভবপর নয় বলে মনে হলো।

"স্বর্গের সুধা, মর্তের চা, যে না খেয়েছে, বেহস্তে যা - গিয়ে সেথা কর কা' কা।"

মনে মনে ছড়াটা বলে নিজেই হেসে উঠলো অবচেতনে। আকাশের গায়ে ভারী মায়াবী জোছনার ছটা। অলস সূর্য এখনো ঘুমোচ্ছে নিশ্চিন্তে। মেঘেদের কি প্রবল দাপাদাপি - কখনো দানব রূপী আবার কখনো বা বহু পুরোনো ইতিহাসের কোনো রেনেসাঁসের প্রেক্ষাপটে আঁকা এক অন্য পৃথিবী। ঠান্ডা জলবিন্দু ধূলিকণার সাথে প্রতিশ্রুতি বদ্ধ - সম্পূর্ণ যৌবন আমৃত্যু কাটানোর সুদৃঢ় অভিশ্রুতি। প্রাণ নিঃশেষের সাথে সম্পর্কের সমাপ্তি।
কি অটুট এই বন্ধন - সাত পাকে মানুষ ঘুরছে দাম্পত্যের বিনি সুতোর গাঁথা মালার পুঁতিতে,
একই ছন্দে পৃথিবী আর চাঁদ দম্পতি রূপে যেমন আবর্তনে রত অগ্নিদেব সূর্যের চারিপাশে। সাত পাকে সাত জন্মের প্রতিশ্রুতি বদ্ধ হয় তারা। মহাকাশে জন্ম জন্মান্তরের সম্পর্ক আটক পরে তারামণ্ডলীর সংসারে।

পৃথিবীর জমিতেই শুধু অবিনশ্বর বলে কিছু হয়না। সবই নশ্বর।

আজ আদিত্যর প্রতি যে আকর্ষণী শক্তি, সংসার-স্বামী-সমাজ সব ধুলিসাৎ করে টেনে নিয়ে যাচ্ছে তাও কি ক্ষণস্থায়ী নয়?

ধীরে ধীরে জোছনার বেড়াজাল কাটিয়ে অর্ক প্রভার রক্তিম কিরণ ছটায় মেয়দূতেদের ভিন্ন রূপ উঁকি দিলো। আত্মারা বোধহয় মরার পরে এখানেই বসতি গড়ে। শত শত মৃত মানুষের জীবন্ত সত্তা সেখানে অবারিত চলাচলে ব্যস্ত। কেউ বোঝেনা ওরা মৃত্যুর পর কত সুখে সুখী।

রোমিও জুলিয়েট এখানে অনন্ত প্রেমের উপন্যাস লিখছে বসে মেঘেদের নিবিড় ছত্র ছায়ায়। অপর্ণাও যদি আদিত্যর সাথে এই মেঘপুরিতেই কোথাও ঘর বসাতো যেখানে বৈধ আর অবৈধর লড়াইকে আঙ্গুল তুলে কেউ কটাক্ষ করত না।

দুপুর গড়িয়ে-বিকেল-আর বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হলো। গুমগুমি উড়ানের আওয়াজ। উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরের গভীর কালো সমুদ্ররাশি মুখ বুজে কত যুগের উত্থান পতনের কাহিনী বুক ভরে নিয়ে বয়ে চলেছে হাওয়ার স্রোতে। জাহাজ ভরা রুপোলি খাজনার পেটি ভড়ে জেলেরা বাড়ি ফিরতে ব্যস্ত। সদ্য বিবাহিতা রমণীর সিঁথির সিঁদুরের মতো চওড়া রাস্তা। আলোয় আলোকময় করে জমজমাট মহানগরীর অভুত্থান।

বিমানচালকের শব্দ তরঙ্গ কর্ণ কুহরে প্রবেশের আগেই ফসকে বেরিয়ে গেলো। নিঃসন্দেহে এটা তার চেনা ভাষা কিন্তু জিভের পাকানোর ভঙ্গিমা সম্পুর্ন্য ভিন্ন যা - সে বুঝবেনা।

মনে মনে লজ্জা পেলো। পরের বারেরটা মন প্রাণ এক করে শুনলো - বোধগোম্য হলো যে সে খুব শীঘ্রই পৌঁছবে আদিত্যর কাছে।

এক সুপুরুষ এসে সযত্নে তার বিছানাটা পূর্বের অবথায় ফিরিয়ে দিয়ে, কোমরবন্ধনীটি আজ্ঞা বাহি দাসের মতো সুনিপুণ হাতে পরিয়ে দিয়ে গেলো। শরীর মনে, চোখ বন্ধ করে নেমেই আদিত্যকে জড়িয়ে একটা আলতো চুম্বন দেবার পরিকল্পনা চলতে লাগলো হৃদিকন্দরে ।

তৃতীয় অধ্যায়

কানসাসে পৌঁছে বিমানবন্দরের বাইরে অপর্ণার নামের ব্যানার হাতে এক মধ্য ইউরোপিয়ান চেহারার মাঝ বয়েসী লোক দাঁড়িয়ে।

অপর্ণার দুটো চোখ তাও বিশ্বাস করতে পারছে না আদিত্য নিজে আসেনি। ফোনের পর ফোন এসেছে আদিত্যর।

ফোনটা জেগে উঠেই কণ্ঠ চিঠির ডালা খুলে বলে দিলো অপর্ণাকে, "আমি মিটিং এ ফেঁসে গেছি, এলান তোমায় আমার বাড়ি পৌঁছে দেবে, ডোর বেলের ঠিকপাশে যে দশাশয়ী ড্রাগনের মুখটা আছে তার মাথায় তিন বার হাত বোলালেই পেটের ভেতর থেকে চাবিটা বেরিয়ে যাবে। ঢুকে সিকিউরিটি এলার্ম ৫৮৫৮৩ টিপে বন্ধ কোরো ফ্রিজ থেকে ড্রিংক নিয়ে খেও আমি তার মধ্যে এসে যাবো প্লিজ প্লিজ -মেক ইয়োরসেল্ফ কম্ফোর্টেবল - খুব ভালোবাসি তোমায়।"

অপর্ণা দেখলো ওর নামের বোর্ডের পাশে লোকটার পকেটের ওপর বড়ো বড়ো করে নামলেখা, "এলান তোফাস"।

অপর্ণা লোকটাকে হ্যালো বলতেই, এলান হাসি মুখে ওর ব্যাগ গুলো গাড়িতে তুলে, খুব যত্ন করে ওকে বাড়ির দরজায় পৌঁছে, ব্যাগগুলো দরজার পাশে নামিয়ে বললো, "ডন'ট বদর এবাউট দোষ লাগেজ, আই ইউল কম ব্যাক ইউথ বস সুন্, দেয়ার ইস সিকিউরিটি আউটসাইড, নো ওয়ান ক্যান্ট এন্টার ইন উইদাউট ডিস্ রিমোট" - বলে বিদায় জানিয়ে হুশ করে চলে গেলো।

আমেরিকার ঝিঝিপোকা গুলো একই রকম ডাকে, কলকাতার মতোই। একটা ব্যাঙ ফোয়ারা থেকে লাফিয়ে ওকে "সুস্বাগতম" বললো। ড্রাগনটাকে আদর করতেই পেটের ভেতর থেকে চাবিটা বমি করে দিলো, ঘরের ভিতর দুরু দুরু বুকে পা দিতেই সিকিউরিটি এলার্মটা কোড নাম্বার চাইতে লাগলো, আদিত্যর কথা মতো ওটার মুখ বন্ধ করে ভেতরে ঢুকলো।

এটাকে বাড়ি না বলে প্রাসাদ বলা যায়। পেছনে সুইমিং পুলের ছলাৎ ছলাৎ আওয়াজ। নীল আলোয় মোড়া সারা বাগান। ফোয়ারার জলের কুলু কুলু। পিয়ানোর সামনে, একটা গানের পাতায় চোখ গেলো। ওয়েস্টার্ন নোটেশন-চোখে দেখে-হাতে সুর তুলতেই -বেজে উঠলো চেনা সুর-

"এই মনিহার আমার-নাহি সাজে"। নিজের কানকেই বিশ্বাস হচ্ছিলো না। মনে মনে আদিত্যর রুচির প্রশংসা না করে পারলো না। বিরাট বড়ো বসার ও খাওয়ার জায়গাটা রান্না ঘরের একপাশে আলো ঠিকরে পড়ছে কাঁচের মদের বোতল গুলো থেকে। কি মিষ্টি এক গন্ধ ঘরের আনাচে কানাচে, সারা দেহ মন শীতল করে দিচ্ছে অপর্ণার।

দরজার ব্যাগ গুলো টেনে ভেতরে এনে, রাতের জামা কাপড় আর বিজনেস ক্লাসে দেয়া বাথরুম পাউচটা বের করে চান করে নিলো। বেশ ফুরফুরে লাগছে এখন। ঘরের হিটারটা বেশ গরমের দিকে করা তাই গায়ে চাদর দিতে হলোনা।

গেটে আলো দেখা যেতেই এগিয়ে গেলো, আদিত্য নীলচে কালো রঙের সুট পরে নামলো। এলান ইঞ্জিন চালু রেখে, ব্যাগ গুলো ওপরে তুলে দিলো। হেড লাইটের আলোয় কিছুতে সই করে দিলো আদিত্য। এলান নিচে এসে ওকে গুডনাইট বলে, কাল আদিত্যকে দেখা হবে বলে গাড়ি নিয়ে চলে গেলো। আদিত্য এসে কোনো কথা না বলেই অপর্ণাকে বুকে জড়িয়ে গালে আলতো চুমু দিয়ে, হাতে গোলাপের বড়ো একটা তোড়া দিয়ে বললো, "অয়েল কাম টু কানসাস-আশাকরি তোমার যাত্রা নির্বিঘ্নে হয়েছে।"

অপর্ণা মুখ খোলার আগেই বললো - "তোমার চুল ভিজে? ঠান্ডা লাগবে তো, ড্রাই করে নাও, ড্রায়ার কাঁচের পেছনেই তো ছিল, আমি ডিনার সাজাচ্ছি।"

অপর্ণা চুল ড্রাই করতে চলে গেলো, ফিরে এসে অবাক - মেহগুনি কাঠের টেবিলের ওপর মোমবাতি জ্বালিয়ে গরম গরম ভাত আর স্টিমড স্যামন পরিবেশন সাড়া।
"কখন বানালে এতসব?"

"আজ সকাল দশটা থেকে টিম মিটিং ছিল, আমি সকালে জিম করতে করতে পোস্ত দই এর সাথে বাকি মশলা মিশিয়ে রাইস কুকারের মিডল পটে মাছ দিয়ে, একসাথেই দুটো রেডি করে রেখে চলে গেছিলাম। তুমি এতটা বড়ো জার্নি করে আসবে, তাই নো সরষে বাটা, এতে একটু মাস্টার্ড দিলে অওসাম টেস্ট এনহ্যান্স করতো।"

"তুমি এতো ভালো রান্না শিখলে কি করে?"

"আই ওয়াস গুড ইন ম্যাথ এন্ড কুকিং ইস এ কম্বিনেশন অফ ম্যাথস এন্ড কেমিস্ট্রি - মাই স্ট্রেস রিলিভারও বলতে পারো - এর মতো ক্রিয়েটিভ জায়গা আর হয়না - এই ঠিক করে খাও।"

"কুকিং কি করে স্ট্রেস রিলিফ করে, একটু বলো শুনি!"

"ফুল ডিভোশন দিয়ে কিছু করাই তো মেডিটেশন - আর তাই তোমার স্ট্রেস কমাবে, কাল সকালে তোমার জেট ল্যাগ থাকলে ঘুমিয়ে নিয়ে, আমি ঠিক বিকেল ৪টা নাগাদ এলানকে পাঠিয়ে তোমায় নিয়ে এয়ারপোর্টে যাবো, কানসাস শহরটা চার্টার্ড প্লেনে ঘুরে দেখাবো, ফাইভ সিটার, বিট রকি, - চিন্তা নেই সিক ব্যাগ থাকবে - তুমি বললে হেলিকপ্টারও এনাদার অপশন করা যেতে পারে হোয়াটেভার ইস ইয়োর উইশ, উইথ ওনার - এট ইয়োর সার্ভিস। পরশু ভোরে আমরা হট এয়ার বেলুন চড়বো, পরশু উইন্ডি নয়, তুমি লাকি - এই দিনের জন্য আমি তিনমাস আগে থেকে ডেট নিয়ে রেখেছি।"

"তুমি জানতে আমি আসবই?"

"আমার ভালোবাসায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল - ফ্রম দা ভেরি ফাস্ট ডে।"

চোখের নিমেষে সব বাসন কোসন ঢুকে গেলো ডিশ ওয়াসারে। টেবিল ঝকঝকে তকতকে করে অপর্ণার কোমরে আদিত্য এক হাত দিয়ে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেলো ওরা। ওপরে চারটে বেড রুম, দুটো বাথরুম, আর মধ্যে থিয়েটার হল। চামড়ার দুই সারি, মোট আটজন লোকের শুয়ে বসে আরামে সিনেমা দেখার ব্যবস্থা করা আছে ওখানে।

বুকটা শামুকের খোলসে গুটিয়ে আছে। বৈধ আর অবৈধর দ্বন্দে জেরবার মন। আদিত্য কি ওর সাথে শোবার পরিকল্পনা করে রেখেছে? অপর্ণার সব ব্যাগ ওপরে ঢুকেছে গেস্ট রুমে,
ওটাকে দেখিয়ে দিয়ে বললো, "যদি চাও - যেদিন চাও - দরজা খোলা থাকবে রাতে, আসতে পারো - আমি ফ্রি বার্ড, তুমি খাঁচার পাখি, তবু আমার নিষেধ তোমার কাছে

যাওয়া - তোমাকে শেখাবো উড়ে আমার কাছে আসা - নো প্রেশার - তোমার জন্য আমার অবারিত দ্বার
গুডনাইট।"

ঠোঁটের ওপর আলতো ছুঁয়ে চলে যাচ্ছিলো আদিত্য, অপর্ণা হাত টেনে ধরে বুকে মুখ গুঁজে বেশ কিছুক্ষন সেখানে দাঁড়িয়ে, নিঃশ্বাসে বুকভরে আদিত্যর গায়ের গন্ধ নিয়ে, সারা গায়ে তার ছোঁয়া লেপে শুভ রাত্রি জানালো তাকে।

চতুর্থ অধ্যায়

পরের দিন সকালে আদিত্য দরজায় টোকা দিলো কিন্তু অপর্ণা গভীর ঘুমে আছন্ন দেখে একাই বেরিয়ে গেলো। অপর্ণা বেশ রাত পর্যন্ত মেয়ের সাথে গল্প করে শেষ রাতে চোখ বুজিয়েছে বলে, এখন দরজায় টোকাটা ঠাহর করে পারলোনা।

আদিত্য বেশ কয়েকটা মেসেজ উড়িয়ে দিলো অপর্ণার ফোনে, ঠিক চারটে নাগাদ ওকে তৈরী থাকতে বললো, ক্যামেরা নিয়ে - হেলিকপ্টারেই ছবি ভালো উঠবে বলে, শেষে ওটাই পাকাপাকি বন্দোবস্ত করে নিলো।

আদিত্যর আসল উদ্দেশ্য ওর কোম্পানি বাড়িটার একটা নতুন ভালো ছবি তুলে আরো ভালো ভাবে লোককে জানানো তাদের ভবিষ্যতের গতিবিধি।

অপর্ণার বেলা বারোটা নাগাদ ঘুম ভাঙলো। নিচে গিয়ে টেবিলে স্টিমড ভেজি আর দুটো সসেজ রোল ঢাকা দেখল, পাশে চিঠি - "চিকেন সসেজ - জাত যাবে না খেলে" পাশে জিভ বেরকরা একটা হাস্যকর কার্টুন।

অপর্ণা খেয়ে ওপরে উঠে ব্যাগ থেকে প্রয়োজনীয় কিছু জিনিস বের করে দেরাজে রাখলো। রোদ ঝলমলে একটা সুন্দর দিন। ক্যামেরার লেন্স গুলো মুছে, লাগিয়ে নিয়ে পটাপট কিছু ছবি তুলে ফেললো বাড়িটার।

একটা বড়ো তালা ঝুলছে তিনতলার একটা দরজায়। পাশে ছোট্ট একটা ছাদ। শহরটিকে খুব ভালো দেখা যাচ্ছে এখান থেকে। খুব অদ্ভুত একটা অনুভূতি হলো এই জায়গাটায়। কেউ যেন চিৎকার করে দরজাটায় ওপাশ থেকে ধাক্কা দিচ্ছে। একটু ঝোড়ো হাওয়া বইছে। গোঁ গোঁ করে বাড়িময় কার যেন গোঙানি। অপর্ণার এই ভর দুপুরেই গা ছমছম করছে।

এমন সময় ফোনটা কেঁপে উঠলো, অপর্ণার খুব ইচ্ছে করছিলো ওই বন্ধ ঘরটার কথা জিজ্ঞেস করে ওকে কিন্তু করতে পারলো না। শুধু ও ঠিক আছে কিনা বিকেল চারটে নাগাদ ক্যামেরা নিয়ে বেরোতে পারবে কিনা আর রাতে নৈশ্য ভোজে ও নিমন্ত্রিত - এই কথা গুলো জানিয়ে ফোন রেখে দিলো।

অপর্ণা বুঝলো আদিত্যর পর পর মিটিং আছে কাজেই দম ফেলার সময় নেই। শুধু ধন্দ একটাই বিকেলে যে পোশাকে যাবে তা রাতেও কি মানাবে? লোলুপ চোখে পুলের দিকে তাকিয়ে খুব সাঁতার কাটতে ইচ্ছে করলো ওর, কাছে গিয়ে জলে হাত দিয়ে দেখলো ঠান্ডা, দেয়ালের পাশে একটা বোতাম আছে, বুঝলো ওটা টিপলে গরম হয়। সময় নষ্ট না করে চটপট চান সেরে শাড়িটা এমন পড়লো যা রাতেও চলে যাবে, শুধু গলার একটা ভারী গহনা নিলো যেটা রাতে ডিনারে ঢোকার মুখে পরে নেবে। সব হয়ে গেলে আদিত্যর যে কাজে ও এসেছে এখানে তার কাগজ গুলোয় একটু চোখ বোলাতে লাগলো।

আদিত্য ঠিক চারটেতে পৌঁছে গাড়ির মধ্যেই বসে রইলো। অপর্ণাকে ওর ড্রাইভার দরজা খুলে ঢুকিয়ে নিলো। অপর্ণার পেছনে বাড়ির দরজা নিজের থেকেই বন্ধ হয়ে, সিকিউরিটি অ্যালার্ম বেজে উঠে জানান দিলো সেটা।

আদিত্য আর অপর্ণা কেজো আলোচনায় ডুব দিলো। হেলিকপ্টারে এই প্রথম অপর্ণার। কানে হেড ফোন লাগিয়ে পাইলটের পেছনে সে বসলো। বিমান চালকের সহকর্মীর জায়গায় আগেথেকেই আদিত্যর এক সহকর্মী বসছিলো কিছু জরুরি কাজের তালিকা নিয়ে। আদিত্য অপর্ণাকে বলে দিলো যত খুশি ছবি তুলতে।

অপর্ণা এক মনে লেন্স এ চোখ রেখে অর্জুনের মতো মাছের চোখ খুঁজতে লাগলো। স্বর্গের মতো কানসাস শহরকে সাজানো গোছানো অবস্থায় একের পর এক ক্যামেরা বন্দি করতে লাগলো সে।

আদিত্য কিছু কিছু জায়গায় একটু দাঁড়িয়ে বেশি মন দিয়ে দেখাতে লাগলো তাকে। সূর্যাস্ত দেখতে এতো মনোরম হয় আগে উপলব্ধি হয়নি তার। সন্ধের আগেই নেমে গেলো তারা।

টিম ডিনারে যাবার আগে আদিত্য অপর্ণাকে একটু সময় দিলো প্রসাধনের জন্য। ব্যাগের থেকে গলার ভারী হারটা পরে সরষে রঙা ওভার কোটটা চাপিয়ে চোখে আই শ্যাডো ডোলে ঠোঁট রাঙিয়ে যখন আদিত্যর সামনে

গেলো,ও আর কোনো কথা না বলে কিছুক্ষন তাকিয়েই রইলো।
"কে বলে তুমি আমার থেকে দশ বছরের বড়ো ?আমি তো তোমার পাশে মানাচ্ছিনা এখন।"

অপর্ণা মৃদু হাসলো। অপর্ণাকে নিয়ে ঢুকতেই সবাই হৈ হৈ করে অভ্যর্থনা জানালো। অপর্ণা অপ্রস্তুত হলো, ওকে আদিত্য যেমন বলেছিলো তেমন ডিনার মোটেই নয় এটা, বরং ওকে সবাইকে দেখানোটাই আদিত্যর মূল উদ্দেশ্য। খুব কাছ থেকে অপর্ণা যেটা বুঝলো, আদিত্যর জীবনে সুন্দরী মেয়ের ঘনঘটার কোনো কমতি নেই, তাহলে ওর মতো মাঝবয়েসী, মধ্যবিত্ত বাঙালি বধূর প্রেমে পড়ার কারণ কি? তা বোধগম্য হলোনা অপর্ণার।
চূড়ান্ত মাদকতায় মোড়া এখানকার প্রতিটি কোণ। হুকার ধোয়া ডিজের শরীর দোলানো উদ্দাম সঙ্গীত রস। সব কিছুর মধ্যে আদিত্যকে খুব পেতে ইচ্ছে করছিলো। কিন্তু আদিত্যকে সুন্দরী মেয়ে ঘিরে যে লাস্য নৃত্য শুরু করেছে তাতে আদিত্যও কিছু কম যায় না। বরং সে বেশ দক্ষ এই মেয়ে ভোলানোতে, সেটা অপর্ণার বুঝতে দেরি হলোনা।
আদিত্য অপর্ণার মৌনতা দেখে, বেরিয়ে এসে বললো, "বাড়ি যাবে? জেট ল্যাগ আসছে না?"

আদিত্য এক কথায় অপর্ণাকে নিয়ে বেরিয়ে এলো ওখান থেকে। গাড়িতে বসে আদিত্যকে সে জিজ্ঞেস করলো, "এতো সুন্দরী প্রেমিকাদের ছেড়ে তুমি আমাকে বিয়ে করার কথা কেন ভাবছো?"

আদিত্য বেশ মাদকরসে বুঁদ হয়ে থাকা একটা হাসি হেসে বললো, "তুমি কি বাড়িতে একটা তালা দেয়া ঘর লক্ষ্য করেছো?"

অপর্ণা মাথা নাড়লো। "চলো! আজ বলবো তোমায় কেন আমি তোমাকে আমার অর্ধাঙ্গিনী রূপে কামনা করি?"

গাড়ি থেকে নেমে ক্যামেরার ব্যাগটা হাতে নিয়ে নামলো অপর্ণা। আদিত্যর জিনিস সে নিজে নিয়ে আরেক হাতে অপর্ণার কাঁধে দিয়ে ঘরের সিকিউরিটি বন্ধ করে জিনিস পত্র বসার ঘরেই রাখতে বলে,দেরাজ থেকে চাবি নিয়ে ওপরের নিয়ে এলো অপর্ণাকে, সেই তালা খুলতে বহুদিনের পুরোনো গন্ধ নাকে এলো। চমকে উঠলো অপর্ণা - অবিকল তার চেহারা, তার মতোই রুচির সাজগোজ, সম্পূর্ণ তার আদলে গড়া - আদিত্যর মা।
সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো অপর্ণার।
"আমি যখন সতেরো - কার একসিডেন্ট এ বাবা মা দুজনেই মারা যান। আমি ওদের দুজনের সব স্মৃতি এই ঘরে ঢুকিয়ে তালা বন্ধ করি। একাকীত্ব যে কতটা নিষ্ঠুর হয় তা আমি ছাড়া কেউ জানে না বোধহয়। কিন্তু এটা ভুলিনি আমাকে মানুষ হতে হবে, আরো বেশি করে নিজেকে ছুঁড়ে দিয়েছিলাম পড়াশুনার মধ্যে, এম আই টি তে ভর্তি হওয়ার পর নতুন নেশায় পেলো আমায়, মেয়েরা কেন আমায় পছন্দ করে জানিনা - কিন্তু সব সম্পর্কই শেষে গড়াতো বিছানায়। সবার সাথেই যোগাযোগ আছে- তারা সবাই জীবনে প্রতিষ্ঠিত, কেউ কেউ অপেক্ষায় বসেও আছে, কিন্তু তাদের কাউকে আমার জীবনের ওপর কর্তৃত্ব করতে দিতে পারবোনা। একমাত্র তোমাকে আমি সেই ভার দিতে চাই। তুমি যবে হ্যা বলবে তবে ই হবে আমার বিয়ে, তোমার শাড়ির আঁচলে আমি নিজেকে বাঁধতে চাই - আমি ভীষণ সাবলম্বী আমার জন্য কোনোদিন কিচ্ছু করতে হবেনা তোমায়, শুধু যে দেশেই থাকো তোমাকে আমি আমার স্ত্রীর আসনে বসাতে চাই।"

অপর্ণার দুই চোখ বেয়ে জল বেরিয়ে এলো।

আদিত্য দরজাটা খুলেই সবার ঘরে জুতো জামা পরেই শুয়ে পড়লো। অপর্ণা ওর ঘরে ঢুকে ওর জুতো খুলিয়ে, ঠিক করে শুইয়ে ওর গায়ে চাদর টেনে চলে যাবার সময় আদিত্য আঁচল ধরে টানলো, অপর্ণাও আজ একটু ড্রাঙ্ক, আর মন থেকে আদিত্যকে ভীষণ ভালোবাসতে ইচ্ছে হচ্ছিলো, তাই বাঁধা না দিয়ে ওর পাশেই শুয়ে পড়লো। আদিত্য ওর বুকের মধ্যে মাথা গুঁজে নিষ্পাপ শিশুর মতো শান্তিতে বহু বছর পর আজ যেন একটা সম্পূর্ণ ঘুম ঘুমালো।

পঞ্চম অধ্যায়

আদিত্যর সাথে অপর্ণার যে কি ধরণের সম্পর্ক গড়ে উঠছিলো তা বিশ্লেষণের অঙ্কটা দিনে দিনে জটিল থেকে জটিলতর হতে লাগলো। তবে এই সাতদিনে আদিত্য যে

অপর্ণার ভীষণ কাছের কেউ হয়ে উঠেছিল সেটা বলাই বাহুল্য। ওরা এই সাতদিনে সাতবছরকে যেন দেখে ফেললো এক সাথে। পাহাড়ে চড়া, উড়ন্ত ডানার ভরে উড়ে যাওয়া, বেলুনে চেপে সূর্যোদয়ের মজা নেওয়া, কিংবা চল্লিশ তলা বাড়ির ওপর থেকে ঝাঁপ দেওয়া - সব রকমের রোমহর্ষক কাজ কর্ম করে যেদিন অপর্ণার শেষ রাতের ফ্লাইট ধরার দিনটা এলো সেদিন ওরা অলস ভাবে সারাক্ষণ গল্প করে কাটালো।

অপর্ণা একটা জিনিস উপলব্ধি করলো মানুষ সে যেখানেই বড়ো হয়ে উঠুক ভেতরের মনটা সবার একইরকম নিষ্পাপ শিশুর মতো কোমল থাকে। বাইরের ঘাঁই গুঁতো খেয়ে শুধু ওপরটাই পরিবর্তিত হয়। ভেতরের কেমিস্ট্রিটা সবার একই সংজ্ঞায় বাঁধা।

আজ দুপুরে অপর্ণা রান্না করেছিলো। দুজনে খেয়ে দেয়ে অলস দুপুরে সোফায় বসে ফটো এডিট করছে। পড়ন্ত বেলার রোদে ভিজে দুজন দুজনের খুব কাছাকাছি বসে একে অপরের গায়ের গন্ধ অনুভব করছিলো।

আদিত্য একটা লাল কাগজে রোল করা ফিতে বাধা বস্তু অপর্ণার হাতে ধরিয়ে বললো, "এটা তোমার উপহার।"

অপর্ণা খুলে ভেতরে দেখলো, দিল্লির দ্বারকা নামের একটা জায়গার আড়াই হাজার বর্গ ফুটের একটি ফ্ল্যাটের পাওয়ার অফ এটর্নির কাগজ পত্র।

"প্লিজ সই করে দাও।"

"কেন করছো এসব?"

"আমি মন থেকে তোমার হয়েছি তাই।"

অপর্ণা আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলোনা। এমনিতেই খুব মন খারাপ লাগছিলো আদিত্যকে ছেড়ে যেতে, কিন্তু এই ভাবে সম্পূর্ণটা ওর কাছে উজাড় করে দেবে তা নিজের কতকটা অজান্তেই হয়ে গেলো।

সব শেষ হয়ে গেলো। মধ্যবিত্ত মানুষিকতার বেড়াজাল ভেঙে চুর চুর করে দিলো আদিত্য। যতনে পড়া বহুদিনের পুরোনো সতীত্বের সোনালী মুকুট ভেঙে দুখান হয়ে গড়াচ্ছে মাটিতে। সমাজ সংস্কার এর তাসের ঘর বিনা ধাক্কায় ধুলিসাৎ ।

অপর্ণার বুক ছেড়ে কান্না পাচ্ছিল। কি ভাবে এই ভুল সে করলো?

"চোখে জল কেন তোমার? তুমি তো স্বেচ্ছায় এলে!"

অপর্ণা আলুথালু শাড়ি ঠিক করছিলো গম্ভীর ভাবে।

"তুমি দিল্লিতে কবে আসবে?"

"অন্তরার পরীক্ষার পর।"

"আমরা আজ লিখিত পড়িত স্বামী স্ত্রী হলাম - দেহ ও মন দুটোই যখন একই সুরে বাঁধা পরেছে, তখন তুমি তা অস্বীকার করবে কোন জোরে?"

অপর্ণা উঠে যাচ্ছিলো আদিত্য আরেকবার ওকে বুকে টেনে নিলো, আর এবার কোনো বাধা দেবার পর্যাপ্ত শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে অপর্ণার - বহু পূর্বেই।

দুজন দুজনের সাথে ঠিক কতটা সময় কাটালো তার হিসেব নেই ওদের - তবে সারাজীবনও বোধহয় কম পড়বে, কিন্তু এই ভালোবাসা ফুরোবে না - এমন মনে হলো ওদের।

এ যেন নতুন করে এক রামধনু রঙের সিঁদুর আদিত্য লাগিয়ে দিলো ওর সিঁথিতে।

"আমি তোমার মতের বিরুদ্ধে কিছুই চাইবোনা কোনোদিন - শুধু আমি তোমার মধ্যে বিলীন হয়েই থাকতে চাই।"

অপর্ণা এক বড়ো দীর্ঘশ্বাস ফেললো। সূর্য ডুবে গেছে, ঝিঝি পোকার গান, সুইমিং পুলের কুলু কুলু, পেছনের ঝর্ণার মৃদু জলতরঙ্গ - এক আবেশে ঢাকলো সেই সন্ধ্যাকে।

আদিত্য ঘরের সব আলো জ্বালিয়ে দিলো। অপর্ণার ফ্লাইটের বোর্ডিং করে দিলো অনলাইনে। এই ফাঁকে অপর্ণা হান্ডি পুলাউ বানিয়ে চটপট ডিনার করে নিলো দুজনে। আদিত্যর অভ্যেস খাবার সাথে ওয়াইন খাওয়া কিন্তু অপর্ণার আজ রাতের ফ্লাইট ধরবে বলে, সে ওসব খেলো না।

সমস্ত ব্যাগ নিচের দরজার সামনে এনে গুছিয়ে রাখলো আদিত্য। অপর্ণার দিকে তাকিয়ে বললো - "চলো আমরা ওপরে গিয়ে একবার তোমায় সবাইকে দেখিয়ে আনি "
অপর্ণার হাত ধরে তড়িঘড়ি নিয়ে গেলো সেই তালা বন্ধ ঘরে, চাবিটা কদিন তালাতেই ঝুলেছে। এই কদিন আর অপর্ণা কোনো চিৎকার শোনেনি ও বদ্ধ ঘরের ভিতর থেকে।
সবার মুখ থেকে সাদা চাদর সরিয়ে দিয়ে একে একে সাক্ষাৎ পর্ব চলতে লাগলো, আদিত্যর বাবা মা সমেত ওদের পুরো পরিবারের ছবি অপর্ণা দেখলো এবং এখনো ওর কিছু আত্মীয়রা মুর্শিদাবাদে থাকেন, এবার গেলে অপর্ণাকে নিয়ে যাবে ঠিক হলো।
দেখতে দেখতে বারোটা বাজে ঘড়িতে। গল্পে ব্যস্ত এতই যে কখন সময় চলে গেছে খেয়াল করতে পারেনি ওরা। শেষ বিদায়ের আগে মনটা ভারী হয়ে আসে। অপর্ণা শাড়ি পরে নিতে নিজের ঘরে ঢুকলো। দরজা একবার যখন খুলেই গেছে তখন আর বন্ধ করার মানেই হয়না। আদিত্য দরজার বাইরে থেকে কামাতুর চোখে এক এক করে শাড়ির একটু একটু করে সম্পূর্ণ দেহকে আবৃত করার পটুতা খুব যত্নের সাথে পর্যবেক্ষণ করছিলো।
কামাতুর দুই চোখের প্রতিফলন আয়নায় দেখে শিউরে উঠলো অপর্ণার সর্বাঙ্গ। আদিত্য খুব কাছে এসে ওর হাতের নোখগুলোর ওপর হাত বুলিয়ে বললো, "আমার মায়ের হাতেও এরম নখের নেল পালিশে আঙ্গুল ছোঁয়াতাম - আর পিছলে যেত আমার আঙ্গুল! মার শাড়ি পড়া দেখেও ভাবতাম বিদেশের যেকোনো মেয়ে আমার মায়ের পোশাক দেখে ঈর্ষা করবে - আমি নিশ্চিত। আজ তোমাকে বলছি - সাবধানে যেও - তুমি আমার সাত রাজার ধন -যক্ষের ধনের মতো নিজেকে সামলে রেখো, তোমার এই গরিব প্রেমিকটির যে ধন আজ সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে, পাড়ি দিতে যাচ্ছে - তা হারালে সে নিঃস্ব।"

খুব গভীর এক চুমু দিয়ে বললো, "হ্যাপি জার্নি - অপর্ণা "

পর্ব ১১

অন্তিম অধ্যায়

চেনা দুঃখ চেনা সুখের শহর কলকাতা। অপর্ণা কলকাতা বিমানবন্দরে পা দেয়া মাত্র চেনা হাওয়ার বারুদে বুকের কলিজায় একটা মশাল জ্বলে উঠলো। কানসাসে সে তার নিজের সর্বস্ব খুইয়েছে নিজের অনুমতিতে। খালি মন, ভারী দেহ - ঢুকতে ঘরে হোঁচট খেলো ঘরের চৌকাঠে। কেমন যেন তিরস্কারের বক্র আঁখি কটাক্ষ দেখাচ্ছে তাকে। ঘরে ঢুকতেই অন্তরা জড়িয়ে ধরলো – আহ্লাদে আদুরে গলায় বললো, "উই মিসড ইউ আ লট, আর যেয়োনা আমায় ছেড়ে, আমি এখনো ছোটো আছি, তোমাকে ছাড়া খালি লাগে এই বাড়ি।"

কৌশিকও সুরে সুর মেলালো, "একদম! আমিও একমত।"

কল্যাণী বেরিয়ে এলো। অপর্ণা কাঁপা হাতে পা ছুঁয়ে প্রণাম করে মনে মনে বললো - "পারলে ক্ষমা কোরো আমায়।"
কল্যাণী মাথায় সযত্নে হাত বুলিয়ে থুতনিতে হাত দিয়ে চুমু খেলো, বললো - “সম্বিদ্ধি হোক মা।"

অপর্ণার এহেনো অভ্যর্থনা পেয়ে মন কানায় কানায় ভোরে উঠলো। সবার জন্য আলাদা আলাদা উপহার এনেছে সে, সেগুলো বের করতে করতেই গোপালের মা এসে হাজির।
"বৌদিমনি গো তুমি ছিলেনাই, ঘরটাতে ঢুকা যাচ্ছিলো না। তুমি একেনেই ফটক তুলো বাপু, আর এদেশ উদেশ করে কাম নাই।"

গোপালের মায়ের জন্য একটা লাল রঙা সোয়েটার এনেছে অপর্ণা, ওর খুব অল্প বয়েসে গোপালের বাবা ওকে ছেড়ে চলে গেছে বলে, লাল রঙের মোহটা গেঁড়ে বসে আছে ওর মনে - অপর্ণার আনা সোয়েটারটা পেয়ে সে যতটা খুশি তা আর এ বাড়ির কারোর মুখে ফুটতে দেখেনি অপর্ণা। অপর্ণার তাই ওকে কিছু দিতে খুব ভালো লাগে।
কল্যাণী ওর প্রাপ্য বিদেশী পিতলের ধুনচি নিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে দরজা দিলো। সেদিন রাতটা একরকম খুশিতেই কেটে গেলো অপর্ণার। কিন্তু অনুশোচনার দংশন

জ্বালায় জেরবার মন - বিনিদ্র রজনী, চোখের তলায় কালি, আর কিছুতেই সে থাকতে পারছেনা এই বাড়িতে। গিলে খাচ্ছে অপর্ণাকে, চিৎকার করে প্রতি রাতে তাকে কুলটা বলে তিরস্কৃত করছে ঘরের প্রতিটি চৌকাঠ। কাজে মন নেই - নিউজিল্যান্ড ট্রিপটা পেছালো ছয় মাস। দাঁতে দাঁত চিপে কেটে গেলো আরো তিন মাস - দুঃস্বপ্নের কালো রাত্রিগুলি সে যে কি ভয়ংকর রাক্ষুসে, অপর্ণা পেছনে ফিরে ভাবলেও কুঁকড়ে ওঠে।
অন্তরার পরীক্ষা শেষ। কৌশিককে প্রজেক্টের কাজে ছয়মাস টানা আমেরিকায় থাকতে হবে। পরের সপ্তাহে কৃষ্ণার সাথে বিদেশ পাড়ি দিচ্ছে সে। অপর্ণা চুপ করে শুনেছিলো সেদিন, দিন খুঁজছিলো ঝোপ বুঝে কোপ দেবে বলে। বসে ছিল অপেক্ষায়।
সকালের ছুটির মেজাজে সবাই গড়িমসি করে সবে চায়ের কাপে চুমুক দিয়েছে। এমন সময় অপর্ণা কথাটা পারলো, "আমি আর অন্তরা দিল্লি যাচ্ছি। সব ব্যবস্থা করে ফেলেছি, ওখানে আমার কেরিয়ারের অনেক বেশি ওপেনিং আছে। আর অন্তরার জয়েন্টের পড়াশোনার জন্য ভালো কোচিং ও পাবে। তোমাদের আপত্তি আছে?"

কল্যাণী বললো, "তুমি চাকরি করবে, ঘর সামলাতে তাহলে গোপালের মাকে নিয়ে যেও, গোপাল দিল্লিতেই কাজ করে, ও ভালোই থাকবে ওখানে। আমি অনেক দিন ধরেই স্বপাক আহার খাবো ভাবছি - ঠিকে ঝি যেমন আছে তেমন থাকলেই হবে।" বলে ঘরে ঢুকে ধ্যানে বসলো। একটা সূচীভেদ্য নিস্তব্ধতা ঘরটাকে যেন গিলে খেতে লাগলো।

তিন সুতোর এই সম্পর্ক কোথায় গিয়ে গড়াবে কেউ জানে না। অপর্ণা হয়ত সারা জীবন দুই নৌকায় পা দিয়ে চালিয়ে নেবে জীবন। অন্তরা আর অর্ণব ভবিষ্যতে আরো বেশি করে নিজেদের উপলব্ধি করবে। দাম্পত্য প্রেম এক স্বর্গীয় অনুভূতি আর তার ভিত্তি কিন্তু গভীর বন্ধুত্ব ছাড়া হয়না।

কৌশিক মাঝ রাতে অপর্ণার ঘরে ঢুকে বিছানার পাশে এসে দেখলো, অপর্নাও কি যেন এক আত্মদংশনে ভুগছে। অপর্ণার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলল, “বহু দিন ধরে আমরা একে অপরের সাথে থাকছি, একসাথে অনেক সুখ দুঃখ দেখেছি, এই বুড়ো বয়সে ছেড়ে চলে যাবে যাও, কিন্তু জেনো আমার মতো এতো ভালো তোমায় আর কেউ বাসেনি, প্রকাশ হয়ত করতে পারিনি, কিন্তু আমি অপেক্ষায় থাকব, তোমার ফিরে আসার, আমার দৃঢ় বিশ্বাস তুমি আমার শেষ বেলায় আবার এই বাড়িতে ফিরে আসবেই।”

অপর্ণার চোখ দিয়ে টপটপ করে জল গড়িয়ে পড়ে। বিছানা থেকে উঠে জড়িয়ে ধরে কৌশিককে। ফুপিয়ে ফুপিয়ে বাচ্চা মেয়ের মতো কাঁদতে থাকে। পিঠ আলতো চাপড়িয়ে কৌশিক বলে, “শান্ত হয়ে ভাবো, আমি কাল সকালের অপেক্ষায় থাকলাম। নতুন দিন হয়তো তোমার নতুন করে ভাবার শক্তি দেবে।”

ঘড়িতে তিনটের ঘন্টা। দেয়ালের টিকটিকিটা ঠিক ঠিক করে ডেকে উঠলো। গলিতে পাহারাদার – “জাগতে রহো” চিৎকার করে পাড়া ঘুম পাড়াচ্ছে। রাতের ভারী মালবাহী ট্রাকের আওয়াজ, গঙ্গার পাড়ে মরা পোড়ানোর বিকট গোঙানি। সব কিছু ছাপিয়ে মুক্তি মেলে মনের। অলস দুটি চোখ বুজে আসে ক্লান্তিতে। চিন্তা করার শক্তি হারিয়ে, এক আবেশে নিস্তেজ হয়ে যায় অপর্ণার শরীর।

সমাপ্ত

My Best Friends Forever

Anuradha Das

The statement that the dog is man's best friend was first recorded as being made by Frederick II, King of Prussia, referring to one of his Italian greyhounds as his best friend. The term was popularized by its use in a poem by American poet, Ogden Nash. It has since become a colloquialism, and refers to domestic dogs, highlighting their close relations, loyalty, and companionship with humans.

An Introduction to Dogs – Ogden Nash

"The dog is man's best friend.
He has a tail on one end
Up in front he has teeth.
And four legs underneath.

Dogs like to bark.
They like it best after dark.
They not only frighten prowlers away
But also hold the sandman at bay.

A dog that is indoors
To be let out implores.
You let him out and what then?
He wants back in again.

Dogs display reluctance and wrath
If you try to give them a bath.
They bury bones in hideaways
And half the time they trot sideways.

They cheer up people who are frowning,
And rescue people who are drowning,
They also track mud on beds,
And chew people's clothes to shreds.

Dogs in the country have fun.
They run and run and run.
But in the city this species
Is dragged around on leashes.

Dogs are upright as a steeple
And much more loyal than people.
Well people may be reprehensibler
But that's probably because they
are sensibler."

My friendship with dogs began when I was a child in India, blossoming into a full blown love affair after we adopted adorable Tara in 1994, continuing with the adoption of our beloved Lucy and finally, feisty Kimba.

Let me start with Diana, who came to us as a six-week old puppy, in Calcutta, when I was six years old. Baba was given this adorable pure-bred German Shepherd by a friend who was a breeder. Diana slept in a basket at night next to Ma who had to keep her hand on her all night. As soon as Ma would remove her hand, she would cry. Diana grew up to become a great friend who loved to play with me, but also insisted on treating me as someone who had to toe her line. She was the boss as far as I was concerned, the lowest on the pecking order of the Paul family. If she didn't like something that I did, she would let me know in no uncertain terms, by growling low in her throat. I knew that she would never do anything to actually hurt me but she had to assert her authority. Diana was not allowed to sit on the furniture, which included the bed. Whenever Ma and Baba went out, leaving didi and me at home, Diana knew that this was our time to spend sitting together on the bed, sharing snacks and generally having a good time. Every Christmas we used to go on holidays to small towns, travelling usually for a day, by car. We used to start from home with didi and I sitting by the windows, in the back seat, and Diana in the middle, between us. Within half an hour I would be relegated to the middle seat between didi and Diana, who had her head half out of the window, enjoying the breeze. At the end of a day of travel, I used to end up ravenous, because guess what? The food passed by Ma from the front to me ended up in a certain canine's belly, who was happy and satisfied having eaten her fill. Sadly, Diana passed away on 17 January 1971.

In 1994, November, after much discussion among our boys, Chandan and Shuvo, we decided to adopt a dog. We went to the RSPCA adoption centre in East Burwood and found a pair of six-week old German Shepherd - Border Collie cross puppies, brother and sister, waiting for someone to adopt them. Tara was our choice and was the best decision we could have made.

She was affectionate, loved people generally and adored the boys, Asim, Ma and Baba. I think she believed that she was a human. Her total devotion though was reserved for me. As a puppy, she used to sit on my lap and conduct conversations with me in her own language, which amazed visitors who witnessed it. As she grew into an adult, so did the bond between us. She was very protective of me, both at home and outside. I remember the time when we were out early one morning on our usual very early morning walk and a man got out of a car and asked me what I was doing out at that time of the day. Tara's menacing growl was enough to make him turn tail and run off.

On another occasion, we were again out walking in the afternoon when we were stopped by two men in a van pulling up next to us. The passenger wound down his window and asked me whether I knew where the nearest watering hole was. Before I could reply, Tara jumped up with her paws on the window, scaring the two witless. They drove off in a mighty hurry. At home, no one could hug me, not even the boys, if Tara was around. She would separate anyone attempting to get close to me physically, by pushing him or her away.

Tara did not live as long as she should have and died unexpectedly on 8th February 2001, when she was only six and a half years old.

Her untimely death hit us so hard at first that we thought never again do we want to go through this pain. Then we realised that we were just not getting over the loss, so we paid another visit to the RSPCA. This time, it was love at first sight between Lucy and us. This one-year old beautiful Doberman - German Shepherd cross was meant to become a member of our family.

Lucy had the sweetest nature imaginable and even friends who were terrified of dogs liked her. She was protective of me but generous enough to share me with others. She was my shadow, waiting outside the bathroom when I was having a shower, following me wherever I went. Coming in from outside after a bathroom break, she would frantically look for me and relaxed only after she found me. She would sleep on her blanket by my side of the bed and from time to time, I would wake up when a wet nose was pushed into my face. Just making sure that everything was in order. Coming home from work, the fiercely wagging tail and the wide toothy grin were just magical. The same exuberant welcome was generously given even if I was out for a few minutes.

Over the years, Lucy became a favourite with everyone who came in contact with her, friends, tradesmen, even the local vet. Even though her health began to deteriorate, necessitating frequent visits to the vet or hospital, with often painful treatments, she quietly endured all of it with no complaints. After her passing, on 28th November 2013, we vowed to never again have another pet.

But what happened? I realised that I had room in my heart for another friend. So, in April 2014, Kimba, an eight-month old Whippet - Kelpie cross joined the Das family. Affectionate but feisty, completely untrained and lacking in manners, Kimba proved to be a real handful. We were at the end of our tether when we decided to send her to boarding school for three weeks. That was the turning point. She was much more manageable, although still very lively. Walks with Kimba are never boring, especially if we meet other big dogs, possums, cats and strangely, crows - public enemy number one as far as she is concerned. She has mellowed a little and has become even more loving. My hope is that she will become more settled as she matures. I do enjoy being followed by my shadow wherever I go and the loving embraces in the evening when she sits with us while we are relaxing on the couch. I know that she will not be with us forever, but I am determined to just enjoy her company for as long as I can.

One look into your brown eyes

Molten pools of love

And all the pain and stress is no more.

The comfort of your warm body next to mine

Makes cold winter evenings welcome.

You never judge but accept unquestioningly

Whatever is done to you or for you.

Your loyalty is unswerving

And your love is unqualified.

No conditions or strings for you

No expectation of equal return

Just pure unadulterated joy

And gratitude that you have a home.

Would that humans were so generous and pure of spirit

The world would be a better place.

Cliché though it may be, it is true

God broke the mould after he created you

My best friends forever.

The Black Swan

Chris Mallika Bhadra

'You are *a* black swan', everyone called her.

Born to the swan king and the queen, she was the youngest of the brood. Minutes after her royal birth, everyone was overwhelmed with dismay and grief with her colour. 'She would bring nothing but sorrow to her family', everyone declared. Gradually, all of the ridicule became a part of her everyday jargon but that never deterred her from doing anything. She lived her life to the fullest, while everyone around her spent theirs discussing her.

Initially days passed and then gradually they turned into years. From a chirpy little bird, she grew up to be a feisty and a confident young adult. She was the most stubborn amongst her siblings when it came to completing a work or achieving something. Although considering that perceptions vary from one to another, her arrogance for victory seemed useless to all others around her. All the other swans around her dismissed her efforts, undermining her confidence and her spirits. But she continued to grow and thrive, much like a lotus blooms in a marsh. Her world was indefinite, her spirits unbound. For she knew she had nothing to fear and nothing to lose. Each passing day, she was her own competitor in her mind in the long race.

And so it happened. The day came when the black swan soared high and never looked back.

It was the first day of Spring. But it was a day of double excitement for the swan community as it was also the day they had to choose one from amongst the royal siblings to be the crown prince or princess. But nothing was easy for the royals: you had to prove your mettle in order to be crowned. The test being simple, fly as high as you can without stopping. The one who makes the longest trip wins. Tension rang high, equally distributed between the royals and the locals, anticipating the win and the loss. Prayers were being chanted in silence in favour of the most desirable winner. No attention or good wish was wasted on her. Fearing nothing, she looked at her parents and moved on. Her burning spirit was

aglow and shining brighter than any other day in her life. She knew she had this lone chance of showcasing her abilities.

And thus the flight began. Tension among the swan folk was soaring high with the sound of flapping winds and grunts and moans. A long war of wings commenced among the siblings, one going higher than the other. Half the day was over and the emergence of the winner was becoming difficult by the minute. The audience was losing hope and the competitors were losing time, because none of them had thought life would be this hard. Much to their parents' anguish, one by one all the royal misfits gave up. Minutes before the cancellation of the trial, once could see wings panning the sky. Dark, lustrous black wings were up and against the wind… and aiming for the clouds, it almost seemed. There she was, flying with her wings spread wide and open. She knew no fear and holding back. Siblings amused, crowd shocked and parents proud!

The first of its kind in the community, *The Black Swan*, was crowned the princess. She had shown the world what it took to be the real winner in life. When ambitions are high, colour does not matter. The spirit of the heart does!!

'Yes, I am *the* black swan'. She flapped back….

My Heart

Malobi Sinha

They are blue today,
The skies…they
Weren't always
So, my Dear;
Storms raged
For days and
Nights on end
And the winds
Howled in the
Dark. But
Ah, so the
Sun shines again
And oh what
Joy is this
That is
In my
Heart

Durga Puja – A Big Market Place

Goutam Basak

In today's world, where one idea can change the world—Kolkata made me nostalgic about the times when Bengalis were thought of being the source of big ideas. People choose Mumbai, Bangalore, Chennai, Delhi and Hyderabad as great potentials career wise and as modern cities that take pride in rising above ethnicity. But Kolkata remains Bengali. Therefore, it continues with the Bengali love of culture, the triumph of intellectuals over greed, the transparency of emotions, a disdain for hypocrisy and the warmth of humanity.

I was in Kolkata during Durga Puja last year and some of the data just amazed me. Apparently, Kolkata hosts over 5,000 Durga Pujas every year, of which around 300 are family pujas and another 1,000 housing-community pujas. Compared to this, there are around 140 Durga Pujas held in Mumbai and 380 in NCR. Footfalls are nearly 200,000-300,000 per day, per Pandal, in Kolkata. It's 100,000 per day in Mumbai and 500,000-1,000,000 over 5 Days in Delhi & NCR. According to Puja committees, major sponsorships range from ₹10,000 to ₹100,000, whereas big corporations expend between ₹2 lakhs to ₹30 lakhs on sponsorships, on each puja. One of the major paint companies sponsored 35 pujas. Businesses that are into consumer products and services, sponsored at least 10 pujas at a time. The average budget of the renowned pujas is ₹1cr plus and more than 60% to 70% is coming from the sponsors. Like venture capitalists, these sponsors are also asking for KPIs from the puja committees in order to calculate the ROI.

A 2015 research by the Associated Chambers of Commerce and Industry of India (ASSOCHAM) on "West Bengal Cashing in on Durga Puja Celebrations" revealed expenditure on Durga Puja touches around $8 billion on the temporary construction (pandal), idol making, food, clothing, transport, tourism and many other areas for four days of the festival, with 30% yearly growth. Corporate sponsorship and celebrity brand ambassadors are new ways of marketing, making it a more engaging experience to Bengalis worldwide. Sponsors also bring innovative trends – from organising events and competitions, to corporate social responsibility (CSR) activities that encourage a better environment during the Durga Puja session and a commitment to the local community that goes beyond the five-day festival.

Over the last couple of years some corporates and West Bengal Tourism took a great initiative to explore more of Durga Puja and put it differently on the world map. Groups of journalists, travel writers and travel agents from France, Spain, Canada and Switzerland are visiting Kolkata during the Puja and they have termed it "the world's biggest open air exhibition of art". Last year there turned out to be more than 100,000 international tourists in the city during puja. This year the expectation is more than 200,000.

Conducting a Puja is almost like conducting a business, these days. Many well-known Puja Committees have their own website. The sponsors and the donors have the facility to electronically transfer money to their accounts. The Pujas today are an event for brand building. The media and corporate houses are the face of

the event. More and more intellectuals, artists and global inputs are getting into the whole affair, making the Pujas a mix of everything: Tradition, Social Gathering, intricate and sophisticated Creative expressions, Cultural Outlets, Food Fiesta, Tourism Hub and Big Business opportunities. An all in one "one stop shop".

To run any mechanism, you need money. A society without money makes no sense. Although people do volunteer, there is no evidence that you can run an entire carnival with only volunteers. So along with culture, creativity and worship, money is also a great necessity. Durga Puja now is not only a carnival but also a spiritual, social and philosophical journey, with a lot of mysticism into it. In contemporary times, it has become a massive centre for open air creative art, a market place and an extreme opportunity for international tourism. As Ralph Waldo Emerson said: "Wise men put their trust in ideas and not in circumstances." I guess Kolkata is doing that leveraging its biggest festival.

Basics of Forex

Partha Banerjee

Everyone is talking about Forex Trading nowadays. It is a fact that this market is the world's biggest and most competitive market. The daily turnover of this market is nearly US $6 Trillion. That is huge when we compare this to the Australian Stock Exchange (ASX) average daily turnover of equities - which is around $8 Billion. We need to remember that 1 Trillion = 1000 Billion.

Forex can be considered as a form of exchange (although there is no exchange to control the enormity of Forex) where the global decentralized trading takes place for various international currencies.

The very need to exchange currencies is the primary reason to understand why the FX Market is the largest and most liquid financial market in the world. This market is open 24 hours a day, five days a week. Forex market never sleeps, which means you can participate in this market to trade virtually any time. The most popular way in which Forex is traded is known as the "Spot". Currencies in the Spot market are traded (bought and sold) according to the current market price.

The price of any currency is determined by its supply and demand. The main factors which influence this supply-demand are as follow:

- Country's cash interest rate
- Gross Domestic Product (GDP) of the Country
- Employment statistics
- Economic performance (Trade Balance etc.)
- Market's perception of future growth of one currency against another

A large portion of the market also constitutes of Currency Traders who are taking advantage of small fluctuations in exchange rates since they are now able to trade these instruments through the power of leverage which may go up to 1:100 ($1,000 controls $100,000) or even 1:400.

Trading in Forex is to participate in trading between one country's currency with another; e.g. we all know that in Europe the common currency which is in circulation is Euro (EUR) but in United States (US) of America, the circulated currency is known as US Dollar (USD). So in this case, an example of a Forex trade can be to buy or sell EUR and at the same time sell or buy USD respectively. This is known as going Long or Short respectively, on the currency pair known as EUR/USD.

We also have a concept of "US Dollar Index" or "US Dollar Basket" in foreign exchange trading. This Basket is a composite index, comprised of 6 currency pairs (EUR, JPY, GBP, CHF, CAD AND SEK) which are traded directly with US Dollar.

This Dollar index is an important instrument to know and to look for if you are serious about your forex trading. You can also trade this index as an instrument in some of your broker's platform.

Enjoy Trading.

The tides of time never wait, but haunt forever…

Chris Mallika Bhadra

Somebody once wrote, "Time and tide wait for none". Quite literally…

I, herewith, take the liberty to assume that the lady/gentleman coining this phrase must have felt despair and sorrow. Life must have gone as envisaged, but when he looked back he must have realized that not everything went quite as planned. People must have come and gone, memories made and erased over and over again but that time never returned. A broken heart might have been healed and mended but the little details must have kept hitting back with no signs of fading away. And as he might have been counting his final moments, all the waves of his life must have hit the shore and hit it hard. The waves of time, coming back in a high tide!

Isn't it something that happens to each and every one of us, once in our lifetime? That we try very hard to let go of something or erase the very last shards of that event from our memory boards but it hangs on and stays put. We give ourselves time, lots and lots of it, to get over it and eventually we do. But one day we see it all come back in a flash. That flash makes us wonder if we ever really got over those years gone by. If ever we would be able to! The only difference is, a flash of good times spent is welcome like the season's first rains whereas painful memories sting like a permanent scar on the face. And that scar doesn't go, irrespective of how hard you try to make it disappear.

To err is human. We think with our brains and hearts and make decisions in our lives. Sometimes these decisions work in our favour, and sometimes against us. In case of the latter, we tend to curse ourselves for the wrong step we took. And then, time takes over and self-guilt takes a back seat. Eventually, years pass those memories into oblivion. We enter a virtual mirage thinking our lives are almost perfect. But once in a while when the mirage breaks, then life shows us the real picture. All the good times, the bad times, the pains, the love keep coming back to us. And then they haunt us… till the time we become a memory ourselves.

To the good times… and the bad times as well!

Here

Malobi Sinha

Today is a
Grand day;
A day of song
And laughter;
To celebrate our
Unity and
Differences. A
Brotherhood
Of Man
Indeed
Is here

Crossing the Nullarbor – Our Story

Pritom Dutta & Pallavi Dasgupta

A journey of a thousand miles begins with a single step and we took almost 4 years to take our first step towards one of Australia's longest and mightiest road trips – Melbourne to Perth – an interstate drive through Nullarbor. The Nullarbor Plain is the world's largest single piece limestone covering an area of 200,000 square KMs, similar in size to the island of Great Britain!

The inception of this crazy idea dates back to the 2012 Western Australian summer. During a casual trip to Kalbari National Park in March, we went to a typical outback restaurant named Finlay's Fish BBQ. Fortuitously I picked up a tiny book which depicted the exciting journey of a couple who had travelled from Perth to Adelaide through Nullarbor. I brought this to Ayan da's notice and had a prolific one-hour discussion over barbequed fish and beer with him. The idea itself was crazy at that stage as I had never sat behind the steering wheel till then and here I was talking about driving thousands of miles through one of the most remote places on Earth.

Years passed by. My life changed significantly over the next few years. I moved to Melbourne. I learnt driving. I got married. Although, in spite of all these changes, one thing never altered – the quest to explore the unknown.

More time passed by. Socializing, festive corners and small contexts became part of our lives. Everything was going at its own speed but in the back of my mind I was still visualizing the trip which was inked in my brain four years ago. How to do it? Where do you start? How will we manage? Can we really do it? The most essential part was to explore the survival strategy in the middle of nowhere.

But there comes the quote which proves true in nature - "*Where there is a will, there is a way*". After all, '*Shankar'* from '*Chander Pahar'* always keeps inspiring all adventurous Bengalis over generations and we were no exception.

Back in 1841, Edward John Eyre took this brave step towards finding the route from South Australia to Albany (Western Australia Port City) and it must have been very tough. But thanks to today's technology, with Google, Maps, Visitor Centres, it was not that difficult for us to plan our journey. From drawing a route line in Google map, booking camp-sites, going to Rays Outdoors, getting our stuff for camping, it all felt like we were going on an expedition. It was our first unusual trip but we were still firm on the notion that we will camp throughout our whole journey rather than booking hotels or motels. Camping is fun, but for us, in that whole journey, our car and tent were our home and shelter and so we chose a traveller tent which was easy to set up and easy to set off. Along with that - gas, portable table, camping utensils, not to forget barbeque chairs - everything was packed and we were ready to hit the road. A big fat eski also found its way into our car to store our food. The real challenge we faced was on the D-Day eve, when all these things had to fit in well in our small Travel Partner Mitsubishi Lancer. After a couple of hours of intense space negotiation, we could finally fit everything into our car, sparing merely our seats. And then we waited eagerly for the night to crawl out and light to come.

DAY ONE - MELBOUNRE TO LAKE TYRRELL.

Finally, the sun rose. We got dressed, took our car and headed to work! Sipping numerous coffees, watching time during meeting hours, looking outside the office windows a hundred times… and finally the clock struck 2. We were out on our journey towards our first destination - Sea Lake, a small town near Victoria's biggest salt lake named Lake Tyrrell.

The drive towards Sea Lake was filled with excitement and lots of planning between us. We were driving with a hope to achieve the happiness that we felt while planning the journey. Sharp at 9 pm, we entered our camp site for our first night stay. We were so happy to see that the camp site

owner Andrew kept the lights on so that we can easily tent up. There was something else which was bright enough to give us adequate light and that was the full-circle glowing Moon surrounded by chunks of clouds. Plain site with limitless trees and some caravans parked, we stood silent just to feel nature. We started observing our camp site and to our surprise we found lavish washrooms and a fully equipped kitchen; it had a cooking range, microwave, kettle and all cooking essentials. There was even a laundry and aerial to dry clothes.

One thing worth mentioning is that our *bong* instincts kicked in that night and we decided to have "*Bhaat, Ghee, Dim aar Aloo Sedho*". The sumptuous dinner was followed by a half an hour of 'ummm...that cloud looks like....' game under the full moon. That night both of us took a vow that we will try to be with Mother Nature more often and respect her wishes in every step of our lives.

DAY TWO- LAKE TYYRELL TO PORT AUGUSTA

The only drawback of a tent is you don't have an en-suite, so you have to wake up early and get *'things'* sorted out. But it also has a good part. You can feel the pure morning breeze which we do not get a chance to sense in our day to day life.

There were two different routes from Lake Tyrrell towards Port Augusta; obviously we chose the less populated one which was going through the banks of the Murray. The Murray River, Australia's longest river, which flows through three different states and is popularly known as Australia's Lifeline. We geared ourselves up and after having a decent breakfast we hit the bitumen for our next destination.

The first big town that came on our route was Mildura. But on our way to Mildura, we met with the old friend named *Big Lizzie* at Red Cliff. Big Lizzie is a road train comprising of a heritage tractor and trailer.

Mildura, located near the bank of the Murray River, is known for its wineries and citrus groves and popularly referred to as the *'Fruit Bowl of Australia'*. Mungo National Park, home of Australia's oldest trace of human ancestry *'Mungo Man'*, is roughly 100km drive from Mildura. Due to Mildura's high production of fruits, it comes under *'Fire Fly Restriction'* zone and travellers are not allowed to bring any fruits and veggies from outside.

While we were driving through, the views on both sides of the road were astonishing. On one side it was citrus-covered bright yellow fields and on the other side we were accompanied by green and red vineyards. We passed through another town on our way, Renmark. Renmark is a small

Figure 1- Flinders Ranges from Goyder Highway

regional town which is sighted for its Murray houseboats. Renmark is considered to be the rendezvous point of three states - Victoria, New South Wales and South Australia. As we progressed further through South Australia, the topography started changing dramatically. As we were used to the green gloss of Nature, suddenly we were experiencing dry scorching heat and cyclone of maroon sand. Other than two lanes and some cars passing by, there was nothing to observe on the road; still the road gave us a feeling that we were watched and smelled by someone.

The smell of atmosphere slowly changed from the fresh smell of grass to a dry pitch smell. From nowhere, we suddenly found a tree with no leaves but shoes hanging from it. This made us realize that our predecessors on this road gave us something to glint.

The road seemed never-ending. While nearing Port Augusta, our eyes got glued to the

spectacular canvas view of the Flinders Ranges, expanding itself as far as our eyes could go and straight in the middle there was one thin black line known as the Goyder Highway. Unlike day one, it was easy enough to set up our tent and get everything arranged. Before taking our dinner, we thought of taking in a glimpse of the sunset and so we drove to a nearby port. We stood on the deck to watch the sun melting its golden rays over the Flinders Range. On our left, we had Flinders Range playing with the sunset colours; on other side, we had the beautiful views of the harbor and the backwaters. Back in shelter, we had steak and wine for dinner and bidding adieu to the night we went to sleep.

In the middle of the night, we were woken from our sleep with the howling of a storm. We felt like the storm would take our tent away. But miraculously everything ended in a pleasant way and we survived day two.

DAY THREE - PORT AUGUSTA to PORT LINCOLN

Rain in Port Augusta is very rare and we were lucky to witness that rare phenomenon. From a strategic stand point, Port Augusta is a very important dot in the Australian atlas. There was a diversion meters away from our *Big4* camp ground. The road sign was marking two distinct places of Australia, Stuart Highway was going through Alice Spring till Darwin and Eyers Highway was going to Perth via Nullarbor. There might be very few places on earth which marks the gateway to two of the world's longest tracks. Although our itinerary directed us to hit the western route, we could not resist the enticement to get a glimpse of the northern track which goes through the centre of Australia. Stuart highway, named after the Scottish explorer John Mcdoull Stuart is referred simply as The Track. The Stuart highways stretches itself through some of the most remote yet remarkable places like Coober Peddy, Lake Eyre, Ayers Rock (200km diversion from main road), Alice Spring till it ends in Darwin. Also, one of Australia's longest and mightiest 4-wheel drive track named *Oodnadatta Track* lies alongside this road. The diversion was worth it, as we saw a mystic view of the Flinders Range from the Arid Land Botanical Garden. Expanded landscape view, blended with sunset colours and that cloud capped enigmatic view– it felt like the three different views of Flinders Range completed its own trilogy.

Another heritage view was of the *Ghan express* which runs from Adelaide to Darwin. The whole moment took us back in time to when the tracks had a lot of stories to share. After inking down our next travel itinerary, we finally touched Eyers highway. Although Eyers Highway is the shortest route towards Perth, but as per our schedule we took a diversion towards Port Lincoln. Why suddenly Port Lincoln? We will leave that puzzle for the future and will go with the flow for now.

The coastal route from Port Augusta through

Figure 2 - Point Lowly Light House

Port Lincoln till Ceduna is called Australia's Seafood Frontier. It also marks the starting of Eyers Peninsula. The massive production of Tuna, Lobster, Oysters from this area are satisfying the hunger for seafood over a period of time. After driving few kilometres, we took a diversion from Lincoln highway to visit our first site "*Point Lowly Light House*".

The first sight of the light house immediately reminded me one of my childhood novel cover picture, Jules Verne's "*The Light House at the End of the World*". It seemed like a big white sentinel guarding mankind from all mythical sea monsters. In spite of a strong sea current, we could see quite a few fishermen boats engaged in striking their catch of the day. Before hitting the Lincoln Highway, we did some crazy stuff like

parking our car in the middle of the rail line just to capture the moment.

The next big town on our way to Port Lincoln was Whyalla. Whyalla is famous for its massive steel production and giant Cuttlefishes. Whyalla has its history deep routed in the early 19th Century. We made a try to visit Whyalla Visitor Centre and Maritime Museum but we were not that lucky on Good Friday. Driving through the coastline and passing by picturesque coastal villages like Cowell, Arnobay and Port Naill, we took our next stop at Tumby Bay.

Tumby Bay, though being a small fishing town, still has lot to offer to its visitors. Crystal clear waters and the white sandy beach instantly took away our road tiredness and filled us with ecstasy. Someone who wishes to have raw seafood, can visit this place and get their appetite suborned. There were numerous towns, beaches and lookouts located on our route; and each had its own beauty. One can easily spend their whole lifetime on this journey itself which we planned to cover in only nine days!

When we hit our camp site, it was early evening. We became spellbound after looking at our night shelter. People are eager for sea facing rooms or sea facing balconies, and our camp was just adjacent to the sea! We could not have asked for more than that. As we had already turned into *Gypsies*, it did not take much time to set up our camp and get fresh. As we did not want to miss the last few hours of daylight, we hit our way to Port Lincoln National Park without wasting a minute. Port Lincoln National Park was full of daring tracks and trails, mostly suitable for four-wheel drive cars. With our Mitsahubishi Lancer, we were constrained to some handful of places only. It took a lot of courage and immense faith in our 2WD car to traverse through the dirty and bumpy unsealed roads and finally we reached the furthest corner of the park "*Donington Lighthouse*".

Standing all alone at one of the most isolated places on earth gave us an eerie feeling that someone might be overlooking us from the deserted lighthouse. But at the same time, we were enjoying our personal time with the deep blue sea. Another best kept secret of Port Lincoln National Park was '*Fisherman Point*', where a group of boats were anchored silently and campers were enjoying their Easter Friday in the lap of Mother Nature. Watching them made us believe that camping is great fun when it comes down to this kind of hidden corners.

With the sun going down to rest, we started driving back home. While driving through the national park, we were stunned by the playfulness of floating clouds and sun in the backdrop of the blue sky. Both dark and blue shades of sky, the sun rays coming out of the cap of clouds and

Figure 3 - Camping at Port Lincoln

making the sea glow like diamonds, the whole National Park glowing with its rich presentation - we witnessed the unconditional beauty of mother nature spellbound and showed our gratitude to the creator of the cosmos. While we were driving back to our camp site, we took some time out to visit Sleaford Sand Dunes. There was a lake in the middle of Sleaford Mere Conservation Park which was surrounded by a series of white sand dunes. We were alone and running around in the cold sand as we watched the sun go down with us. We bid adieu to day three from our sea facing camp and slowly prepared for the greatest adventure of our life time which was due the next day!

DAY FOUR: ENCOUNTER WITH THE GREAT WHITE

How many of you haven't seen the movie *Jaws*, a Stephen Spielberg classic? Although it was one of my favourite movies, I never knew it was filmed in Port Lincoln till only recently. Back in the 60s, a South Australian named Rodney Fox introduced the idea of putting a caged man in the

sea to face the great white, one of the greatest predators reining the sea from pre historic times. Steven Spielberg had approached Rodney Fox for live filming of The Great White Shark in the 70s.

At present, the Rodney Fox shark expedition team is still continuing its legacy and offers shark cage diving experience to adventure-seekers from around the globe. We booked our adventure with a similar group named Adventure Bay Charters. Our vessel started very early in the morning and anchored close to South Neptune Island, our destination to meet the Great White. We welcomed the rising sun and pleasant waves during the first half of our journey, although when we hit the open sea, the journey became a bit bumpy and most of our co-passengers including us, were found in the back of the vessel with puke bags in hands. Our boat was making its way thrashing through the *Poseidon*. Things settled once we anchored near the island.

There were other vessels parked adjacent to us and were using different tricks to attract sharks. Few of them were using Tuna blood but ours was unique. We used rock music to attract the Great White. Surprisingly Sharks can sense vibrations and

Figure 4 - Shark Expedition

according to the locals they are pretty fond of *ACDC* top tracks.

We quickly suited up and the crew put the cage under water. Soon we started taking our chances beneath the water. The endless view under the blue sea reminded us all the underwater movies we had watched in our childhood, and also gave us the real thrill that something might silently come from behind or beneath us. The cage was small and can only contain 6 people at a time; thus we kept rotating ourselves in small groups. One time we came across a flock of tuna and another time we saw cuttlefish flashing to get to its prey, eagerly waiting "*To Rock with the Great Sharks*".

The wait was over after a few dives when we finally came face to face with The Great White. The moment stopped, we became stunned and perplexed after encountering our greatest fear in front of our face. The thrilling experience is close to impossible to put in writing. But honestly we do not want to face it again.

The amount of fun we had beneath the deep blue sea, there were also much fun happening on the deck. Some of our co passengers had a good time catching fish and some relaxed on the deck. While returning to a relaxed mode, lying on the deck with a bottle of beer, both of us were not prepared to let the day go. Suddenly we were accompanied by a group of dolphins, jumping and swimming in front of our cruise and trying to bond with us. Quickly both of us gave a '*Titanic pose*" and framed it. We finally reached the jetty when the clock struck 8.

That night we had a sumptuous dinner at a Indian Restaurant called '*Spicy Planet'*. After a short discussion with the owner, we came to know that only seven Indian families are permanently residing in Port Lincoln and the restaurant usually get their grocery from Adelaide which is a 7-hour drive. This is probably called the '*Taste of India'*.

With tired bodies but satisfied minds, we let go of Easter Saturday, undoubtedly one of our best and most memorable day in times to come.

DAY FIVE- PORT LINCOLN- CEDUNA

Day five started with our heads strong and high. As we progressed further into our journey we

Figure 5 - Makybe Diva

kept anticipating what'll come next. Before leaving Port Lincoln, we wanted to get a final glimpse of the whole town and also gather some information from the visitor centre. After collecting information and a fridge magnet from the visitor centre, we discovered a statue of a beautiful black stallion in the middle of a green lush park. That beautiful work of art was the statue of *Makybe Diva*, a British breed race horse, who was the first to win three Melbourne Cups in succession. It was then time to hit the road and go to our next destination. If only we knew that we would have to come back to Port Lincoln for some unfinished business.

Our next destination was Coffin Bay. Coffin Bay is a town situated on the western side of Port Lincoln. It is a popular location for boating, sailing, swimming, water-skiing, skin-diving, wind-surfing, and fishing. But beyond everything, this small fishing town is famous Australia wide for its Creamy and Juicy Oysters – 'Coffin Bay Oysters'. The history of Oyster farming in Coffin Bay dates back to 1849 and this settlement was known as the Oyster Town. There was a 15 kilometre walking trail which offered visitors an opportunity to enjoy the beauty of Coffin Bay's abundant flora and fauna and magnificent water views. While enjoying the panoramic view of Shallow Bay water and adjacent white sand dunes, we realised that we were missing something. Our quintessential travel partner Nikon 3100! After minutes of flashback in our mind, we made a quick call to Port Lincoln visitor centre and after getting a positive reply from them, our minds relaxed. This small mistake cost us the whole Coffin Bay National Park trip as we quickly headed back to Port Lincoln after gulping down a dozen Coffin Bay Oysters with freshly squeezed lemon and rock salt.

Again revising our journey from Port Lincoln, we headed towards north on Flinders Highway to our next destination Woolshed Cave, in between taking a small break at Elliston. A few kilometres diversion through a dirt road took us to Woolshed Cave.

Placed in a fully abundant area, Woolshed cave is considered to be a giant cavity in the cliffs. The cave and sea made us dread how water had starkly different shades. In one place it was cool and

Figure 6 - Woolshed Cave

calm and in another, so strong that it passed through the rock to make its own path. It also taught us the lesson that water made its way through the rock not only because of its power but due to its persistent nature. We could not resist our temptation to take a few adventurous steps inside the cave and frame the sky and ocean together through the nature's window. We came back to Flinders Highway and en-route we stopped by the picture perfect Venus Bay. We took a short walk on its white sandy beach and washed our feet in the crystal clear water. While taking a walk beside the shore, we were accompanied by a group of pelicans who were busy picking up fish.

Adhering to our busy schedule we reached our next destination, which can easily be considered as one of nature's wonders, *'Murphy's Haystacks'*. It was a weird formation of 8-meter high rocks resembling a huge pile of hay. The formation appeared to be very unique in the middle of a green verdant field. It was an ideal destination for photographers and also a marvellous site for campers to park their caravan. A further stretch of 50 kilometres of bumpy road could take you to Point Labatt Conservation Park. Point Labatt is the only place in mainland where Australian Sea Lion Pups can be seen learning to swim, playing and resting on the beach. Due to a lack of time and vehicle constraints, we finally decided to not go further and drove back to the bitumen.

We stuck to the bitumen and reached Streaky Bay. Streakay Bay was named by the great explorer Matthew Flinders himself and is famous for its oyster production. With the falling sun we chose to go for a tourist drive named "*Cape Bauer*

Loop Drive". We travelled through a long stretch of wavy dirt road accompanied by the roaring sound of the mighty ocean. While going through the loop, we stopped for a small time as our ears were stunned to hear the whistling sound of the sea. The sound was created by waves passing through blowholes and hence, it is marked as the *'Whistling Rock'*. An enigmatic mist could be observed around the blowholes, through which we let the sun go on our day five. After completing the loop, back in Streakay bay, we could not refrain ourselves from tasting the streaky bay oysters. As shops were already closed, we finally ended up visiting a fisherman's house to collect a dozen Streakay Bay Fresh Oysters. Another 110km drive brought us back on Eyre Highway from where we had diverged a couple of days back. Finally, we reached Ceduna campsite in late evening. To our surprise the campsite was pretty filled up and the reason was very clear, the next proper town on Eyers Highway was 1200 km away.

DAY SIX- CEDUNA TO NULLARBOR ROAD HOUSE

Figure 7 - Ceduna Jetty

Waking up and kitting ourselves back into our car, morning in Ceduna was something which we would never forget. A smooth breeze and morning rays gave us the energy and zest to start the journey ahead. Before leaving Ceduna, we went on a small walk on the jetty where many locals gather to fish and to collect oysters. A small visit to the local grocery was also essential to pack our food, ice and water for the next 1200km!

As we progressed further on Eyre's Highway, the surroundings changed drastically. It slowly became dry and lonely. A few caravans and caterpillar-like road rails became our travel partners. A sign board near Penong scared as well as thrilled us – '*LAST SHOP for 1000km - WARNING REMOTE ZONE AHEAD*'. Driven by our quest, we finally came out of our comfort zone. We took a left at Point Sinclair Road, which goes through a salt mine and ends at a pristine isolated beach called '*Cactus Beach'*. En route to the beach, we were amazed by the view of dried salt lakes surrounded by sand dunes. The whole place looked like a massive nature's canvas, where a variety of colours were brought together in a very artistic way; pink and cream dried salt lake, deep blue residual water, beige dirt road, white sand dunes, greenish bush, bleeding blue sky and a bright red Lancer standing all alone. The last few kilometres were pretty challenging for our Red Lancer but we were finally able to make our way to the beach.

Cactus beach, famous for its world class surfing waves, was also nesting a few campers on Easter Monday. We were under the impression that the place would be deserted without any connection to the rest of the world. Our assumption was proven wrong when one of the Aussie surfers approached us and appreciated '*Virat Kohli's'* match winning performance against Australia the night before.

Back on Eyers Highway, we drove ahead leaving '*Fowlers Bay'* behind. Fowlers Bay is a small coastal town surrounded by sand dunes and with a population of 125 people only. Edward John Eyre camped at Fowlers Bay during his great Nullarbor expedition. Soon we crossed '*Yalata Aboriginal Lands'*. The area is managed by Yalata Aboriginal Community and permit is required to go off road. On our way, an exceptional yet famous road sign drew our attention, which we usually see on Australian Souvenirs. A *'camels ahead'* sign! Surprisingly Nullarbor is home to approximately 100,000 wild camels which were abundant after building the rail road.

Figure 8 - Camel Crossing

'*Crossing the Nullarbor'* through the Australian outback is a once in a lifetime experience. We finally reached the point where Nullarbor officially starts with a sign board "*NULLARBOR PLAIN - EASTERN END OF TREELESS PLAIN*".

We took a moment to take a 360 degree spin to visualize and capture the whole panoramic view with our pair of eyes. We could see the land as far as our eyes could see because it was completely plain and treeless in all directions. That was a completely new visual experience for us and we were enjoying every bit of it. That segment of Eyres Highway goes through Nullarbor Plain and the Great Australian Bight. A sealed 12km road from the main Eyres Highway took us to Head of Bight Interpretive Centre. Head of Bight is one of the best whale-watching platforms in the whole world. We were unfortunate because mother whales only come for breeding between the months of June and October.

Though we missed watching mother whale breeding, we got our first sight of the Bunda Cliffs. Bunda Cliffs are unique lime stone formations which extend over 100km along the Great Australian Bight and at places are as high as 30 storey buildings. After a short drive, we reached our first Road House in Nullarbor- "The *Nullarbor Road House*".

Nullarbor Road House gave us an *'out of nowhere'* feeling and we started believing that we were the last of the human race in a post-apocalypse world. The Road House appeared to be the oasis in the middle of a desert, without any trace of civilisation within a 200 km radius. Setting up our tent was not business as usual that day. After all Nullarbor is a single piece of lime stone and we

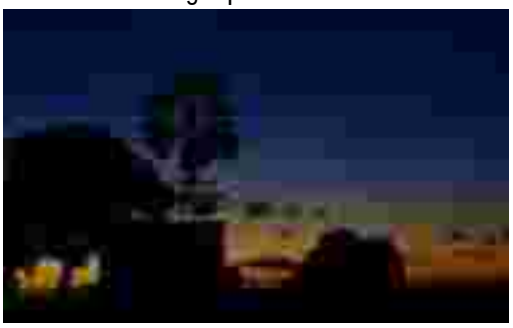

Figure 10 - Nullarbor Roadhouse at Sunset

were trying to hammer pegs through that. At one point in time we felt that we would be homeless for the day, but together we put up a good fight and setup the tent. Neither was there a kitchen nor a barbeque place, but we setup our gas and cooked pork chops and had it with our Streakay Bay take away Oysters.

There was a small golf course adjacent to the road house named Dingo's Den. It was part of Nullarbor Links, considered to be the world's longest golf course, spreading over 1300km, where 18 different holes were placed in various towns between Ceduna and Kalgoorlie. It was sunset time and we placed our barbeque chairs in the golf course to witness the giant golden bright sun set the whole sky on fire. It was an outback sunset and distinct in nature. The real surprise came after sunset. Millions of glittering stars started taking their places in the dark dome-like sky. Nullarbor is famous for stargazing. Soon the Milky Way appeared like the Starwar's light saber,

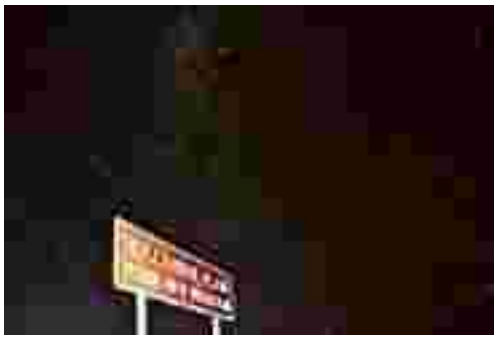

Figure 9 - Nullarbor under the Milky Way

separating the whole sky. We lit up a candle in front of our tent and kept watching this celestial phenomenon for hours. Stranded far away from any civilisation, that night reminded us of our primitive bond with Mother Nature.

DAY SEVEN - NULLARBOR TO NORSEMAN

There are very few places on earth from where a person can witness both sunset and sunrise and our Nullarbor tent was one of them. Fortunately, we are now one of those few who have witnessed that. Day seven was all about driving, driving and just driving.

Between the stretch of Ceduna to Norseman, there was literaly no trace of civilisation other than a few road houses to support the commuters. Our best guide was a booklet called Nullarbor, which had a full Map, location and distance of the road houses, information about the roadside emergency telephones and source of drinking water.

Following the map (Nullarbor), we started driving towards west on Eyre's Highway. After travelling a few kilometres, there was a 4WD track which went straight to *'COOK'*. Cook, known as The Ghost Town, is the only scheduled stop on the Nullarbor Plain for *'Indian Pacific Passenger Train'* and has a permanent population of Four People.

As we travelled further, the road-signs kept reminding us that the Border of Western Australia was just less than 200 km away. Although, before crossing the border, we had three distinct lookouts of Bunda Cliffs which couldn't be ignored.

The three different lookouts of Bunda cliffs were

Figure 11 - Bunda Cliffs

diverse in nature; one view was overcast view, the other one was bright and sunny and the third one was from the tip of the cliff. After witnessing that gigantic architecture of nature, we felt ourselves insignificant and we bet that from the beginning of time no one has ever dared to put their foot down that cliff.

As we reached the quarantine checkpoint of Border Village, we did not miss the chance to take a s*elfie* with BIG ROOEY II. Big Rooey II was a giant Kangaroo guarding Nullarbor Link's sixth golf hole called Border Kangaroo.

After an accurate checking, the quarantine officer gave us a green signal to go ahead and we were excited to enter Western Australia through road. The first town in Western Australia was Eucla. In early 20th century, Eucla telegraph station was one

Figure 12 - View from Eucla

of the busiest stations which kept Western Australia connected with the rest of the world. But slowly the glory faded away. We took some time to visit the ruins of the Telegraph station which was in the middle of sand dunes.

We were back on our journey and another 160 km drive took us to Madura Pass. There was a lookout point at Madura Pass which provided a view of the Roe Plains. It looked like a giant grey carpet with scattered green dots, formed by bushes and there were dark patches imprinted by the shadow of floating clouds.

Driving through Nullarbor is a test of your patience, because there is little or no change in the surroundings. Sometimes we felt like we were going through the same place and same time again and again, as if we were stuck in a labyrinth. Sometimes we witnessed emus crossing the road or we were trying to get a glimpse of the "*Nullarbor Nymph*".

Soon we saw a road sign that the next 10 km of the road can be used as an emergency air strip. Sharing the road with aeroplanes or charter flights was a bit different from our daily routine, but we did not have to share it in the end. Royal Flying Doctor Services usually use that road for emergency services.

Nullarbor Plain was known to Aboriginals as 'Oondiri', meaning waterless. Surprisingly, our next destination was carrying a different legacy. Cooklebiddy gained its international reputation as the home to one of the world's largest cave systems. Nullarbor caves are very popular, although dangerous, with Cave Divers.

Cave diving is an elite type of diving which needs rigorous knowledge and expertise and is completely different from normal diving. The divers need to be very cautious as they cannot resurface, it is likely they might lose direction and most of the time it is dark, but there are many divers who pivot their life on cave diving.

After driving further for a few kilometres through the treeless plain, we stopped at '*Caiguna Road House*' to refuel and get food. It is worth mentioning that Caiguna comes under a new time zone. Although we shuffled ourselves in so many time zones, we completely relied on the sun's Clock.

In the course of our journey through Eyre Highway, we came across so many interesting road signs and another one was waiting just outside the Caiguna Road House, '*90 MILE STRAIGHT ROAD - Australia's Longest Straight Road*'. In that segment of the road, driving was easy as we neither touched the steering nor looked at the speedometer.

The next roadhouse Balladonia was more than 150km away and had a very catchy tag line –

"*Perfect rest stop for travellers, even Skylab rested here*". Skylab was a US space station which crashed in Balladonia in the 1970s; the road house has a small museum which displays the debris of Skylab.

We were still 200 KM away from our destination. We kept driving as if the road was never going to end and it was the pathway to the end of the world. Still, our traveller's instinct made us take a turn towards the Newman Rocks; very little did we know that it was going to bring back our energy. It was a deserted elevated Hill Top with a rock pool in the middle of it. The mesmerising

Figure 13 - Rock-pool at Newman Rock

reflection of the evening sky in the mirror like water is still lingering in our minds and it will never fade away. There was a small fireplace adjacent to the pool and we envied those who'd lit the fire in the night and gazed at millions of stars in the sky.

Getting nearer to our destination, we got to an Oasis in the Outback named "*Fraser Range*", surrounded by the world's largest Eucalyptus Hardwood forest. It was the perfect spot for bushrangers to put their *Billy Can* and sausage into the campfire or someone might choose to spend a night in the Historic Stone Shearers Quarters. From that point on we bid goodbye to the Nullarbor Plain and we reached the western end of the Eyres Highway- Norseman.

After a long drive of more than 1000km, there was no energy left to nail the pegs and so this time we checked into a small chalet. We reinvented happiness in every small creation of the civilised world that night.

DAY EIGHT- NORESMAN TO ESPERENCE

Before starting our usual travelogue for Day 8, it is worth revisiting one of the landmarks from yesterday's long journey. When we reached the western end of Eyres Highway, there was a road direction sign with *Adelaide* written on it. The snapshot immediately took me back to 2012 Easter, when Amit, Shabaresh, Subrata and I had made a road trip to Kalgoorlie and Esperance. We had come across the same road sign back in 2012 and had wished to cross that mysterious road, and now in this moment it felt like the loop had been accomplished.

Day 8 was all about Esperance and its heavenly white sandy beaches, arguably the best ones in the world. After a couple of hours' journey, we reached Esperance around 10 am. This voyage was the fastest of all the trips we'd made, our campsite was booked from 2pm, and so we decided to take a tour to *Cape Le Grand National Park*, which was a half hour drive from Esperance.

The first stop in the national park was Lucky Bay.

Figure 14 - Lucky Bay

The moment we saw the shore, we were spellbound to see such a magic of nature: deep blue water surrounded by white shining sand and clear bright sky. Lucky Bay is repeatedly named as Australia's whitest beach and most of the '*kangaroos on the beach*' pictures are taken in this place. Another hidden gem 'Thistle Cove' was only a few minutes away. Strange rock formations and picnic tables were placed in such a manner that it felt like having your supper at the end of the world. There was a peak named '*Frenchman's Peak*' within the park which showcased an amazing view of the Cape Le Grand National Park. It is also an important place in history of the local Aboriginal Mythology wherein the peak personifies an Eagle named Mother Walich, who guards the whole National Park. As we progressed through the National Park, we came across many beaches and each one's beauty out-shined the earlier ones'. In our next destination '*Hellfire Bay*', which we considered to be our private swimming pool as there was no one other than us, we completely pampered ourselves. We

started playing and swimming in the crystal clear water and it felt like we were floating in air and there was nothing beneath us.

After a well spent time in Cape Le Grand National Park, it was time to set up our home, so we drove back to our campsite. Much has been spoken about the beautiful and adventurous places we'd visited but little credit is given to our campsites. All the campsites we came across on our coastal route were beautiful and distinctive in nature. Our current campsite was located in the midst of tall pine trees overseeing the port of Esperance.

Without wasting much time and having our lunch on the go, we set for the 38km circular loop named '*Great Ocean Drive*', traversing through some of the most beautiful coastal scenario Australia has to offer. The first stopover in this loop itself was one of its kinds. *'Rotary Lookout',* situated atop a hill, offers the viewer a 360-degree view of Esperance and its surroundings. The sea surrounding Esperance was soothing and exceptionally blue and it made us feel like we were

Figure 15 - View from Rotary Lookout

looking at nature's photoshopped landscape. The water was so calm that islands and submerged rocks appeared to be floating in the panoramic backdrop. The enigmatic view of this lookout put a spell on us which dragged us again to the same place under the starry sky.

Earlier we'd mentioned that Esperance is all about pristine white sandy beaches, and in this loop we encountered a few of them. Twilight Beach, voted as Australia's best beach in 2006 topped the list following by others like Lovers Beach, Blue heaven, The Salmon Beach, Nine Mile Beach and the list goes on. Esperance Beaches could have been in the league of Miami, Hawaii, Bahamas or Bondi but due to the freezing current of the Southern Ocean and their isolated location, make these beaches more private and pure.

After making a small stop at the marvellous Pink Lake, we closed the loop at the jetty at around sunset. We calmly sat on the bench top which was at the end of the jetty. At that moment, there was nothing to talk or nothing to do but to feel the fresh sea breeze and to look up at the burning scattered clouds. We looked back on our whole journey as that night was our last night in this great trip. Before starting this trip, there were ifs and buts, slight fear and anguish, but at that moment sitting in front of the ocean, everything seemed accomplished. Rather, we started shedding tears for the places which we would never get a change to visit again in this lifetime.

For the very last time we entered our tent which had been our home during the whole journey. Silently we paid our gratitude to it before going to sleep.

DAY NINE ESPERANCE TO PERTH

With an excitement to revisit old places and friends, we started our final journey to Perth with the early rays of daylight. There is a scenic coastal route which goes from Esperance through Albany, Denmark, Walpole, Margaret River, Busselton, to Perth. But it would add two more days to our itinerary and so we took the shortest route to Perth which takes about 7.5 hours. Although this road too had its own views of the valley and lush green felids, the cherry on the cake was the view of the 'Wave Rock' at Hayden.

Wave Rock is a huge granite rock formation shaped like a tall breaking wave. There are dream time stories among the local aboriginal people that it was the creation of the Rainbow Serpent. This colossal formation of nature has a breathtaking view and we did not miss the opportunity to frame it.

Figure 16 - Wave Rock

Continuing our journey, we came across a small town named 'Corrigin'; although it was a small town but something else caught our attention and that was a Dog Cemetery, which might have been

Figure 17 - City of Perth

a shrine for pet lovers. After a couple of hours drive and passing through a dense forest, we got our first glimpse of the City of Perth from a nearby hill. We felt like explorers after rediscovering Perth. When Sangeeta Di warmly greeted us in Perth, our Lancer Odometer was showing a figure of 4700km.

When we look back at our nine days' journey, we realise that enormous things could have been gone wrong. We could have a car breakdown in the middle of Nullarbor, could have fallen ill, could have been homeless because of windy storm, could have been easy bait for shark, or could have been lost during one of our off-road adventures. But all of these looked irrelevant once we'd completed our journey. We felt proud that we took our first step against all odds, probably inspired by the words of Paulo Coelho: "*When your heart truly desires something, the whole universe conspires to help you achieve that thing, simply because it is a desire that originated from the soul of the world*."

During this solitary trip, we spent some valuable time with each other, away from people and technology, which revived us in every possible way. Although we have completed the Melbourne to Perth trip but somehow we are still breathing in the memories we'd gathered during this great journey.

Unbounded Longing

Goutam Basak

What do human beings really want? Success, money, power, knowledge, liberation…what? This question haunts us from time to time. When we don't have love, money, power, a job, a degree, the idea is that we want it and we want it badly. Basically if we think we have a scarcity of something our desire to achieve it becomes very strong — even our breath (put your head under water and stay there for a while and your body and your mind will tell you what's necessary).

There are lots of people born in African and Indian villages in the 1960s who grew up with a rudimentary education system; it was absolutely impossible for most of them to grasp the concept of computers or technology or the internet in their 30s, else, they moved to the big first-world cities. But if you go and meet those people who are still living in the villages, you discover that quite a few of them were heroes or leaders in their communities – maybe as teachers, as businessmen, as politicians, as doctors and so on. Compared to this, kids from well-to-do first-world families had no need to understand through some rudimentary method whether the water is drinkable or not.

Every want, need, ambition or idea comes to us from our immediate surroundings. Our upbringing, education, struggles in life, learnings

from our mistakes, people, situations, offerings from mother nature make and shape the way we explore and understand the world.

Every human being, wherever they are at the moment with knowledge, money, space, power or any other thing - they get used to it after a while. They experience the good and the bad or rather, its reality and its consequences. If they enjoy the good, they can carry on with it and if after reaching a point they don't like it, they choose a different path. There is nothing wrong about it because this is the basis of human nature - unbounded longing for anything and everything. Stopping, restricting or holding back this unbounded longing (money, job, social status) by physical means doesn't work, since it is just like life – free, abundant and whole all the time.

When a child is born only one thing drives them – curiosity. They want to learn everything, from learning to walk to learning how to speak, eat, read, write. But as we grow older somehow we let our thoughts and emotions become more and more cemented. We develop a personality, which is nothing but a rigid fragile superficial shell.

Kids work with a very simple philosophy – "If one method does not work, try a different one". This is the basic human nature, but as we grow older, our surrounding influences start making it difficult for us to be as fluid as these kids, wherein we start acting according to whatever the situation demands and not according to what we think is right. All the leaders from around the world who we respect - based their actions on what they thought was right at the time. Their motives were to serve and make others' lives better, a purpose which was greater than their own lives.

So it's essential to understand how we lead our lives. The more we live compulsively, the more this enquiring and open mindset fades away and we end up cementing our notions and become rigid about our perception of reality, thus becoming fragile. If you live in a seeking and open manner, full of curiosity, you will always remain in a constant mode of exploration of this world and your potential. Only in this way can you be on the path of unbounded longing, where anything and everything can be explored and you are free to move on to the next one. The definition of success and failure becomes irrelevant; more exploration means more enjoyment, more enjoyment means more happiness, more happiness means more productivity and more productivity means more results that lead to success.

"Everyone wants their life to be pleasant. When we say pleasant, pleasantness happens in five different ways.

If your body becomes very pleasant we call it pleasure.

If your mind becomes pleasant, we call it peace; if it becomes very pleasant we call it joy.

If your emotions become pleasant we call it love; if they become very pleasant we call it compassion.

If your life energies become pleasant we call it bliss, and if they become very pleasant we call it ecstasy.

If your surroundings become pleasant, you call it success.

This is all you want, isn't it?" – *Sadhguru*

Mother

Shonali Gupta

A baby was born
In the shadows of the slum,
The mother wept as she looked
At the innocent babe
In her arms,
In silent despair she thought
What can I give you little one?
My daughter, my own flesh and blood,
How do I protect you?
From the doomed impending future,
A dark gloom that awaits you.
Washing dishes at seven,
Running errands at the local chai shop at nine,
At fourteen-
Running off with the man
Who promises you the stars?
Promises you dreams of a loving home,
Marriage and laughter.
To be sold by this very man
Into prostitution and shame.
No, never whispered the mother.
No my little doll,
That was my life, my past, my nightmares.
I promise you my darling daughter,
And the first rays of the rising sun is my witness,
I will beg, borrow or steal, if I have to,
I will move heaven and earth if I need to,
But a glorious radiant future awaits you.

A Father's Letter to a Daughter

Chris Mallika Bhadra

Dear daughter,

I fall short of words to describe the joy and grandeur you have brought into my life ever since I saw you. You were born little and tiny but the excitement in my life was uncontainable. I was initially nervous and my hands trembled to hold you, but slowly and steadily you gave me the strength and the confidence to keep trudging along. The age of my parenthood kept growing as you bounced your way through from being a little girl to a modern young lady of your time. I see my reflection in you and you personify the faith and the trust I had and will always have on my child. Now that you are grown up and are ready to take on the challenges life throws at you, allow me to pen down a few lines I have meaning to tell you since a long, long time. Your mother might have different things to tell you, or probably warn you about. But this letter will just talk about *you* and *me*.

You always were a very quiet and a reserved child. But at times your bubbliness used to brighten up the whole household. Coming home from work used to be my favourite time of the day since it was the time I could play along with you and share my day's routine with you. Often you used to come crying and with your tiny hands complain that mother was upset with you. Your tears used to pierce me like tiny little swords, but then I used to make both of *us* realize that this world is full of harsh realities and we should always face them with a brave heart. It always amazed me to see how you used to cheer up afterwards and run around being your usual self. Before I could realize the passage of time, you had started to come out of your parents' shadow and acquired your own individuality. Although you used to showcase your own talents, it brought me sheer pleasure when would people

compliment how you had taken after me. I have been told innumerable times that your mannerisms match that of mine and that you are a miniature me! I used to feel exhilarated and on top of the world. You used to call me your 'super daddy' and there were so many roles for me to perform- a superhero, a tent maker, a story teller and hide and seeker. But, if you asked me, I would close my eyes and tell you that my best play time was when you dressed me up, tied my hair, put your mother's lip gloss on me and decorated my eyes. Now that these jobs have taken a temporary hiatus for me, I can't wait to be your muse once more. Let's play again someday, shall we?

You are a grown individual today with your own niche to carve. Although you have just sailed your boat towards greater goals in the sea of life, I have to appreciate your undeterred efforts for all that you have achieved at such a young age. I was only able to do half as much as you did, at my time. But you have to always remember that life is all about ups and downs and no success will come without its fair share of failures. It will show you good people and bad people but you must always trust your brain and heart to steer clear through them. Keep your head held high and always follow the longer route to success, for it is the way which will keep you real and grounded. Also remember: never reveal your emotions to a stranger. Some people may lend you a shoulder to cry on in your delicate times, but look carefully before believing. Someday you might meet the man of your dreams and he may take my place. Always make sure that he is the one for you and don't rush into it. It would be your life's biggest decision and I want you to keep your eyes and ears open when you choose that person. Your happiness and a successful family are the only things I have ever wanted in life.
Lastly, no matter what happens, I want you to remember that I will be always there for you as your knight in shining armour. I may not be physically present around you one day but you would always find me eternally connected to you. Do not cry when I go, because I will always come back to you in one form or the other. Be loving, be successful, hold your head high and always trust your instincts. As they say, go and rock the world!

Love,
Daddy

Alpana - and back to its old roots

Chondryma Chakrobortti

"*Maa, ki korcho*?" I asked her with utmost curiosity.
She looked gorgeous today in her off-white saree with *laal paar* (the traditional Bengali attire for every religious celebration) and the golden *jhumkos* which *dida* had gifted her for Durga Pujo. Her hands were covered in a white paste, holding a soft cotton-ball which she occasionally dipped in the *kanshar baati* kept beside her.
"I am making *Alpana, shona*. Do you want to add some dots to these patterns?", she asked.
That seemed like an interesting thing to do this afternoon. So I added some dots to where the lines were defined.
"Oh! That looks beautiful, Maa. Can I draw some animals now?".
Maa looked at me with her prettiest smile and replies, "Let the animals be for your drawing sheets and let me teach you some traditional art for the *Alpanas*!"
Brimming with confidence, I wanted to learn something new today which I could flaunt in front of the other girls in my neighbourhood.
So my first lesson on *Alpana* began with a freehand drawing of *Lokkhi's paa* with the letter "S" and I became a perfectionist at it in no time.
"That's easy, Maa!" I claimed.
And I kept drawing several *Lokkhi's paa* on every flat surface I discovered that afternoon – *dadai's* study table, *thammi's* old trunk, on top of *kakai's* tape recorder, *baba's* bookshelf, stairs, floors, *thakurbaari*, *uthaan* (veranda), everywhere.
And the rest of my family did not mind because *dadai* (an *aadure* / loving name for Grandfather)

said "*Baarite shob jayegaaye amader chotto Lokkhi biraajen.*"
I couldn't wait for the work to dry up and glitter like pearls when we would light the *Sondhya baatis* in the evening. Maa completed her *Alpana* and went to arrange *bhog* to offer to the deity in the evening.

It's evening and the *dhuno* smoke has engulfed the roof. I wear my new dress and rush to the *Thakur dalaan* and *uthaan* (veranda) to see how my dots and *Lokkhi's paa* look amidst glittering *baatis* and the colourful flower garlands which adorn our whole house.

Suddenly Maa calls my name, "*Anjali dibi aaye*".

It is *Lokkhi Pujo* today after 20 years and as I look outside the window at the full moon in the Melbourne sky, it is as if I can still hear Maa calling my name and saying, "*Anjali dibi aaye*".
Being a working weekday, I reached home late and had to settle for the 'stick-on' motifs for the floor instead of Alpanas, how depressing!

As I prepare for *lokkhi pujo* for the evening, I go back to the *kojagori lokkhi pujo* of childhood, maa's *laal-paar shaaj*, our *thakurbaari* adorned with the marigold flowers and their fragrance, *maa-thamma's bhoger proshaad…* and her intricate *alpanas,* that I miss the most.
When I called maa in the evening and sent her pictures on WhatsApp, she smiled and said "Alpona stickers? *Etaa abar kobe abishkaar holo*?"
"Do you know why we make *Alpana* during our *Pujo* and *Biye*?" Maa added.

Oh, I'd never thought about that.
"*Keno Maa*?" I asked curiously.
"*Tahole boli shon*…", she continued.

THE ORIGIN

Alpana or (Alpona in Bengali) is derived from the Sanskrit word Alimpan, which literally means whitening or painting (of walls, floors etc. on festive occasions). It is believed that Alimpan practice existed even before the Vedas did; locals in various parts of India used paints and scribbling to appease their gods.

The Vedas described many rituals and as time went by, local rituals and religious practices like Alimpan merged into other practices and eventually permeated the folk traditions all over India. Alimpan itself spread by breaking off into many regional tributaries, becoming Alpona in Eastern India, Rangoli in Western India and Kolam in Southern India and was further diversified and enriched by the numerous subcultures of each area.

"*Oh tai naaki*?"
I had heard those names before but never knew how Alpona, Rangoli and Kolam connect back to the same roots.

Maa continued.

THE PURPOSE

Alpona is a quintessential element of Hindu occasions of joy or festivity and mostly used in weddings, harvest celebrations and pujas. Practiced primarily by the women of the household, Alpona is a form of worship or *pujo* based on an old traditional belief that the artist would express her deepest desires to the deity being worshipped who may fulfil these desires; so an Alpona design placed at the seat of worship ensured her wishes would come true.

"And I am sure *Maa Lokkhi* would have listened to the desire you expressed 20 years back while making those tiny dots and thinking of learning more about this art form".

"You are an exceptional artist today, shona".

I peeled the motif sticker off the floor as I listened to maa say this.

"Maa, can I call you back in a while? I would like to know more about it".
"Sure dear". Call disconnected.

I ran to the kitchen to find my old *kashar baati* to mix *aatop chaaler guro* (rice powder) with water.
Dipped my make-up remover cotton-balls in the rice paste and started creating my Alpona – the best Alpona I had ever made!

Maa called back asking, "*Ki korchhili?"* (What were you doing)

"Oh, I just remembered something", I claimed.

Maa continued, "*Jaa bolchilaam……*"

ALPONA AND HARAPPAN CIVILISATION

"*Tui toh* Civics *porechhish*?"
Do you know that the motifs and designs used in making Alpana today have their parallel in the motifs seen on pots and vases of Mohenjodaro and Harappa?

"*Shotti*!?" I said as I dipped my four fingers into the rice paste.

Drawn in freehand style and depicting the hopes and wishes of one and all, the beautiful tradition of Alpana has educated and bonded communities for at least 40,000 years now. Each design and motif used in drawing a traditional Alpana has a meaning, a purpose to serve. Let me decode some of the Alpanas for you which I have learnt in a recent workshop organised by Rabi Biswas and his grandmother in Nadia district -

1. *Purnipukur Broto Alpona* – This is usually made by unmarried girls in the month of *Baishakh*

(April-May) to invoke the goddess to keep the lakes and ponds in their community filled with water and their soils fertile.
2. *Dosh Putul Broto Alpona* – An Alpona depicting 10 dolls holding hands in a circle, it reinforces the feeling of harmony in a family.
3. *Shejuti Broto Alpona* – This Alpona involves drawing 52 motifs that include everyday items such as household utensils and tools used in various professions in a community. Also included are birds, animals and plants, among other things. "Even 5-year-old children can draw this alpona, thus it becomes an educational tool for the child to learn about objects" Maa claims.

"Maa, then why did you not allow me to draw an animal 20 years back for Lokkhi Pujo?" I poked Maa.

"Shona, Shejuti Broto is mostly observed in remote villages these days, where books are not readily available and we draw Alponas to educate children of that age. Moreover, the only animal to be accommodated in a Lokkhi Pujo Alpona is an owl which would have been tough for you to draw at that age, *tai na*?" Maa replied patiently.

She continued decoding other forms of alpana.

4. *Lokkhi broto Alpona* – Now comes your favourite - Lokkhi broto Alpona. This is drawn to invite the deity of wealth and prosperity, and is perhaps one of the most popular forms being practiced today. It uses motifs such as the owl, lotuses, paddy bins, footprints of the deity and climbers.

"And it all begins with learning to draw footprints of *Lokkhi* from the letter S" I exclaimed like a child.

5. *Prithibi broto Alpona*: This Alpona worships nature and makes use of motifs like lotus and conch shells. "Unmarried girls do this ritual and Alpona, praying for peace on the planet and a good life-partner," says Maa.

"Do you remember how different the Alpona was last year when I had invited you and Babai for *Jamai Shasti*?" Maa questioned.

"Did it have a cat and betel nut?" I answered in a confused state.

Maa continued.

6. *Aranyo shashti broto Alpona*: Also called the *Jamai Shashti Alpona*, this Alpona has the motif of a cat and invokes the forest goddess and is drawn in the month of Jaishto (May-June). "The mother-in-law draws this Alpona in the kitchen and invites her son-in-law for a meal, wishing his family wealth, prosperity and a healthy life," said my proud mother in a loving tone.

While Maa beautifully described the last form of Alpona, I almost completed my design on all

sides, making sure that the essential elements are placed correctly in the prescribed orientations.

"*Shona, tui ki alpona dicchili*?" Maa asked in a hushed tone.

"But how did you guess?" I asked.

Maa had a smile on her lips as she said this, "*Khub shundor hoyechhe re*. Perhaps one of your best".

I smiled to myself and said "*Chhobi pathachhi*. Happy Lokkhi Pujo."

Credits: 1st picture from Google Images
Remaining pictures and Alpona art by Chondryma
Information on Alpana forms: Wikipedia

Every One of Us is a Freelancer

Chris Mallika Bhadra

Ever since I was a little child, my parents were obsessed with this doctor in our neighbourhood. They never stopped praising her ability as a doctor, the nobility of her profession or the human nature she possessed. Gradually, this discussion became a part and parcel of our existence. Knowingly or unknowingly, she became a silent member of our household. Days, months and then years passed and I grew up in complete awe of her, thinking every second of metamorphosing into her. As a little girl, I had promised myself to be like her. It was as if everything about her attracted me like a giant magnet. It was as though I *had* to not only become like her as a person, but also become an able doctor like her.

Years on from that day, I realize that I have become a completely different individual than what I had planned to 20 years ago. My dreams, aspirations and outlook have taken an altogether different turn from the road that was originally laid down for me. It's only now that I sit back and realize that we are nothing but blueprints of a greater design. We all evolve from a basic

architectural plan and keep on adding strategies and layouts on the way. These strategies sometimes get modified and sometimes are deleted, only to form new ideas along the way. We all grow up with an idea of who we want to become, but in the end we become something we wanted to and something we probably desired on our way. However, the journey does not stop here, we continue doing things that please us or soothe our minds all our life. A little bit of this and a little bit of that.

It all boils down to the fact that we are freelancing in every sphere of our lives, be it our families or

the career paths we embark upon. We need to continually evolve from our previous skins to keep moving forward and keep swimming. Over the course of time, we develop our own working styles to create our own free zone in the midst of a racing world. Freelancing within a strict regime is sometimes both useful as well as much needed as it helps to break the mundane existence of life. It also helps usher in creativity in the pre-destined walk of life. We have to walk ahead in this life which has been bestowed upon us, so why not give it some dash of fun and frolic? If a tiny leaf has the freedom to emerge out of a listless wall, why can't we?

Human beings are vegetarian by nature

Sushant Chakravarty

It is my view that the vegetarian manner of living, by its purely physical effect on the human temperament, would most beneficially influence the lot of mankind – *Albert Einstein*

This is dreadful! Not only the suffering and death of animals, but by eating meat man suppresses in himself, unnecessarily, the highest spiritual capacity-that of sympathy and pity towards living creature like himself- and by violating his own feelings, become cruel – *George Bernard Shaw*

While we ourselves are the living graves of murdered animals, how can we expect any ideal conditions on the earth? Animal are my friends and I don't eat my friends – *Leo Tolstoy*

I have from an early age adjured the use of meat, and time will come when human beings will look upon the murder of animals as they now look upon the murder of men – *Leonardo Da Vinci*

==========

Those delicious morsels of food we pop into our mouths eventually develop every cell of our bodies and affect not only our physical health, but the way we think as well. Experiments have shown that certain food directly influence the working of brain by affecting brain's chemical neurotransmitters which are involved in different mental and physical functions; memory, sleep, motor coordination, pain, depression, learning ability. Food is permeated with their own subtle vibrations at different frequencies, which in turn affect the body and mind of the person eating them.

World health statistics show that nations which consume the most meat have the highest incidence of disease (heart disease, cancer) and groups of vegetarians in different countries have the lowest incidence of disease.

British and American scientists studying intestinal bacteria of meat eaters as compared to vegetarians have found significant differences. The bacteria in meat eaters' intestines react with digestive juices to produce chemicals, which have

been found to cause cancer. In USA bowel cancer is the second most common form of cancer (next to lung cancer). In Scotland, consuming more beef, rate of bowel cancer is highest in the world.

Eating meat has often been called "Eating on top of the food chain". Plants eat sunlight, Animals eat plants, Carnivorous animals & human beings eat animals. The poisonous chemical fertilizers and pesticides are retained in the body of animals that eat plant and grass. Eating at the top of the food chain, humans become the final consumers and thus recipients of the highest concentration of poisonous pesticides. Meat contains 13 times as much DDT as vegetables, fruits and grass. Study by Iowa University has showed that average concentration of DDT in the bodies of vegetarians was less than half than that of meat eaters.

Animals are treated with chemicals to increase their growth, fatten them quickly and improve meat color. They are force fed, injected with hormones to stimulate growth, given appetite stimulant, antibiotics, sedatives and chemical fed mixtures. Many of these chemicals in meat and fish can cause cancer and many other diseases, deform unborn baby and cause harm to pregnant women and small children. Thus pregnant mother should be especially careful of their diet to ensure mental and physical health of their new born children.

Heart disease is most common in societies where much meat is consumed. What is it that makes meat so harmful to the circulatory system? The fats in animal flesh, such as cholesterol, do not break down well in the human body and instead begin to line the walls of the meat eater's blood vessels. With the process of continual accumulation, the opening inside the vessels gets smaller and smaller as the years go by, allowing less and less blood to flow through. This dangerous condition is known as Atherosclerosis, which places tremendous burden on the heart that pumps harder and harder to send blood through clogged and constricted vessels. This result in high blood pressure, strokes and heart attacks.

As soon as the animal is killed, proteins in its body coagulate and self-destructing enzymes are released (unlike slow decaying plants which have a rigid wall and simple circulatory system). Soon after the death ptomaine is formed. Animal/ bird flesh, fish, eggs have the common property – extreme rapid decomposition and putrefaction. By the time the animal is slaughtered, placed in cold storage, aged, transported to the butchers' shop, purchased and brought home, stored, prepared and eaten, one can imagine what stage of decay one's meal is in. Meat passes very slowly through the human digestive system, which is not designed to digest it.

By nature, human beings are vegetarian and the anatomy of human beings are different from carnivorous animals (Refer Table 2). It takes about five days to pass out of the body as opposed to vegetarian food, which takes only 1.5 days. During this time the disease causing products in decaying meat are in constant contact with digestive organs. The habit of eating meat in its characteristic state of decomposition creates a poisonous state in the colon and wears out the intestinal tract prematurely. Meat eaters load their body with urea and uric acid (nitrogen compound). Beef steak contains 14 gram of uric acid per pound. Kidneys of meat eaters have to do 3 times the work to eliminate poisonous nitrogen compounds, compared to vegetarians.

When the kidneys can no longer handle excessively heavy load of meat eating diet, the unexcreted uric acid is deposited throughout the body. This is absorbed by the muscles like sponge soaks up water and later it gets hardened and forms crystals. When this happens in the joints, painful conditions of gout, arthritis and rheumatism results. When uric acid collects in the nerves, neuritis and sciatica result.

One of the worries of people when they think of adopting a vegetarian diet is "Will I get enough nutrition without eating meat? Will I get enough protein?". Since most of our body tissues are made of protein, it is necessary for growth and repair and also an important component of the hormone and enzyme system in our body, which

direct and regulates many of the body's processes. It is essential to build antibodies in the blood and fight infection and diseases.

Too much protein is harmful to health. Many people think that we need to eat a great deal of protein during the day, especially if we are active. We have been conditioned often by massive advertising campaign to believe that meat eating is essential for health. This is a great misconception. We need far less protein than we think we do. Recent medical research has proven that eating too much protein harms the liver and kidneys and causes many diseases. Millions of people in wealthy industrialized nations consuming tremendous quantities of meat are actually eating 2—3 times the amount of protein they need. The excess is converted into carbohydrates and stored as fat. Thus over 50% of Americans are overweight and prone to many diseases directly related to obesity.

Another great misconception is that vegetable protein is inferior to meat protein. Vegetable proteins have been found to be effective and nutritious. Soybean - incredibly rich in protein - has twice the amount of protein found in meat. Soybean has 40% protein, whereas even the leanest cut beefsteak has only 20% usable protein. Many nuts, seeds and beans contain 30% protein. Proteins are constituted from smaller molecules called amino acids. When protein is ingested, it is broken down into constituent amino acids which are then utilized individually or reassembled into various types of proteins that the body needs. There are about 22 amino acids of which 08 are called essential amino acids. If any of these are missing, others cannot be utilized, thus all 08 essential amino acids have to be present in the same meal in certain proportion. If the proper proportion is lacking, the remaining amino acids are correspondingly reduced, consequently the body receives less available protein for its use.

More than a billion people every day eat a source of protein which has only recently been discovered in the west- Tofu, made from Soybeans, one of the most nutritious and inexpensive foods in the world. Soybean has been variously called the magic plant, yellow diamond, miracle bean, gold from earth and meat that grows on vines because of their high protein content and richness in vitamins and minerals. Soybean contains twice as much as protein as the same weight of meat with all essential amino acids in proper proportion (Refer Table 1)

Table 1: Protein- The building block of life?

FOOD (100 gm.)	Grams of protein
Soy milk (powdered)	41.8
Soybean dry	31.4
Milk (powdered)	26.4
Peanuts	26.0
Beans	24.7
Beef	20.2
Chicken	18.6
Lamb	16.8

Is it natural for human beings to eat meat?

Meat Eater	Leaf-grass eater	Fruit eater	Human beings
Has Claw	No Claws	No Claws	No Claws
No pores in skin, perspire through tongue	Perspire through millions of pores on skin	Perspire through millions of pores on skin	Perspire through millions of pores on skin
Sharp, pointed front teeth to tear flesh	No sharp pointed front teeth	No sharp pointed front teeth	No sharp pointed front teeth
Small salivary glands in the mouth, not needed to	Well-developed salivary glands, needed to	Well-developed salivary glands, needed to	Well-developed salivary glands, needed to

predigest grains and fruits	predigest grains and fruits	predigest grains and fruits	predigest grains and fruits
Acid saliva, no enzyme ptyalin to predigest grains	Alkaline saliva, much ptyalin to predigest grains	Alkaline saliva, much ptyalin to predigest grains	Alkaline saliva, much ptyalin to predigest grains
No flat back molar teeth to grind food	Flat, molar teeth to grind food	Flat, molar teeth to grind food	Flat, molar teeth to grind food
Much strong hydrochloric acid in stomach to digest tough animal muscle, bone etc.	Stomach acid 1/20th less strong than meat eaters.	Stomach acid 1/20th less strong than meat eaters.	Stomach acid 1/20th less strong than meat eaters.
Intestinal tract only three times body length so rapidly decaying meat can pass out of body quickly.	Intestinal tract 10 times body length; leaf and grains do not decay as quickly so they can pass more slowly through the body.	Intestinal tract 12 times body length; fruits do not decay as rapidly so they can pass more slowly through the body.	Intestinal tract 12 times body length; fruits do not decay as rapidly so they can pass more slowly through the body.

Art Trip to Central Australia

Dipankar Sengupta

This was my humble abode for two weeks in East MacDonnell ranges

These unique ancient aboriginal petroglyphs are found on the remote tracks near N'Dhala Gorge. Since unlike other aboriginal rock paintings no colours have been applied, it is not possible to do C14 dating. My guess is they predate more common aboriginal rock paintings.

Sunrise from my tent in East MacDonnell over the oldest seabed in the world.

Our outdoor kitchen at Ross river station. Also our open air library and place of 'adda' during the day and place of camp fire in freezing desert nights.

My friends Peter and Richard clambering up the loose rocks to the hill known as Sphinx, a mere 550 million years old.

At N'Dhala Gorge, NT

In the Gigee forest - these huts are used for corporate bonding sessions. The managers are left with supplies and no transport to do their exercise. The place has high tech shower with hot water contraption but no toilet, a thing we really needed. Gerry, our guide, said, "What's the problem? There's plenty of trees." It is also popular for aboriginal initiation sessions.

A Day at the Trephine Gorge.

These gorges are usually dry. Some gum trees take the risky strategy of growing on the sand as water is not too far underground. Then when flood comes they run the risk of getting uprooted. They even have a strategy for that eventuality as you can see in the second picture. They sprout new vertical shoots. Notice the black marks on the further gorge wall - it is not artistic license taken by me. It is the deposition of Eucalyptus oil over millions of years.

Bush Service Station

Our guide and driver Gerry spent forty years crisscrossing Northern Territory and could navigate without maps or GPS. His knowledge of rocks, birds, animals, trees and shrubs of NT was encyclopaedic. It was from him that I learnt about tufts of a special grass that abounds in NT. They were brought in by Afghan cameleers 150 years ago to feed their camels. Now 150 thousand odd wild camels in central Australia thrive on them. Camels with soft paws do not destroy the land like cattle and horses with hard hoofs do but they are drinking the water holes dry. Is it time to start having camel meat?

Encouraged by Gerry we scrambled up the unstable hills and jumped into unmarked holes in ground that he insisted were unique caves. Since the average age of the group was 70 plus, we had our fair share of spills and falls. With three nurses in the group and the biggest first aid kit at hand, no serious damage was done. One lady sprained her right thumb, but she was left handed so her paintings didn't suffer. Another artist fell flat on rubble. There was more blood than actual damage. She said her ego suffered the most. When we returned, the cook and kitchen hand rushed out. "What happened?" Before she could respond, Peter said, "You should have seen the other guy. He was carried away in a stretcher."

Stromatolites

We found this 450-million-year old rock on a hill full of them. They are the ancestors of the present-day blue-green algae. They grew during the day in the direction of sun. At night the dust and water lapped on top. In this way the cylindrical structure was formed. Since they grew towards the sun, and as the sun moved from north to south, the axis of growth was tilted. Today under the microscope, their day to day growth can be followed and guess what – 450 million years ago, 400 days made a year. It's true, I am not joking.

On the last day, after the outdoor exhibition was over and the last drop of drink drained, I sat down in front of my tent as dusk fell over the landscape and thought, real Australia is here, not in the skyscrapers of Sydney or at the manicured gardens of Melbourne. The heart of this ancient land beats in the red dust of its center.

দুই বোন

ত্রিয়া সিনহা

Bengali Lady
Sanjoli Patra

Sydney
Mithilesh Kar (6 yrs)

Cat Art
Rishab Mitra (7 yrs)

Doodle Creative Realistic Animal (Cover Picture)

Sreeparna (Trisha) Das (14 yrs)

The exercise is to make a creative doodle piece combined with realistic animal (Owl) added in colour to bring out the contrast of the depth of the drawings. This ART exercise was inspired by a "doodle" artist Kerby Rosanes who works mainly with different lengths of black fine liner to illustrate a "doodle" world which is usually characterized by whimsical lines, patterns and small fine details.

Acrylic Paining

Sreeparna (Trisha) Das (14 yrs)

Aboriginal Art

Rishan Deb (8 yrs)

Mermaid

Tiasha Sahu (7 yrs)

FESTIVAL

Rishab Mitra (7 yrs)

Fun and
Exciting
Special days
Time for treats
Interesting rituals
Volunteering to help
Amazing events
Love all of it

An acrostic poem is a type of poetry where the first letters in a line spell out a particular word or phrase.

The Line of Fire

Tamoghna Datta (Grade 11)

It's a sense of humanity lost,
Justified by the notion of victory,
With death and destruction embossed,
What drives such unrelenting misery?
Upheaval and turmoil to settle a difference,
Tightly shut is reasoning's door,
Pride and ego fuelling the ignorance,
A dreaded phenomenon, we know as WAR.
When some find pride among the chaos,
Others cry from pure dread,
Surrounded by insincere pathos.
For how long has such hatred been bred?
The bloody storm left its impression,
Nothing to put to scale such a disaster,
For when the notion of peace is brought to question,
Could WAR ever be the right answer?

My Poverty Stricken Friend

Arushi Sen Chaudhuri (12 Years)

As I walk hand in hand with my friend,

I think of the numerous unwritten rules we bend.

Although we are alike in so many ways,

I can't help notice the difference between our days.

We do share a great love of playing vividly with dolls,

But unlike my china ones, hers are just socks filled with cotton balls.

We love to dress up with the finest clothes in our stocks.

Though her bests are merely clean rags unlike my designer frocks.

Anyway, at the end of the day these petty things are distant,

When I look deep into your eyes, so warm, playful and vibrant.

Beyond the Dawn

Nikita Bhatt (16 yrs)

A blush of crimson stains the clouds and the sun begins to rise from the depths of the horizon.
The sky is on fire.

The small village of Malan is bathed in a beautiful golden light and the sound of voices awakens me. The other side of the cot is empty...it has been since the day my brother left for the war. We needed the money and it hits me that today was the day he was meant to return, just in time for Christmas. My mother was so proud of him…until she realised she was waiting for a son who would never come home. It's been two months but time has done nothing to ease the pain. I fold the threadbare blanket that once kept me warm during these harsh winter months and leave it at the foot of the cot.
It still smells like him.

There's a small bucket in the corner and a cracked mirror. I stare at my reflection and don't recognise the girl I see. Tangled black hair runs in ringlets down her face and the olive skin on her cheekbones are streaked with dirt...and tears. I'm barely seven summers old but the face in the mirror holds the sadness of someone who's lived through years of hardship. Her eyes are dark...but not quite black. They hold worry and I know that they've seen more than they should have in seven innocent years.

I call for my mother and find her sitting outside our small, dilapidated home. Her eyes are distant and her forehead is etched with lines of worry. There's a vegetable peeler in one hand and a carrot in the other but she's still and silent...That's when I notice that her eyes are wet with tears. I try to take the peeler from her but she stops me. She points to the dirt track in the distance and I follow her gaze. There's a crowd gathering around a row of parked white vans. My English is broken but I make out the words *Operation Christmas Child* on the side of one of the vehicles.

My mother grabs my hand and pulls me towards the crowd. The carrot rolls beneath her chair but I don't notice because now she's smiling- the beautiful smile I'd forgotten lay beneath the layers of sorrow.

We're breathless by the time we arrive but she's still smiling, *laughing*. A tall man crouches down in front of me and there's something in his hands. My mother nudges me forward and he hands it to me.

It's a box, wrapped in red and green paper. *Christmas paper*. I look up and he nods. I put it down and gingerly lift off the lid.

My breath catches in my throat and my eyes widen. It's filled with… presents. I pull out a teddy bear, a colouring book with a pack of crayons… *a new blanket*, one with no holes or patches. I find a miniature wooden doll and there's a small mirror and hairbrush stuffed into one corner. It's the most beautiful thing I've ever seen.

I look back up at the man who gave it to me. His arms are pale and the skin on his face is red from the blistering sun. A bead of sweat clings to his forehead but his gentle smile never falters. I fling my arms around this stranger because this is first time my mother has smiled since *he* left. Because this is the one Christmas I'll never forget. Because the love in this little box has shown me that *someone cares*. The man ruffles my hair and stands up. He drags the back of his hand over one eye but he can't hide the glint of tears that wasn't there before.

Once he's gone, I pick up the brush and run it through my hair, a waterfall of beautiful soft ebony. My cheeks are wet but there's no sadness and I smile at the reflection in the small pink mirror. This girl looks younger, brighter and there's a spark of hope in her dark eyes... the ones that were never quite black…

The inspiration for this story has come from a charity that means a lot to me - Samaritan's Purse. Every year, this charity runs Operation Christmas Child and it does exactly what happened in the story- it brings joy to underprivileged children and their families during Christmas. This year, you can help out too. Fill a shoebox with little presents and take it to one of the many drop-off points across Melbourne. These shoeboxes are then sent to children in over 150 third world countries, including India; if anything, do it for your country! The children of today are the leaders of tomorrow. Please donate to this cause now so that they too have a reason to smile at Christmas. Thank you. ☺

My China Journey

Pritika Sinha

On the 11th of August I left Melbourne to embark on a long 5-week journey around China. It was hard knowing that for 5 weeks I was going to be without my family and the comfort of my home. When we arrived at my school's China campus in Nanjing, I wondered how I was ever going to stay there for 5 weeks. Nothing seemed to compare to the facilities in Australia. I was with a group of 57 other kids from my year level, from my school campus and another campus.

Our first few days in Nanjing were spent trying to adjust to life in a different setting. We had bike riding days and site days wherein we had to organise the way to get to our destination by trying to interpret maps that were completely in Chinese. For about 2 weeks that was our daily life. It was definitely very tiring, especially considering the high temperature and humidity.

Then we went to our first destination outside of Nanjing, Shanghai. There was a long bus ride and we stopped halfway through it at a small fishing village called Tongli that was very peaceful and quiet - the complete opposite of Shanghai; we realised as soon as we pulled into the hotel that it really was the most populous city in the world. With over 20 million people in the city, it was very noisy. But I enjoyed its hustle and bustle and business as it reminded me of Melbourne.

Walking to our restaurant for dinner at night was quite magical since although we should have looked forward, we were instead looking up at the city lights most of the time. The weather in Shanghai was a lot better than Nanjing's and the hotel we were staying at was also very nice and comfortable. At the bund, we could see the lights of the Shanghai skyline and the city did prove that it was the 'New York of the East'.

Coming back to Nanjing, everything seemed so much quieter and more peaceful, and I started to

feel like I could call it home. One of the best parts of my entire trip was definitely having the wonderful local food in Nanjing, such as pork buns, pancakes, and the amazing sweet and sour pork!

We spent a few more days in Nanjing before leaving for the wonderful city of Beijing, China's capital. But before leaving for Beijing, I spent my time in Nanjing reflecting on how I had grown and improved as an independent individual.

I also had a meeting with my home stay at this time; even though I wasn't spending the day with her until after Beijing, we got to meet and introduce ourselves to each other, which was good as it would avoid awkwardness on the actual homestay day. My homestay buddy was called Cherry, and she boarded at her school even though she lived nearby, which shows how much kids in China make their studies a huge priority. She was a very spirited and bubbly girl and I highly enjoyed getting to know her. We had other activities as well, like a 7 km run around a large and popular lake, interviewing local Nanjing people about their work, leisure and other activities.

Then came the day when we took the night train to Beijing, which was a bit uncomfortable but cozy. I fell asleep quickly and actually had one of the best sleeps that I ever had on the entire trip. Coming into the lavish and old Beijing hotel, I quickly settled into my hotel room before we were whisked away to begin the long day's fun activities.

We went to Tianmen Square, as well as Mao's Mausoleum where we saw Mao's body preserved in a glass tomb. Then we went to the Forbidden City which contains 9,999 rooms and used to be home to 24 generations of Chinese Emperors. I highly enjoyed learning about China's rich and vivid history that goes back to thousands of years. The one thing that I was very, very, very excited for, was the Great Wall of China, which for me was the best part of the trip.

The day came, and I was so excited to go to the Great Wall. Though the challenge of having to climb 1000 steps up to the wall did faze me a little bit, my fears were small compared to the sights on top of the Great Wall. The pancakes I had had before the walk also helped me feel more prepared, along with the chocolates and apples, yum!

The journey up to the Great Wall was not as physically strenuous as I had first thought it was going to be. This was most likely due to the fact that I was having fun with my friends and that we had had a few breaks along the way. The Great Wall itself was amazing and breathtaking in its unique beauty. It was humbling and made me realise how small I was compared to the whole world. But it also showed me how important history and culture are and how we must preserve it and keep it alive.

I had time to sit and soak up the peaceful atmosphere at the Great Wall, to reflect on what I had done so far on the trip and to realise how much it had changed me, how it had made me more independent and had helped me think on my feet. China is a wonderful country with a deep and rich cultural background and history but sadly this history is fading away due to western influence and the need to modernise everything.

Once again, returning to Nanjing, I was both excited and nervous about my homestay day. But it turned out to be great fun. I first went to her house where I had a few Chinese crackers and biscuits, which were delicious! Then we went to the grocery store and bought some Chinese snacks and lollies as well as a packet of chips. Then we went to a big shopping mall called 'Xinjiekou', which was huge! We did a little bit of shopping and then went to watch an English movie called "9 Lives" which was really funny. Then we had to end the day with some dinner at a local Nanjing restaurant which was amazing. I was sad to say goodbye but happy that I had had such a rare and wonderful experience.

I spent my final days in Nanjing savouring the wonderful atmosphere that I had first found uncomfortable and had thought was not better than Australia but had gradually grown to love. All the sites in Nanjing were amazing, sites such as Sun Yatsen's Maosoleum, Lion Hill Pagoda, Ming Tomb, Yangtze River Bridge, Jiming Temple and Confucius Temple just to name a few. I will also never forget the sights I saw in Shanghai and Beijing. I will remember my time in China forever and I am so grateful to have had this wonderful experience.

Why Uranium should be used in Australia?

Snehashis Sinha (Grade 8)

Recently the controversial topic of Uranium and its usage has triggered debate all across Australia. Uranium is a radioactive heavy metal which can be used as an abundant source of concentrated energy. It is a fissile material, which means it is a material capable of sustaining a nuclear fission. Fission is the process by which you split one atom into smaller parts, thereby generating energy. Uranium is very useful for many things, such as for creating energy, in medical use and for powering many nuclear transports. While there are problems with handling nuclear waste since the waste contains radioactive materials, however, these problems are manageable and outweighed by the potential benefits. Let's look at the reasons why Uranium should be used.

First and foremost, Uranium is a cheap and efficient way of creating electricity. It can be turned into electricity in nuclear reactors by the process of fission. The substantial amount of energy generated during fission is turned into electricity and routed all over the city. Studies at the university of Arizona have shown that Uranium also reduces electricity bills by 65% and can support the world's electricity needs with less greenhouse effect as it is abundant in the earth's surface. Wouldn't you want to save more money and reduce your ecological footprint? Therefore, it is apparent that Uranium must be used for energy production.

Furthermore, Uranium can also be used in medicine, which is known as Nuclear medicine. Nuclear medicine uses radiation to provide diagnostic information about the functioning of a person's specific organs, or to treat them. The most common type of radiation used is gamma rays which are high frequency electromagnetic waves that kill living cells. Diagnostic procedures using Radiotherapy can be used to treat some medical conditions, especially cancer, by using radiation to weaken or destroy particular targeted cells. Studies at the World Nuclear Association showed that 40 million nuclear medicine procedures are performed each year and that the demand for radioisotopes is increasing by up to 5% annually.

Some experts say that when extracting Uranium, other unwanted mineral ores are also extracted along with it. Uranium and the mineral ores are crushed together and then Uranium is extracted from it. All this takes place in a machine called "Yellowcake", turning Uranium into powder form. But the leftover mineral ores are contaminated with 85% of the radioactivity from Uranium. This leftover is known as nuclear waste. Experts say that we can't keep throwing away nuclear waste in dumps as it is very harmful and takes up a lot of space, and hence Uranium shouldn't be used. But what this argument fails to account for is that there is an easy way to manage this problem. One possibility is that nuclear waste can be turned into nuclear fuel and distributed to many diverse areas such as nuclear stations, nuclear powered vehicles and more. So, it is obvious that Uranium should be used.

In the end, it is now clear why Uranium should be used. It is cheaper and a more efficient way of producing electricity. It is also very useful in medical diagnostics and treating diseases like cancer, thereby saving many lives. Also, it may not harm the environment if the produced nuclear waste is managed properly. Therefore, unequivocally it is obvious that Uranium should be used in Australia.

বেঙ্গলী অ্যাসোসিয়েশান অফ ভিক্টোরিয়া (২০১৬ – ২০১৭)

Bengali Association of Victoria (2016 – 2017)

সংকলন সম্পাদকিয় দল

সম্পাদনা	অনুপ্রিয়া বিশ্বাস
গ্রন্থন	কল্যাণ ব্যানার্জী
	অনুপ্রিয়া বিশ্বাস
সংশোধন	অনিন্দ্য রায়
	শিবানী ভট্টাচার্য
	অনুপ্রিয়া বিশ্বাস
	মালবী সিনহা
চিত্রণ	অনুপ্রিয়া বিশ্বাস
	শ্রীময়ী ভট্টাচার্য
প্রচ্ছদ	শ্রীপর্ণা দাস

Sankalan Editorial Team

Editing	Anupriya Biswas
Compilation	Kalyan Banerjee
	Anupriya Biswas
Proof reading	Anindya Roy
	Sibani Bhattacharya
	Anupriya Biswas
	Malobi Sinha
Illustrations	Anupriya Biswas
	Sreemoyee Bhattacharya
Cover page	Sreeparna Das

কার্যনির্বাহী সমিতি

সমিতিচালক	অনিন্দিতা সেনগুপ্ত
উপসমিতিচালক	অপ্রতিম দে
কার্যবাহ	অনুপ্রিয়া বিশ্বাস
জনসমন্বয় আধিকারিক	শুভজ্যোতি চ্যাটার্জী
কোষাধ্যক্ষ	অনুষ্কা ব্যানার্জী
সাংস্কৃতিক কার্যবাহ	শ্রীতমা ভট্টাচার্য
সহকারি জনসমন্বয় আধিকারিক	পায়েল ব্যানার্জী
সমিতি সদস্য	অভিজিৎ দেবনাথ
সমিতি সদস্য	শমীক বেরা
সমিতি সদস্য	সৌম্য ঘোষ

Executive Committee

President	Anindita Sengupta (Mimi)
Vice President	Apratim De (Tim)
Secretary	Anupriya Biswas
Public Officer	Subhojyoti Chatterjee (Ronit)
Treasurer	Anushka Banerjee
Cultural secretary	Sreetama Bhattacharya
Joint Public Officer	Payel Banerjee
Committee Member	Avijit Debnath
Committee Member	Samik Bera
Committee Member	Soumyo Ghosh

Bengali Association of Victoria (Inc), PO Box 1332, Glen Waverley, VIC 3150

www.bavwebsite.org.au | Registration: A0021171M

©Bengali Association of Victoria. All Rights Reserved.

সবাইকে শুভেচ্ছা জানাই

বাংলা স্কুল ওফ ভিক্টোরিয়া

এসো বাংলা শিখি বাংলায় কথা বলি

Classes on every Sunday
during school term

4 to 5:30pm

Mount St Neighbourhood House
6 Mount St
Glen Waverley

www.banglaschoolofvictoria.org.au

Email: bsvhelb@gmail.com

SMS: 0419 030 567

WITH BEST COMPLIMENTS

RADHA INDIAN RESTAURANT

796 Glenhuntly Road, Caulfield South 3162

Phone: 03 9523 9977

Bengali Sweets in Melbourne

Kalojaam, Langcha, Kheer er Chop, Balusai, Chamcham, Ros Kadamba, Kheer Kadamba, Labanga Latika, Bonde, Mihidana, Jelebi, Rosogolla and more...

Bengali Snacks in Melbourne

Singara, Vegetable Chop, Alu Chop, Fish Fry, Lamb Cutlet, Khasta Kachuri. Beguni, Cauliflower Pokora, Prawn Chop and more...

Some like it hot
Some like it cool
Simultaneous heating and cooling for large buildings
For medium to large air conditioning projects Toshiba's VRF (Variable Refrigerant Flow) systems are designed and built utilising a wide choice of stylish indoor units to suit new and existing buildings as well as combining flexibility, energy monitoring and respect for the environment.
For any enquiries please contact 03 9556 0134 or toshiba-aircon.com.au
TOSHIBA
AIR CONDITIONING

EASY LOANS AND FINANCE

M: 0422280500 (Anu)

0429777260 (Raj)

E: anu@elnf.com.au (Anu)

raj@elnf.com.au (Raj)

Easy Loans and Finance is honored and excited to be proud sponsors for Bengali Association of Victoria.

As a complement to our sponsors and its members, we gladly provide a **free** detailed assessment of their:

- Home loans,
- Investments,
- New Purchases,
- Restructuring of Current Loans, etc.